রহস্যভেদী বাসব

(সপ্তম খণ্ড)

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ চৈত্র ১৩৫৮

প্রকাশক ঃ প্রবীর মিত্র ঃ ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট ঃ কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ ঃ গৌতম রায়

মুদ্রাকর ঃ ভোলানাথ পাল ঃ তনুশ্রী প্রিণ্টার্স

৪/১ই বিডন রো ঃ কলিকাতা-৬

প্রখ্যাত রহস্য ঔপন্যাসিক কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখা **"রহস্যভেদী বাসব"**এর সপ্তম খণ্ড মুদ্রণকালে দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে আমরা বেদনাহত ও শোকাহত।

"রহস্যভেদী বাসব"-এর প্রতি খণ্ডে লেখক একটি ভূমিকা লিখেছেন। সেই ভূমিকা এই খণ্ডে দেওয়া সম্ভব হল না তাঁর অকাল প্রয়াণে। তাঁর গুণগ্রাহী পাঠকরা এই ভূমিকাবিহীন গ্রন্থটিও পূর্বের মত সমান মর্যাদায় গ্রহণ করবেন এই আমাদের আশা। ইতি—

প্রকাশক

: সূচী :

কিন্নর কিংশুক

॥ এক ॥

পিয়ার্সনের মিষ্টি গন্ধে চতুর্দিক্ আমোদিত।

সোফায় একটু হেলে বসলেন শশাঙ্ক নাগ।

অর্দ্ধদগ্ধ পিয়ার্সনকে আবার তুলে নিলেন মুখে। দীর্ঘ টান দিলেন। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে পীতাভ ধোঁয়া বেরিয়ে আসতে লাগল মিষ্টি গন্ধের আমেজ নিয়ে। কোথায় লাগে এর কাছে এদেশের কুলীন সিগারেটগুলো।

আবাহমানই যে পিয়ার্সনের নেশায় বুঁদ হয়ে আছেন শশাঙ্ক তা নয়। তিনি ছিলেন স্টেট এক্সপ্রেসের ভক্ত। পিয়ার্সনকে ওষ্ঠ লগ্ন করার ইতিহাসটি চমকপ্রদ। মাস ছয়েক আগে নিউইয়র্ক গিয়েছিলেন ব্যবসার কাজে।

বৈচিত্র্যের শহর নিউইয়র্ক।

প্রথম কয়েকদিন সেখানে কাজের মধ্যেই ডুবেছিলেন তিনি। তারপর কাজ থেকে অবসর পেলে, চুটিয়ে দেখলেন বিশ্বের এই সেরা শহরটিকে। ন্যাশনাল গ্যালারি থেকে স্ট্যাচু অব্ লিবার্টি কিছুই বাদ দিলেন না।

পকেটে অর্থ থাকলে সব সময় নিউইয়র্ক প্রচুর আনন্দ দিতে প্রস্তুত, একথা সহজেই বুঝতে পারলেন শশাঙ্ক। সেদিন পরিশ্রান্ত হয়ে সবে ফিরেছেন হোটেলে। অনেক দূরে চলে গিয়েছিলেন -শহরের বাইরে।

লবিতে দেখা হয়ে গেল আর্কোভিচের সঙ্গে।

পোলান্ডের এই তরুণ ইকনমিস্ট কি কাজে যেন এসেছেন আমেরিকায়। অনর্গল কথা বলতে পারেন ইংরাজীতে। শশাঙ্কর সঙ্গে বেশ পরিচয় হয়েছে।

তাঁকে দেখেই আর্কোভিচ বললেন, বেড়িয়ে ফিরছেন ?

হ্যাঁ।

কোথায় গিয়েছিলেন ?

ওয়াশিংটন আর্চ পেরিয়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম।

বোধহয় এবার দেশে ফিরবেন ?

আগামী পরশু, সন্ধ্যার ফ্লাইটে কলকাতা ফিরছি।

একটা কথা বলব যদি কিছু মনে না করেন—

বলুন না।

আর্কোভিচ বললেন, সাদা চামড়ার অনেক কীর্তিই তো এদেশে এসে দেখলেন। কিন্তু এই সভ্য দেশে কালো চামড়ারা কি ভাবে আছে, সে সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরছেন কি ?

লজ্জিত হলেন শশাঙ্ক।

বললেন, আপনি আমাকে একটা ভাল বিষয় মনে করিয়ে দিয়েছেন মিস্টার আর্কোভিচ। আমি কালই এ বিষয়ে তৎপর হব।

পরদিন শশাঙ্ক হার্লেমে গেলেন।

নিগ্রো পল্লী।

সেখানেই পিয়ার্সনের সন্ধান পাওয়া গেল। এক বুড়ো নিগ্রো এই চমৎকার গন্ধযুক্ত সিগারেটের ধোঁয়ায় জাল বুনছিল। তার অনুরোধে করা একটা সিগারেট মুখে দিয়েই মোহিত হলেন শশাঙ্ক। বলতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে প্রেমে পড়ে গেলেন পিয়ার্সনের। যদি এই ব্র্যান্ড কলকাতায় পাওয়া যেত!

ভাগ্য তাঁর ভাল বলতে হবে। কলকাতায় ফিরে এসে খোঁজ করতেই পার্ক স্ট্রীটের এক অভিজাত দোকানে পিয়ার্সনের সন্ধান পাওয়া গেল। এখন নিয়মিত তিনি চড়া দরে ওই দোকান থেকে এই নেশার বস্তুটি কিনে থাকেন।

বেয়ারা এসে জানাল ডিনার প্রস্তুত।

সিগারেটে শেষবার টান দিয়ে টুকরোটা অ্যাসট্রেতে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন শশাঙ্ক। আড়ামোড়া ভাঙ্গলেন। অবিন্যস্ত মূল্যবান ড্রেসিং গাউনটা ঠিক করে নিলেন। বহুক্ষণ একই জায়গায় বসে আছেন তিনি। কোন কাজ ছিল না হাতে। ধোঁয়ার জাল বুনতে বুনতে তিনি চিন্তা করছিলেন। চিন্তা করছিলেন নিজের কথাই।

কি চমৎকার তাঁর জীবন।

প্রাচুর্যের মধ্যে ডুবে রয়েছেন। যখন যা প্রয়োজন মাথা হেলিয়ে তা সম্পন্ন করতেই তিনি অভ্যস্ত। নিজের যে কোন প্রায় অবাস্তব ইচ্ছেকেও পরিপূর্ণ রূপ দেবার মত অপর্যাপ্ত অর্থ অনেকগুলি ব্যাঙ্কের জঠরে তাঁর আছে।

অথচ বছর তেরো-চোদ্দ আগে কঠিন পরিশ্রম করে অন্ন-সংগ্রহ করতে হত তাঁকে। পাওনাদারের ভয়ে মুখ লুকিয়ে বেড়াতেন এখানে ওখানে। পৃথিবীতে কোনরকমে বেঁচে থাকাও যে কত কষ্টকর তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। অবশ্য তখনও তিনি ন্যায়ের পথকে আঁকড়ে থেকেছেন। কিন্তু—শেষ পর্যন্ত তিনি দেখেছেন ন্যায় বলে কোন পদার্থ আজ আর নেই, সমস্ত পৃথিবী অন্যায়ের বিরাট চাদরের তলায় ঢাকা পড়ে গেছে।

তারপর—

স্ত্রী মারা গেলেন।

মনের মধ্যেটা ফাঁকা হয়ে গেল।

সেই ক্ষণস্থায়ী মনোভাবকে প্রায় জয় করেছিলেন শশাঙ্ক নাগ। তবে সম্পূর্ণ জয় করেছিলেন একথা বলা যায় না। তা যদি পারতেন সেদিন চাকরি তাঁর যেত না। সুস্থভাবে বাঁচবার দুর্নিবার ইচ্ছে সময় সময় তাঁকে উতলা করে তুলছিল একথা অবশ্য বলা চলে।

কিন্তু··· কিন্তু সে সমস্ত দিনের কথা ভুলে যেতে চান তিনি।

কি হবে সেই সমস্ত দিনের কথা আজ নতুন করে ভেবে। নিজের পুরোনো দিনগুলিকে ব্যবহারের অনুপযোগী জুতোর মতই ডাষ্টবিনে ফেলে দিয়েছেন শশাঙ্ক নাগ। ওখান থেকে তুলে আনবার কোন আগ্রহ তাঁর নেই। তবু মন এক এক সময় দিকহারা হয়ে পড়ে।

ওয়াল ক্লকের দিকে শশাঙ্ক তাকালেন। নটা কুড়ি।

আজ কিছু বিলম্ব হয়ে গেছে। কাটায় কাঁটায় নটায় ডিনার টেবিলের সামনে গিয়ে বসেন তিনি। ড্রইংরুম থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বাঁর পায়ে ডায়নিং হলে এলেন। নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে ডিনারে মনোনিবেশ করলেন। কোর্সগুলি অত্যন্ত মুখোরোচক। রেঙ্গুন থেকে আনিয়েছিলেন মগ বাবুর্চিটিকে। নির্বাচন যে ভাল হয়েছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ডাইনিং টেবিলের দুপাশে পর পর চেয়ারগুলি খালি। ওখানে কেউ বসবে না। শশাঙ্কর জীবনের এইটাই সবচেয়ে বড় অভিশাপ। তিনি পৃথিবীতে সম্পূর্ণ একা। সন্তান -এমন কি আত্মীয়পরিজন বলতেও তাঁর কেউ নেই। একা থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। তালুকদার তাঁর পরিচিত ব্যক্তি। সোনা তালুকদারের কন্যা। নিঃসঙ্গতাকে এড়িয়ে চলবার জন্যে শেষ পর্যন্ত সোনাকে নিজের কাছে এনে রাখতে বাধ্য হয়েছেন। সস্নেহে তাকে পালন করেছেন এতদিন।

সোনা আজ বাড়িতে অনুপস্থিত। কয়েকদিন হল শান্তিনিকেতনে গেছে কলেজ গ্রুপের সঙ্গে। ওখান থেকে কাল ফিরে আসার কথা। বলতে কি তার এই অনুপস্থিতিতে শশাঙ্ক হাঁপিয়ে উঠেছেন। সোনা চিরদিনের জন্য পরের ঘরে গেলে তিনি কি করবেন--এই চিন্তা সময় সময় তাঁকে অত্যন্ত উতলা করে তোলে।

খাওয়া শেষ হল। বেসিনে গিয়ে মুখ ধুলেন শশাঙ্ক।

ডায়নিং হল থেকে বেরিয়ে আসছেন, বেয়ারা এসে জানাল একজন ভদ্রলোক এসেছেন দেখা করতে। অপেক্ষা করছেন তিনি ড্রইংরুমে।

কপালে ভ্রাঁজ পড়ল তাঁর। এখন আবার কে এল ?

পিয়ার্সন ধরাতে ধরাতে প্রশ্ন করলেন, নিজের গাড়িতে এসেছেন ভদ্রলোক ?

—ট্যাক্সিতে এসেছেন।

কার ওনার ছাড়া অন্য কেউ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসুক তিনি আজকাল পছন্দ করেন না। ভ্রূর কুঞ্চন আরো ঘন হল। কেমন বিরক্ত বোধ করতে লাগলেন।

—কারখানার কেউ ?

—আজ্ঞে না।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে শশাঙ্ক বললেন, তাকে জানালে না কেন সন্ধ্যার পর আমি কারুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করি না। ভীত বেয়ারা কাঁপা গলায় বলল,

বলেছিলাম। তিনি আমার কথা গ্রাহ্য না করে ড্রইংরুমে এসে বসেছেন। বলছেন, দেখা না করে কখনই যাবেন না।

শশাঙ্ক প্রায় এক মিনিট চিন্তা করলেন। বেয়ারাকে আর কিছু না বলে এগিয়ে গেলেন ড্রইংরুমের দিকে। ঘরে প্রবেশ করেই দেখলেন, ইভনিং স্যুট পরিহিত এক দীর্ঘকায় ভদ্রলোক পিছন ফিরে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। পায়ের শব্দে ফিরে দাঁড়ালেন তিনি।

স্মার্ট, বুদ্ধির আভাযুক্ত মুখ আগন্তুকের।

কয়েক পা এগিয়ে এলেন তিনি।

দুজনের দূরত্ব কমে গেল। মুখোমুখি হতেই বুকের মধ্যেটা তোলপাড় করে উঠল শশাংকর। একি....। —না—না, এও কি সম্ভব! কিন্তু নিজের চোখকে অবিশ্বাস করবেন কিভাবে। বুকের স্পন্দন হয়ে উঠল অসম্ভব দ্রুত। তবু তিনি অসীম বলে নিজেকে সংবরন করলেন।

বললেন, এসময় কারুর সঙ্গে আমি দেখা সাক্ষাৎ বড় একটা করি না।

আগন্তুকের মুখে হাসি খেলে গেল। তিনি নিজের হিপ পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বার করে আনলেন। সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে গৃহকর্তার গাম্ভীর্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কোচে বসলেন। সিগারেটে কয়েকবার দীর্ঘ টান দিয়ে ধোঁয়ার রিং রচনা করলেন।

বললেন তারপর, আপনার বেয়ারাও আমাকে ওই কথাই বলেছিল বটে। বেয়ারার কথা আমাকে গ্রাহ্য করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই নিশ্চয়। যাহোক, আমার অসীম সৌভাগ্য, এই অসময়েও আপনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

স্বাভাবিকভাবে কথাগুলো বললেও, খাঁজে খাঁজে যে সূক্ষ্ম বিদ্রূপ ছিল শশাঙ্ক সহজেই বুঝতে পারলেন।

—কি প্রয়োজনে এসেছেন জানতে পারি কি?

—নিশ্চয়ই। জানাব বলেই তো এখানে আসা।

—বলুন?

—দেনা-পাওনা সংক্রান্ত কিছু কথা আছে।

—কাল আমার কারখানার অফিসে আসুন। ব্যবসা বা দেনা-পাওনা সংক্রান্ত কোন কথা আমি বাড়িতে আলোচনা করি না।

—করেন না নাকি! আমার সঙ্গে যে করতেই হবে।

—করতেই হবে!

—হ্যাঁ।

আগন্তুক সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, এগিয়ে গেলেন জানলার কাছে। সিগারেটের টুকরোটা জানলা গলিয়ে ফেলে দিয়ে মন্থর পায়ে ঘরের চতুর্দিকে চক্রাকারে একবার ঘুরে নিলেন।

—এমন সুসজ্জিত ড্রইংরুম আমি আগে দেখিনি। ঘরের এই অনবদ্য

রূপ দিতে বোধহয় কম করেও হাজার পঞ্চাশেক টাকা খরচ হয়েছে। চমৎকার।

অধৈর্য কণ্ঠে শশাঙ্ক বললেন, আমার বিশ্রামের সময় হয়েছে। আপনি যা বলতে চান তাড়াতাড়ি বলুন।

বেশ সহজ গলায় আগন্তুক বললেন, আবার বলছি চমৎকার। তোমার অভিনয় নৈপুণ্যের বারংবার প্রশংসা করতে ইচ্ছে করছে শশাঙ্ক। কোন থিয়েটারে ঢুকে পড় না। এই বয়সেও ভাল অভিনেতা হিসেবে নাম করতে পারবে।

শশাঙ্ক নাগ পিয়ানোর ডালা চেপে ধরলেন।

—আমি এখনও ঠিক

—চিনতে পারছ না। তাই না? তোমার স্মৃতিশক্তি কি চিরকালই এত দুর্বল ছিল?

—কিন্তু…

ঘর ফাটিয়ে হাসলেন আগন্তুক।

—তুমি ক্রমেই নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তুলছ।—তোমার মুখের ওপর এভাবে কে কথা বলতে পারে শশাঙ্ক? আমি—একমাত্র আমি পারি। তাও তুমি আমায় চিনতে পারছ না! স্মৃতির অতলে তলিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। আমি মৃগাঙ্ক—তোমার দুর্দিনের একমাত্র বন্ধু মৃগাঙ্ক সুর।

শশাঙ্ক দ্রুত গলায় বললেন, ও মৃগাঙ্ক! আমি তোমায় চিনতে পারিনি। অনেকদিন পরে দেখা তো—কেমন আছ বল?

—তা নয়। আসলে না চেনার ভান করছিলে।

—না চেনার ভান করতে যাব কেন? অনেকদিন কেটে গেছে। আমাদের দুজনেরই চেহারার বহু পরিবর্তন হয়েছে—চিনতে পারিনি তাই।

—আমি পারলাম আর তুমি পারলে না।

—তারপর তোমার খবর কি?

—খবর তো তোমার কাছে। বিরাট বাড়ি হাঁকিয়েছ দেখছি। মান, সম্মান, প্রতিপত্তি সবই এখন তোমার মুঠোর মধ্যে, কি বল শশাঙ্ক?

—সবই ভগবানের অনুগ্রহ ভাই।

মৃগাঙ্ক আবার সিগারেট ধরালেন।

—কেন বেচারা ভগবানকে এই নোংরা ব্যাপারের মধ্যে টেনে আনছ। বল, অনুগ্রহটা আমার। এই মৃগাঙ্ক সুরের। তোমার ওপর অগাধ বিশ্বাস করে যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলাম, তার দৌলতেই আজ তুমি রাজা।

—কিছু খাবে নাকি মৃগাঙ্ক? এনি ড্রিংক—

তাঁর কানে বোধহয় সে কথা গেল না।

তিনি আবার ঘরের চতুর্দিকে ঘুরে নিয়ে শশাঙ্কর সামনে এসে বললেন, এই ঘরের বহুমূল্য সাজশয্যাই শুধু নয়, এই বাড়ির দেওয়ালের প্রতিটি স্ল্যাব আমার টাকায় গাঁথা। আর আমি হাড় ভাঙ্গা খাটুনির বিনিময়ে বারোটা

বছর ছোট্ট একটা কুঠরিতে কাটিয়ে এলাম। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস!

শশাঙ্ক এতক্ষণে নিজেকে একটু সামলে নিয়েছেন।

- টাকাটা তোমার একার ছিল না মৃগাঙ্ক।

—অর্ধেকের দাবী তুলছ কোন্ সাহসে?

ধক ধক করে জ্বলতে লাগল মৃগাঙ্ক সুরের দুই চোখ।

—কি ছিল তোমার, সাহস—বুদ্ধি—? আমি না থাকলে তো কুকুরের মত রাস্তার পাশে মরে পড়ে থাকতে। আর সেই তুমি আমাকে চিট করে আজ শিল্পপতি। ভেবেছিলে আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না, বেশ সুখে শান্তিতে জীবন কাটিয়ে দেবে, তাই না? বন্দুকের গুলি দিয়ে আমি যদি তোমাকে ঝাঁজরা করে দিতে পারি তবু আমার ক্ষোভ মিটবে না জানবে।

—আঃ আস্তে কথা বল। বাইরে বেয়ারারা রয়েছে।

—আজ তোমার চাকর বেয়ারা কত কি আছে। অথচ আমার গায়ের এই ইভিনিং স্যুটটা পর্যন্ত ভাড়া করে আনা।

—প্লিজ মৃগাঙ্ক, চেঁচিয়ে সিন ক্রিয়েট কর না। বস শান্ত হয়ে। আমি শুনছি তোমার কথা।

মৃগাঙ্ক বসলেন।

—অনেক কষ্টে তোমার ঠিকানা আমাকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। বাজে কথা অনেক হল। এবার আমি কাজের কথা আরম্ভ করতে চাই।

কাঁপা গলায় শশাঙ্ক বললেন, বেশ তো, কি বলতে চাও বল?

—তোমার বাড়ি, তোমার কারখানা সবই অবশ্য আমি দাবী করতে পারি। কিন্তু ও-সমস্ত আমার প্রয়োজন নেই।

তবে—কি চাও তুমি?

ইসরার খালেদের গয়নার বাক্সটা।

গয়নার বাক্স?

হ্যাঁ।

কিন্তু····

কোন কিন্তু নয়। তোমার সমস্ত অপরাধ আমি ক্ষমা করব ওই গয়নাসমেত বাক্সটার বিনিময়ে। রাত বাড়ছে, বাক্সটা এনে দাও।

বাক্সটা তো আমার কাছে নেই।

কাছে নেই!—মৃগাঙ্ক সুর চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, স্বভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন তোমার আজও হয়নি দেখছি। এর চেয়ে ফেয়ার ডিলিংস তুমি আমার কাছ থেকে আশা করেছিলে?

তুমি আমাকে ভুল বুঝছ মৃগাঙ্ক।

আমি তোমাকে শেষবারের মত বলছি, বাক্সটা এনে দাও, নইলে –

বিশ্বাস কর, বাক্সটা সত্যি এখন আমার কাছে নেই; ভল্টে জমা দেওয়া আছে। কাল আনিয়ে রাখব—নিয়ে যেও।

একটু চুপ করে থেকে মৃগাঙ্ক বললেন, হুঁ। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হচ্ছে। কাল এই সময় আবার আসব। তবে তুমি যদি কোনরকম কারসাজি করবার চেষ্টা কর, তাহলে নিজেই বিপদে পড়বে জেনে রেখ।

কথাটা শেষ করেই শশাঙ্ককে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে ঘর থেকে নিস্ক্রান্ত হলেন মৃগাঙ্ক সুর।

মিনিট দশেক কেটে গেছে আরো।

দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার প্রতিমূর্তি হয়ে শশাঙ্ক নাগ বসে আছেন কোচে। চরম অস্থিরতা কুরে কুরে তাঁকে খাচ্ছে।

একটু আগেই তিনি ভাবছিলেন, কি চমৎকার তাঁর জীবন। অথচ এখন —? এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করবার কোন পথ তাঁর নেই। যেন হঠাৎ ঝড় উঠে শান্ত পরিবেশকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেল।

শশাঙ্ক কোচ ছেড়ে উঠে পড়লেন।

বেয়ারা এসে দাঁড়াল। মৃদু গলায় বলল, একজন দেখা করতে এসেছেন।

আবার একজন !!

ভ্রূ কুঁচকে শশাঙ্ক বললেন, বলে দাও এখন দেখা হবে না।

বেয়ারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পরমুহূর্তে ফিরে এসে জানাল, আগন্তুক পুলিশের পক্ষ থেকে আসছেন। বিশেষ প্রয়োজনীয় কারণে দেখা করতে চান।

পুলিশ। পুলিশ কেন ?

শশাঙ্ক আবার কোচে বসলেন। বললেন, পাঠিয়ে দাও।

মিনিট কয়েক পরে ঘরে প্রবেশ করলেন দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি। নিজের পরিচয় দিলেন তিনি। নাম সুখময় দত্ত। গোয়েন্দা-বিভাগ থেকে আসছেন।

শশাঙ্ক তাঁকে বসতে অনুরোধ করে, তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন।

সুখময় দত্ত বললেন, আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করবার জন্যে আমি দুঃখিত। আমাদের এমন চাকরি যে সময় সময়—

আপনি সে জন্যে সংকোচ করবেন না। কি ব্যাপার বলুন তো ?

মৃগাঙ্ক সুর নামে আপনি কাউকে চেনেন ?

চিনি মানে ·· এককালে আমার বাবার কর্মচারি ছিল সে।

এই মিথ্যে কথাটুকু না বলে উপায় নেই।

মিনিট দশেক আগে তাকে এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম। আপনি নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন, বারো বছর জেল খাটার পর হপ্তাখানেক হল সে ছাড়া পেয়েছে।

হ্যাঁ, শুনেছি।

জেল থেকে ছাড়া পেলেও, আমাকে নিযুক্ত করা হয়েছে তার গতিবিধির ওপর নজর রাখবার জন্যে। আপনার মত মান্যবর লোকের বাড়িতে তাকে

ঢুকতে দেখে আশ্চর্য হলাম। আপনাকে কি বলতে এসেছিল বলুন তো ?

চাকরির জন্যে এসেছিল। ও নাকি ভালভাবে জীবন কাটাতে চায়।

আরো দু-চার কথার পর সুখময় দত্ত বিদায় নিলেন।

॥ দুই ॥

নাগ-হাউস থেকে বেরিয়ে, লাউডান স্ট্রীট পেরিয়ে মৃগাঙ্ক সুর পার্ক স্ট্রীটে এসে দাঁড়ালেন। অনেক আগেই দোকানগুলো একে একে বন্ধ হয়ে গেছে। পথ হয়ে উঠছে জনবিরল।

রিস্টওয়াচের দিকে তাকালেন মৃগাঙ্ক। এগারটা দশ।

শীতের রাত্রি, কাজেই পথ জনবিরল হওয়াই স্বাভাবিক।

মৃগাঙ্ক হাঁটতে হাঁটতে চৌরঙ্গী রোডে এলেন। তারপর এলেন ধর্মতলায়। একটু পা চালিয়েই এলেন, কারণ শেষ ট্রামটা হয়ত এখনো ধরা যাবে।

ছাড়ার মুখেই লাফিয়ে উঠলেন শেষ ট্রামে।

নামলেন গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে। ট্রাম লাইন ছেড়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন। দোতলা একটা বাড়ির দরজায় গিয়ে মৃদু করাঘাত করলেন বার কয়েক। দরজা খুলে গেল। দরজার অপর প্রান্তে বেঁটে চেহারার একজন লোক দাঁড়িয়ে।

মৃগাঙ্ক তাঁকে পাশ কাটিয়ে ঘরের মধ্যে গেলেন।

লোকটি দরজা বন্ধ করে মৃগাঙ্কর কাছে এল। প্রশ্ন করল, বাক্সটা কোথায় ?

পাওয়া যায় নি।

আপনাকে আমি আগেই বলেছিলাম, এত সহজে গয়নার বাক্সটা শশাঙ্ক নাগ হাতছাড়া করবে না। তাছাড়া সেগুলো আছে কিনা সন্দেহ। কোন্ কালে হয়ত বিক্রমপুরে চলে গেছে।

তীক্ষ্ন গলায় মৃগাঙ্ক বললেন, কাল গয়নার বাক্সটা ব্যাঙ্ক থেকে আমায় আনিয়ে দেবে বলেছে। যদি না দেয়—ঠকাবার চেষ্টা করে, তাহলে এবার আর আমি তাকে ক্ষমা করব না। তারই চক্রান্তে বারোটা বছর আমাকে ঘানি টানতে হয়েছে। এবার আমি শান্তিতে বাকি জীবনটা কাটাতে চাই বিরূপাক্ষ। তবে—

নিজের সুচিক্কণ টাকে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বিরূপাক্ষ বলল, গয়নাগুলো হাতে এসে পড়লে আপনার জীবন নির্বিবাদে কাটবে বৈকি। কত টাকার গয়না আছে যেন ?

বছর তেরো আগে এক লাখ আশি হাজার টাকার মত ছিল। এখনকার যা বাজার-দর, তাতে চার লাখ টাকার বেশিই হবে।

তা তো হবেই—বির্পাক্ষ মোলায়েম হেসে বলল, তবে কিনা, চোরা বাজারে আপনি এত টাকা পাবেন না। অন্যরা দরাদরি করে আপনাকে অস্থির করে তুলবে। তবে আমি আপনাকে যতদূর সম্ভব বেশি দেব।

মৃগাঙ্ক কিছু বললেন না। সিগারেট ধরালেন।

জেলের মধ্যেই বির্পাক্ষর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল।

রতনে রতন চেনে। প্রথম দর্শনেই বির্পাক্ষর ধূর্ত চোখ আর বাঁকা নাক দেখে মৃগাঙ্ক বুঝতে পেরেছিলেন জীবটি কোন্ শ্রেণীর। সোনার গয়নার চোরাকারবার করবার সময় ধরা পড়েছিল সে। জেল হয়েছিল তিন বছর।

ওখানেই দুজনের মধ্যে কথা পাকা হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি যদি জেল থেকে বেরুতে পারেন, মৃগাঙ্ক তাহলে শশাঙ্কর কাছ থেকে গয়নার বাক্সটা উদ্ধার করতে বির্পাক্ষর সাহায্য নেবেন। নইলে গয়নাগুলো বিক্রি করা সত্যি তাঁর পক্ষে কণ্টকর হবে।

এখন গয়নার বাক্সটা শুধু হাতে এসে পড়লেই হয়।

সিগারেটে দীর্ঘটান দিয়ে মৃগাঙ্ক বললেন, অনেক রাত হয়েছে বির্পাক্ষ, তুমি শুয়ে পড়। আমি এখন একটু চিন্তা করব।

বির্পাক্ষ কোন কিছু না বলে পাশের ঘরে চলে গেল।

ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের সুখময় দত্ত অনেকক্ষণ চলে গেছেন।

রাত পৌনে বারটা।

কোচের ওপর এখনও হেলে বসে আছেন শশাঙ্ক নাগ। ভাবছেন আকাশ পাতাল। হঠাৎ এক সময় তাঁর চটকা ভাঙল। কতক্ষণ আর বসে বসে ভাববেন?

কোচ থেকে উঠে মন্হর পায়ে শোবার ঘরে গেলেন তিনি।

আজ কি আর ঘুম আসবে?

মৃগাঙ্কর কথা মন থেকে মুছে ফেলেছিলেন। বিশ বছর যার জেল হয়েছে, সে যে বারো বছর পরেই তাঁর জীবনে এইভাবে ধূমকেতুর মত উদয় হবে তা কে জানত। জেলের মধ্যে খেটে খেটে ওর তো মরে যাওয়া উচিত ছিল। তা নয়, বেশ কর্মঠ শরীর নিয়ে, তাঁর ড্রইংরুমে বসে তাঁকেই চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে কথা বলে গেল!

কিন্তু ওর কোন কথার প্রতিবাদ তো তিনি করতে পারেন না।

কিভাবে করবেন?

অতীতের সমস্ত ইতিহাসকে কিভাবে মুছে ফেলবেন? সত্যি কথা বলতে কি তাঁরই ষড়যন্ত্রের জন্যে মৃগাঙ্ক জেলে ঘানি টেনেছে।

ঘরের মধ্যে দ্রুত পায়চারি করতে লাগলেন শশাঙ্ক।

অতীতের সমস্ত কিছু ছায়াছবির মত ভেসে উঠতে লাগল চোখের ওপর

বারবার। মৃগাঙ্কর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় সম্পূর্ণ নাটকীয়ভাবে। দিল্লীর সেই রাত্রে, সেদিন আজকের চেয়ে চতুগুণ বেশি শীত ছিল। সন্ধ্যার দিকে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়েছিল বুঝি—

॥ ক ॥

বোয়ার্ড রোডের একটা বাড়ির বারান্দার তলায় এসে দাঁড়াল শশাঙ্ক। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। কি প্রচণ্ড শীতই পড়েছে এবার দিল্লীতে। পথ জনমানব শূন্য। রাত এগারটা হবে।

আজ বেশ কয়েকদিন থেকে দিল্লীর পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে শশাঙ্ক। চাকরি নেই—পকেটে পয়সা নেই।

সব ছিল। সব গেছে।

বিরাট ঝড়ে যেমন সমস্ত ওলটপালট হয়ে যায়। বন্যার জল যেমন সমস্ত ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি অর্থ, চাকরি, সম্মান সমস্তই কোন্ এক অজানা টানে বহু দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে শশাঙ্কর কাছ থেকে।

আজ তার কিছু নেই, কেউ নেই।

শশাঙ্কর ভাইবোন ছিল না। মা মারা গেছেন বহুদিন হল। বাবা ছিলেন। ছেলের বিয়ে দেবার পর তিনিও বিদায় নিলেন।

মর্গান অ্যাণ্ড গ্রীন কোম্পানিতে বেশ ভাল কাজই করছিল সে। কলকাতা থেকে বদলি হয়ে দিল্লীতে এল। কোন অশুভ যোগেই এখানে পা দিয়েছিল শশাঙ্ক, তিন মাস কাটতে না কাটতেই ট্রেন ডিরেল্ডে স্ত্রী মারা গেল।

নিজের ভাইয়ের সঙ্গে বাপের বাড়ি যাচ্ছিল। পথে এই দুর্ঘটনা।

শোকে ভেঙে পড়ল শশাঙ্ক।

অফিসে যাওয়া বন্ধ করে দিল। এইভাবে চাকরিটা গেল। যখন ওর জ্ঞান হল তখন সমস্ত ফাঁকা হয়ে গেছে। আবার চাকরির সন্ধানে অফিসে অফিসে ঘোরাঘুরি করতে লাগল।

কিন্তু কোথায় চাকরি? ক্রমে রেস্ত ফুরিয়ে এল।

কড়া নোটিশ দিল বাড়ির মালিক। দশদিনের মধ্যে বাকি সমস্ত টাকা দিয়ে দিতে না পারলে, গলা ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে যাবে থানায়।

সেই দশদিন কয়েকদিন আগেই পার হয়ে গেছে। থানায় অবশ্য তাকে নিয়ে যাওয়া হয়নি। তবে সমস্ত মালপত্র ক্রোক করা হয়েছে। দারোয়ান বাড়ির বারান্দায় উঠতে দেয়নি।

সেই থেকে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে শশাঙ্ক।

ঘড়ি বিক্রি করে ক'দিন কোনরকমে চলেছে। এখন শেষ সম্বল মুক্তার আংটিটার ওপরই ভরসা। দশ আনা সোনা আছে এতে। জঠরের তাগিদে কালই একে বিক্রি না করে উপায় নেই।

ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে বারান্দার এক পাশে এসে বসল শশাঙ্ক। আজকের রাতটা এখানেই কাটিয়ে দেবে কোনরকমে। ভোর হলে স্টেশনে চলে যাবে। প্রথম পূর্বদিকে যাবার যে ট্রেন পাবে তাতেই চড়ে বসবে। রওয়ানা দেবে কলকাতায়, ওখানে গিয়ে নতুন করে ভাগ্য পরীক্ষা করবে।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বুঝি।

হঠাৎ কিসের শব্দে চমক ভাঙল। মুখ তুলে দেখল, সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে যমদূতের মত চেহারার একটা লোক। উঠে দাঁড়াল শশাঙ্ক। আবছা অন্ধকারের মধ্যে লোকটাকে দেখেই চিনতে পারল। একটু আগে মতিবাগে এই লোকটাই তার কাছে দেশলাই চেয়েছিল সিগারেট ধরাবার জন্যে।

সিগারেট ধরিয়ে আবার দেশলাইটা ফিরিয়ে দিয়ে হন হন করে চলে গিয়েছিল। এখন আবার কি চায় ?

শশাঙ্ক অসংলগ্ন গলায় প্রশ্ন করল, কি চাই ?

আগন্তুক গম্ভীর গলায় বলল, আমায় চিনতে পেরেছ বোধহয় ? এবার আমি তোমার কাছ থেকে দেশলাই চাইতে আসিনি।

তবে কি চাও তুমি ?

আংটিটা। ওটা আমার বিশেষ দরকার।

শশাঙ্ক আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। এবার দু' পা পিছিয়ে গেল।

আংটি !

দেশলাইটা যখন নিলাম তখনই লক্ষ্য করেছিলাম আংটিটা। বেশ দামী আংটি।

শশাঙ্ক দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করল। ওই দুষমন আকৃতির লোকটার সঙ্গে যে পেরে উঠবে না বলাই বাহুল্য। লোকটা দ্রুত এগিয়ে তার পথ রোধ করল। বলল, পালাবার বা চেঁচামেচি করবার চেষ্টা কর না। ওটা খুলে দাও।

এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতেও শশাঙ্ক ঘামতে লাগল।

কি করবে—আংটিটা খুলে দেবে নাকি ? না দিয়েই বা উপায় কি। ঘামতে ঘামতে ভাবতে লাগল। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবতে হল না। সবিস্ময়ে সে লক্ষ্য করল, ঠিক সেই সময় আর্তচিৎকার করে আগন্তুক মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

কি হল লোকটার ?

এখন আর ভাবার অবকাশ নেই। আগন্তুকের চিৎকার বাড়ির লোকদের কানে গেছে। আলো জ্বলে উঠেছে ভেতরে। এখুনি হয়ত কেউ বেরিয়ে আসবে।

শশাঙ্ক আর কালবিলম্ব না করে আগন্তুকের দেহটা ডিঙিয়ে রাস্তায় নেমে এল। রাস্তায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে একজনের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেল।

দ্বিতীয় লোকটি পরিষ্কার বাংলায় বলল, ওকে আমিই ইঁট ছুঁড়ে মেরেছি। আমার সঙ্গে এস।

মন্ত্রমুগ্ধের মত দ্বিতীয় আগন্তুককে অনুসরণ করল শশাঙ্ক।

অনেক রাস্তা ঘুরে শেষে ওরা একটা বস্তি অঞ্চলে এল।

অজস্র খুপরি খুপরি ঘর সেখানে।

ঘেষাঘেষি করে ঘরগুলো দাঁড়িয়ে আছে।

একটা বন্ধ ঘরের তালা খুলে দ্বিতীয় আগন্তুক শশাঙ্ককে নিয়ে ভেতরে গেল।

ঘরের মধ্যে আসবাব বিশেষ নেই। চৌকির ওপর বিছানা পাতা। দুটো চেয়ার এক ধারে। একটা জলচৌকির ওপর দামী একটা সুটকেশ রয়েছে।

দ্বিতীয় আগন্তুক বলল, খুব আশ্চর্য হচ্ছ না?

তা একটু হচ্ছি বই কি।

তোমার আংটির ওপর লোভ আমার নেই। বস, সব বলছি।

বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। সে তুলনায় ঘরের মধ্যেটা অনেক গরম। শশাঙ্ক বসল।

দ্বিতীয় আগন্তুক আরেকটা চেয়ারে বসে বলল, মোতিবাগ থেকেই লক্ষ্য করছিলাম ওই লোকটা তোমার পিছু নিয়েছে। লোকটাকে আমি চিনি, কুখ্যাত গুণ্ডা করিম। যাই হোক, তোমার কাছ থেকে আংটিটা দাবী করেছে শুনেই আমি ওকে আহত করলাম।

আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমার নেই—শশাঙ্ক বলল, এই আংটিটাই আমার শেষ সম্বল।

শেষ সম্বলটি খোয়া যাবার আর সম্ভাবনা নেই। আমার সঙ্গে কাজে নামলে তোমাকে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে না।

আপনি আমায় চাকরি দেবেন?

নিশ্চয়। তবে তার আগে তোমার সম্বন্ধে আমার সমস্ত কিছু জানা দরকার।

শশাঙ্ক নিজের সম্বন্ধে একে একে বলে গেল সমস্ত কিছু।

হুঁ। ভালই হল। তোমার মত দায় শূন্য লোকই আমার প্রয়োজন। আমি তোমায় কি ধরনের কাজ দেব সে সম্বন্ধে জানবার নিশ্চয়ই তোমার আগ্রহ হচ্ছে?

হ্যাঁ। যদি বলেন—

তার আগে আমার নামটা জেনে রাখ:

বলুন?

মৃগাঙ্ক সুর। পরকে ঠকিয়ে নিজের পকেটে পয়সা আমদানী করাই হল আমার ব্যবসা। চমকে উঠলে যে—?

না··মানে···

মৃগাঙ্ক সুর তার কথায় কর্ণপাত না করে বলল, তোমার মত চমৎকার পার্সোনালিটির একজন সহকারী আমার প্রয়োজন। বল রাজি আছ—

বে-আইনী কাজ ?

হ্যাঁ।

কিন্তু—

হাসল মৃগাঙ্ক। বলল, আইনের আওতায় থেকে তুমি কি পেয়েছ? পেট ভরে খেতে পর্যন্ত পাওনি। পথে পথে খালি পেটে ঘুরে বেড়াচ্ছ। আর আমায় দেখ—কারুর কাছে হাত পাততে যাই না, সিঁদও কাটি না কারুর বাড়িতে। ব্যাঙ্ক লুট করা আমার অভ্যাস নয়। শুধু বোকাদের ঠকিয়ে চমৎকারভাবে জীবন আমি কাটাচ্ছি।

আমি তো ·· মানে ·· আমার তো এসমস্ত বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা নেই।

প্রয়োজনও নেই। আমি তোমায় সমস্ত শিখিয়ে পড়িয়ে নেব। তুমি আজ ভাব। কাল আমায় উত্তর দিও।

॥ খ ॥

পরের দিন ভোর হবার পরই অন্য জীবন আরম্ভ হল শশাঙ্কর।

উপস্থিত বাঁচতে গেলে মৃগাঙ্ককে অনুসরণ করা ছাড়া আর উপায় নেই। এক পেট খিদে নিয়ে সৎ জীবনকে কতদিন আঁকড়ে থাকা যাবে।

এরপর কেটে গেছে দিনের পর দিন।

বড় বড় শহরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে ওরা। অভিজাত হোটেলগুলোতে গিয়ে উঠেছে নিজেদের নামী পরিচয় দিয়ে। বোকা বড়লোকদের মুণ্ডপাত করেছে সেখানে। অবশ্য মুণ্ডপাত করতে গিয়ে নানারকম কারসাজির সাহায্য নিতে হয়েছে।

কখনো তাসের বাজিতে' কখনো বড় কোন কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করার অছিলায়, আবার কখনো নির্জন কোথাও ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে স্রেফ ছিনতাই।

এইভাবে দিন কাটছিল।

মৃগাঙ্কর পকেটে টাকা ফুলে উঠছিল ক্রমেই।

শশাঙ্ক পাচ্ছিল মাসিক তিনশ টাকা করে মাত্র।

এতে যে কিছু মন কষাকষি না হচ্ছিল তা নয়।

একদিন শশাঙ্ক পরিষ্কার ভাবে বলল, আমার পাওনাটা আমি বোধহয় ঠিক মত পাচ্ছি না।

মৃগাঙ্ক ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, তোমার টাকার লোভ ক্রমেই বেড়ে চলেছে লক্ষ্য করছি।

লোভ নয়—প্রাপ্য। তুমি আর আমি একই সঙ্গে টাকা রোজগার করি। অথচ তুমি নেবে পুরো আর আমি পাব শুধু মাসোহারা।

বেশ বলতে কইতে শিখেছ দেখছি আজকাল। হ্যাঁ, তুমি মাসোহারাই পাবে। কেন পাবে জান? কারণ সমস্ত পরিকল্পনাগুলো বেরোয় আমার মাথা থেকে, তাই।

শশাঙ্ক আর কিছু বলল না। গুম হয়ে রইল।

অমৃতসর থেকে ওরা আগ্রায় এসেছিল।

কিন্তু আগ্রায় কাজকর্মের বিশেষ সুবিধা হচ্ছিল না। কোন জাঁদরেল মক্কেল চোখে না পড়ায় এই অসুবিধা।

অগত্যা ওদের কানপুর চলে আসতে হল।

এখন এখানে কোন চামড়ার ব্যবসায়ীকে ঘায়েল করতে পারলেই ব্যবসার মন্দা ভাবটা কাটান সম্ভব হবে। ওরা একটা হোটেলে গিয়ে উঠল। বলাবাহুল্য হোটেলটি অভিজাত শ্রেণীর।

মালপত্র রেখে মৃগাঙ্ক বেরিয়ে পড়ল শিকারের সন্ধানে।

শশাঙ্ক রইল হোটেলে।

মৃগাঙ্ক ঘুরতে ঘুরতে কানপুরের মর্যাদাময় অঞ্চলে এসে উপস্থিত হল। এখানকার এক প্রথমশ্রেণীর হোটেলের অ্যাসিস্টেণ্ট ম্যানেজারের সঙ্গে ওর আলাপ ছিল। এই অ্যাসিস্টেণ্ট ম্যানেজারটি বিদেশী মালের চোরা-কারবারে সিদ্ধহস্ত। সেই সুবাদেই মৃগাঙ্কের সঙ্গে দিওয়ান শরনের আলাপ।

মৃগাঙ্ককে দেখে শরন সকলরবে বললেন, কি আশ্চর্য—তুমি ? কবে এলে ?

আজই। তারপর তোমার খবর কি ?

মার্কেট খুব ভাল।

আমারও তাই। এখন হোটেলে কোন রহিস আছে নাকি ?

রহিস কি বলছ ! এক রাঘব বোয়াল আছে।

রাঘব বোয়াল ?

হ্যাঁ হে।

কে সে ?

তোমার পরিচিত। সেই হীরের ব্যবসায়ী সৌদি আরাবিয়ানটা—

কে, ইসরার খালেদ ? এখানে এসে উঠেছে নাকি ?

তবে আর বলছি কি।

মৃগাঙ্কর চোখ দুটো নেচে উঠল। একবার এই হোটেলেই একটুর জন্যে এই সৌদি আরবের ব্যবসায়ীকে গাঁথতে পারেনি। এবার কোনমতেই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলে চলবে না।

আছে নাকি নিজের ঘরে এখন ?

আছে।

একটা সিগারেট ধরাল মৃগাঙ্ক। তারপর কেসটা শরনের দিকে এগিয়ে বলল, তার হাব-ভাব দেখে কিরকম বুঝছ, সঙ্গে মোটা কিছু আছে, না সবই ব্যাঙ্ক ড্রাফটের ব্যাপার—।

কেস থেকে সিগারেট তুলে নিল শরন। বলল, টাকা কড়ি সঙ্গে কি আছে বলতে পারছি না। তবে গয়নার বাক্স সঙ্গে আছে।

ওতেই হবে। রুম-নম্বর কত?

১৮২। আমাকে কিন্তু ফাঁকি দিও না।

নিশ্চয়ই না।

মৃদু হেসে মৃগাঙ্ক সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল।

নির্দিষ্ট ঘরের দরজায় গিয়ে টোকা মারল।

দরজা খুললেন স্থূলাঙ্গ ইসরার খালেদ স্বয়ং।

মৃগাংককে দেখে সবিস্ময়ে বললেন, কি আশ্চর্য, আপনি?

ভাল আছেন মিস্টার খালেদ?

হ্যাঁ। আপনি—? আসুন মিস্টার চোপরা, ঘরের ভেতরে আসুন।

মিঃ চোপরা নামেই ইসরার খালেদের কাছে পরিচিত মৃগাঙ্ক।

মৃগাঙ্ক ঘরের মধ্যে গেল।

হোটেলে এসেই শুনলাম আপনি এসেছেন, তাই দেখা করতে এলাম।

খুব ভাল করেছেন। কেমন ব্যবসা চলছে আপনার?

ইসরার খালেদ জানেন মৃগাঙ্ক একজন বড় কাপড়ের ব্যবসাদার।

মন্দ নয়। আপনার—?

কথাবার্তা অবশ্য সমস্তই ইংরাজীতে হচ্ছিল।

একগাল হাসলেন খালেদ। বললেন, আল্লার অনুগ্রহে এ বছরটা আমার বেশ ভালই যাচ্ছে। ভাল দরেই সর্বত্র মাল ছাড়তে পারছি।

আপনার আরো শ্রীবৃদ্ধি হোক।

তারপর, কানপুরে এলেন যে? ব্যবসার খাতিরে নিশ্চয়ই?

মাথা নেড়ে মৃগাঙ্ক বলল, আর বলেন কেন, আমার এক জমিদার বন্ধুকে নিয়ে হন্নে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

কেন—কেন?

তাঁর কিছু হীরে সেট করা গয়নার দরকার। কিন্তু মনোমত জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না। দিল্লি আগ্রা ঘুরে কানপুরে এসেছি। দেখা যাক এখানে মনোমত জিনিস পাওয়া যায় কিনা।

সাগ্রহে খালেদ বললেন, অন্য কোথাও না গিয়ে আপনার বন্ধুটি আমার কাছে এলেই তো পারেন। আমি বোধহয় তাঁকে খুশি করতে পারব।

আকাশের চাঁদ পাওয়ার ভঙ্গিতে মৃগাঙ্ক বলল, আপনার কাছে কিছু হীরের গয়না আছে নাকি?

কিছু মানে? কত চাই?

যাক, বাঁচা গেল। নিজের ব্যবসাপত্তর ফেলে এই খামখেয়ালী বন্ধুটিকে নিয়ে ছুটোছুটি করতে করতে হয়রান হয়ে পড়েছিলাম। বড়লোকের খেয়াল বোঝেন তো। তাহলে তাঁকে এখানে নিয়ে আসি কি বলেন?

নিশ্চয়ই।

তবে তাঁকে ডেকে আনবার আগে আমি একবার গয়নাগুলো দেখে নিলে ভাল হত।

বেশ তো, এখুনি দেখাচ্ছি।

ইসরার খালেদ পাশের ঘরে চলে গেলেন।

কয়েক মিনিট পর ফিরে এলেন মাঝারি সাইজের একটা সুটকেশ হাতে করে। সুটকেশ খুলে গয়নাগুলো দেখালেন। অসংখ্য হীরের অপূর্ব সমাবেশ। লোভে মৃগাঙ্কর সমস্ত শরীর দুমড়ে এল।

সে কিন্তু সহজভাবেই গয়নাগুলো নাড়াচাড়া করে বলল, মনে হয় পছন্দ হবে। ঘরে টেলিফোন আছে? আমি তাহলে এখুনি কথা বলে নিতে পারি তাঁর সঙ্গে।

ফোন আছে বইকি। পাশের ঘরে আছে, আসুন।

ইসরার খালেদ সুটকেশ বন্ধ করে, পাশের ঘরে এসে ফোনটা দেখিয়ে দিলেন।

মৃগাঙ্ক রিসিভার তুলে নিয়ে, সংযোগ ঘটিয়ে নিচু গলায় কথা বলল কার সঙ্গে। তারপর খালেদের কাছে এসে বলল, সব কথা শুনে খুব খুশি হলেন উনি।

কখন আসবেন বললেন?

বিকেল চারটের সময়।

এরপর আরো কিছুক্ষণ সাধারণ কথাবার্তার পর ওখান থেকে বিদায় নিল মৃগাঙ্ক।

খাওয়া-দাওয়া সেরে শশাঙ্ক বিছানায় শুয়েছিল।

উত্তরপ্রদেশের বিখ্যাত দৈনিক 'লিডারের' পাতা ওলটাচ্ছিল।

মৃগাঙ্ক সেই কখন বেরিয়ে গেছে এখনো দেখা নেই। কোথায় গেছে কে জানে। যখন যায় কিছুই বলে যায় না।

এই সময় মৃগাঙ্ক ফিরল।

বিছানার একপাশে বসে বলল, ভাগ্য আমাদের খুব ভাল। কানপুরে পা দিতে না দিতেই এক জবর শিকার পাওয়া গেছে।

তাই নাকি?

আমার মুখ থেকে ইসরার খালেদের কথা শুনেছ। তারই সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেল। অনেক টাকার গয়না রয়েছে তার কাছে।

সেগুলো হাতাতে চাও, এই তো?

বলাবাহুল্য।

কিন্তু কিভাবে?

চারটের সময় তোমাকে আমার সঙ্গে জমিদার-নন্দন সেজে ওখানে যেতে হবে। তারপর—

আমি যেতে পারব না।

যেতে পারবে না মানে? এত বড় দাঁওটা হাত ফসকে যাবে নাকি?

যায় যাবে।—শশাঙ্ক নির্বিকার ভাবে বলল, তোমার লাভের জন্যে আমি প্রাণপাত করতে পারব না। তুমি হাজার হাজার টাকা লাভ করবে, আমি পাব মাস গেলে মাত্র তিনশো টাকা। সব সময় সস্তায় কিস্তি মারতে চাইলে হয় নাকি?

আহা-হা, তুমি এত সিরিয়াস হয়ে পড়ছ কেন? এবার যা লাভ হবে, আমাদের দুজনের ভাগ ফিপটি ফিপটি! কেমন, হল তো?

কথাটা মনে রেখ।

নিশ্চয়ই রাখব। এখন শোন তোমায় কি করতে হবে। তুমি আর আমি খালেদের রুমে যাব। স্বাভাবিক ভাবেই সামনের ঘরে বসব আমরা। খালেদ আমাদের গয়না দেখাবে। এই সময় কোন অছিলায় আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাব। বেরিয়েই ফোন করব। ফোন আছে শোবার ঘরে। কাজেই খালেদ সামনের ঘর থেকে শোবার ঘরে যাবে ফোন ধরতে। তুমি এই অবসরে গয়না সমেত সুটকেশটা নিয়ে চম্পট দেবে। হোটেলের গেটের কাছে আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।

তারপর?

সে ব্যবস্থাও করেছি। খালেদের ঘর থেকেই আমি রিজার্ভেশনে ফোন করেছিলাম। জায়গা আছে খবর পেয়ে এখানে ফেরার আগে দুটো প্লেনের টিকিট কিনে এনেছি।

যাব কোথায়?

বেনারস। ওখান থেকে কলকাতা।

কাঁটায় কাঁটায় চারটের সময় শশাঙ্ককে সঙ্গে নিয়ে ইসরার খালেদের কাছে এল মৃগাঙ্ক। অপূর্ব দেখাচ্ছে শশাঙ্ককে।

পরনে তার চকোলেট রংএর ডেক্রনের ট্রাউজার। গায়ে টেলার্ডের প্রিন্স কোট। আঙুলে গোটা তিনেক দামী আংটি। কানে দুটি মুক্তোর টপ। আর আছে সুন্দর তীক্ষ্ম মুখখানা। সব মিলিয়ে তাকে অত্যন্ত অভিজাত বলে মনে হচ্ছে।

মৃগাঙ্ক পরিচয় দিল, ইনিই প্রতাপনগরের কুমার প্রেমকিশোর আর ইনি বিখ্যাত অলঙ্কার বিক্রেতা ইসরার খালেদ।

খালেদ মহা সমাদরে শশাঙ্ককে আহ্বান জানালেন। বসালেন।

আগে থেকে আনিয়ে রাখা সুগন্ধময় কফি পরিবেশন করলেন।

কফি-পর্ব শেষ হলে শশাঙ্ক বলল, এবার তাহলে গয়নাগুলো দেখতে হয় মিস্টার ইসরার।

আপনি আমাকে দু-মিনিটের জন্যে ক্ষমা করুন মিস্টার প্রেম। খালেদ বললেন, এখুনি আমি গয়নাগুলো নিয়ে আসছি।

মৃগাঙ্ক মিনিট খানেক আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল বাথরুমে যাবার অজুহাতে। খালেদ গয়নার সুটকেশ নিয়ে এলেন।

শশাঙ্ক গম্ভীর ভাবে গয়নাগুলো পরীক্ষা করতে লাগল।

এই সময় ঝনঝনিয়ে টেলিফোন বেজে উঠল পাশের ঘরে। ইসরার খালেদ কোচ থেকে উঠে বললেন, আমি ফোন য়্যাটেণ্ড করেই আসছি।

শশাঙ্ক একটা বালা পরীক্ষা করতে করতে মাথা হেলাল।

খালেদ দ্রুত পায়ে পাশের ঘরে গেলেন। আর কালবিলম্ব না করে সুটকেশের ডালা বন্ধ করে, টেবিলের ওপর থেকে সুটকেশটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল শশাঙ্ক।

প্রায় দৌড়তে দৌড়তে এল গেটের কাছে।

মৃগাঙ্ক দাঁড়িয়েছিল সেখানে।

চলন্ত একটা ট্যাক্সি থামিয়ে তাতে চেপে বসল দুজনে।

বায়ু বেগে ধাবিত হল ট্যাক্সি। কিছুদূর যাবার পর ট্যাক্সি পরিবর্তন করে এয়ারপোর্টে গেল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই বেনারসগামী প্লেনে রওনা হয়ে গেল ওরা।

বেনারসে পৌঁছে পরের দিনের ফ্লাইটে দুটো কলকাতার সিট বুক করল মৃগাঙ্ক।

রাতটা কাটাবার জন্যে দুজনে এসে উঠল বেনারস লজে।

এতক্ষণে গয়নাগুলো ভাল করে দেখবার অবকাশ পেল ওরা।

শশাঙ্ক বলল, হাজার বিশেকের হবে, কি বল ?

বিশ হাজার ! তোমার কোন ধারণাই নেই। এই গয়নাগুলোর দাম কম করেও দু'লাখের কাছাকাছি।

বল কি ! যাক, কিছুদিনের জন্যে আমরা নিশ্চিন্ত। এবার তাহলে ওগুলো ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে।

তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? কলকাতায় গিয়েই ভাগাভাগি করা যাবে।

ভোরের প্লেনেই শশাঙ্ক আর মৃগাঙ্ক কলকাতা রওনা হল।

নিজেদের চেহারারও অদল-বদল করে নিল। মৃগাঙ্ক নিজের অনেক দিনের আদরের গোঁফ-দাড়ি সম্পূর্ণ কামিয়ে ফেলল। শশাঙ্ক ক্রেপ আর স্পিরিট গামের সাহায্যে চমৎকার এক দাড়ির অবতারণা করল নিজের মুখে।

প্লেন ছাড়ল বেলা নটার সময়। যাত্রী খুব বেশি ছিল না এই গ্লোব মাস্টার আকাশযানটিতে। একটানা উড়ে চলেছে প্লেনখানা।

শশাঙ্ক অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছিল ওদের সামনের সিটের একজোড়া পাঞ্জাবি তরুণ-তরুণীর সন্দেহজনক হাবভাব। উৎকর্ণ হয়ে রইল কি কথাবার্তা হয়: শোনবার জন্যে। কিছুক্ষণ একাগ্র থাকার পর খাপছাড়াভাবে দু'চারটে কথা কানে এল। শশাঙ্কর অনুমান করে নিতে কষ্ট হল না যে, ওরাও কোন বে-আইনী কাজে লিপ্ত আছে।

মৃগাঙ্ক হেলে বসে ঢুলছিল।

শশাঙ্ক তাকে ধাক্কা দিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলল।

মৃগাঙ্ক তন্দ্রাজড়িত গলায় বলল, যে যা করছে করতে দাও। পরের ব্যাপারে নাক গলিয়ে আমাদের লাভ কি ?

যথা সময় দমদমে ল্যান্ড করল গ্লোব মাস্টার।

ওরা ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের বাসে না গিয়ে ট্যাক্সিতেই কলকাতা যাবার মনস্থ করল। ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এসে লক্ষ্য করল, সেই পাঞ্জাবি জোড়াটিও ট্যাক্সিতে উঠে ড্রাইভারকে মিডিলটন রোডের একটা হোটেলে যাওয়ার নির্দেশ দিল।

কি মনে হওয়ায় মৃগাঙ্কও নিজের ট্যাক্সিচালককে নির্দেশ দিল ওই একই হোটেলে যাওয়ার জন্যে।

বিস্মিত গলায় শশাঙ্ক বলল, ওই হোটেলে যাচ্ছ যে ?

চলই না। দেখা যাক, ওদের কার্যকলাপ সত্যি সন্দেহজনক কিনা।

॥ গ ॥

হোটেল 'গ্রীন ভিউ'কে ঠিক প্রথম শ্রেণীর বলা চলে না।

মৃগাঙ্ক এই হোটেলেই উঠেছে শশাংককে নিয়ে।

সেই পাঞ্জাবি জোড়ার পাশের ঘরটাই ওরা ভাড়া নিয়েছে। কাউন্টার ক্লার্কের হাতে কুড়ি টাকা গুঁজে দিতেই তাদের নাম জানা গেছে, মিস্টার ও মিসেস কাপুর। আরো জানা গেছে, এই হোটেলে তাদের আগমন হয় প্রতি মাসেই। এবং তারা এলেই প্রত্যহ সন্ধ্যা থেকে সারা রাত্রি পর্যন্ত অনেকে আসেন তাদের সঙ্গে দেখা করতে। ওরা খরদৃষ্টি রাখল পাঞ্জাবি দম্পতির ওপর।

দুজনেই কেমন টাকার গন্ধ পাচ্ছে। ফাঁক তালে যদি কিছু লাভ হয়ে যায় মন্দ কি।

ওরা লক্ষ্য করল, দুপুরে কাপুর কোথায় বেরিয়ে গেল। ফিরল বিকেল পাঁচটার পর। তারপর থেকেই তার ঘরে নানা জাতের লোকের আসা-যাওয়া আরম্ভ হল। ব্যাপার কি ?

আগন্তুকরা ঘরের মধ্যে দু-এক মিনিট থেকেই বেরিয়ে যায়। আবার নতুন আগন্তুকের আগমন হয় -এইভাবে চলল প্রায় রাত আড়াইটে অবধি। ওদের দুজনের বিস্ময়ের ক্রমেই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। নিজেদের ঘরের দরজা ফাঁক করে যাওয়ার সময়টুকু ছাড়া একনাগাড়ে দেখেছে ওই দৃশ্য। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হোটেলের ম্যানেজার মাঝে মাঝে এসে কাপুরের সঙ্গে দেখা করে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়দিন দুপুরবেলা নিজেদের কর্মপন্থা ঠিক করে ফেলল মৃগাঙ্ক ও শশাঙ্ক। দুজনেই টাকার গন্ধ পাচ্ছে। সুতরাং ফাঁকতালে কিছু যদি

রোজগার হয়ে যায় মন্দ কি।

ক্রমে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল—সন্ধ্যাও হল এক সময়।

ঘড়ির কাঁটা সরে যেতে লাগল মাঝরাতের দিকে। আজও যথা নিয়মে দুপুরে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল কাপুর। ফিরেছে সন্ধ্যার কিছু আগে তারপর থেকেই বহুলোক তার ঘরে আসা যাওয়া আরম্ভ করেছে। কিন্তু তাদের আসা যাওয়া এত নিঃশব্দে সমাধা হচ্ছে যে তাও লক্ষ্য না করে উপায় নেই। সবই কেমন সন্দেহজনক।

দুটো বেজে গেল ক্রমে।

লক্ষ লক্ষ মানুষের কলকাতা ঘুমের কোলে ঢলে আছে। 'গ্রীন ভিউ' হোটেলের বোর্ডাররা স্বপ্নের জাল বুনছে। তারা কেন জেগে থাকবে এই গভীর রাতে? শুধু পাশাপাশি দুটি ঘরের চারজন প্রাণীর চোখে ঘুম নেই পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ওপর হয়ে গেল কাপুরের ঘরে কেউ আসেনি।

আর অপেক্ষা করার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পেল না মৃগাঙ্ক ও শশাঙ্ক দুজনেই নিজেদের ঘর থেকে বেরিয়ে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল বারান্দায় তারপর এগিয়ে গিয়ে কাপুরের ঘরের দরজায় টোকা মারল।

খুলে গেল দরজা।

দুজনে ঘরে প্রবেশ করে দেখল, একটা ক্যাশবাক্সর সামনে মিসেস কাপুর বসে রয়েছে। বাক্সর ডালাটা খোলা। অজস্র নোট রয়েছে ওই ডালা খোলা বাক্সর মধ্যে। মিসেসের হাত কয়েক দূরে মিস্টার বসে। তার সামনে বিরাট এক টেবিল। টেবিলের উপর বোধ হয় হাজারখানেক কাগজের মোড়ক রাখা রয়েছে।

ওদের দেখে কাপুর বলল, কতটা চাই?

মৃগাঙ্ক ভ্রূ কুঁচকে বলল. মালটা দেখি।

একটা মোড়ক এগিয়ে ধরল কাপুর।

মোড়ক খুলতে যে পদার্থ চোখে পড়ল, তা কোকেন ছাড়া আর কিছুই নয়। এতক্ষণে সমস্ত রহস্য পরিষ্কার হল। এরা কোকেনের চোরাকারবার করছে। কোকেনখোরেরা পুলিশের চোখ বাঁচিয়ে রাতের অন্ধকারে এখানে এসে মাল নিয়ে যাচ্ছে। যারা মাল নিয়ে যাচ্ছে তারা এই ব্যবস্থার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত সন্দেহ নেই। অবস্থা দেখে মনে হয় হোটেলের ম্যানেজারের প্রশ্রয় না থাকলে এরকমটা হওয়া সম্ভব নয়।

কাপুর বলল, দেখবার কিছুই নেই। চমৎকার জিনিস। দাম অবশ্য কিছু বেশি পড়বে। পুলিশের চোখ বাঁচিয়ে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় —ঝক্কি আর খরচ দুই বেশি, বোঝেন তো।

মৃগাঙ্ক মোড়ক ফিরিয়ে দিয়ে বলল, আমার এ সমস্ত জলো মালে দরকার নেই। আমি —তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে কাপুর বলল, জলো মাল কি বলছেন, ফ্লাশ ওয়ান মাল বলুন।

—চুলোয় যাক তোমার কোকেন। এ সমস্ত জিনিসে আমার ইণ্টারেস্ট নেই। আমি চাই ক্যাশবাক্সর মধ্যেকার ওই নোটগুলো।

কাপুর আর্ত চিৎকার করে উঠল, নোট—

মিসেস কাপুরের গলা চিরেও আর্তনাদ বেরিয়ে এল।

—চিৎকার করবার চেষ্টা করবেন না। আমার হাতে কি আছে দেখতে পাচ্ছেন। আপনাদের বাচালতাই আপনাদের মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

মৃগাঙ্ক পকেট থেকে রিভলবার বার করে এনেছে।

—আ-আপনারা কে? আমি তো…

—আমাদের জন্ম-ইতিহাস জানাবার জন্যে এখানে আসিনি। কোকেন বিক্রি করা কালো টাকাগুলো আমার চাই। শশাঙ্ক আর দাঁড়িয়ে থেক না। ক্যাশবাক্স থেকে টাকাগুলো তুলে নাও।

মিসেস কাপুর ক্যাশবাক্স আঁকড়ে ধরল।

শশাঙ্ক এগিয়ে গিয়ে এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে দিল। ক্যাশবাক্স থেকে নোটের তাড়াগুলো তুলে নিয়ে দুভাগ করে নিজের পকেটে রাখল। কিন্তু শেষরক্ষা হল না নির্বিঘ্নে। বিপর্যয় ঘটল এই সময়। কাপুর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শশাঙ্ক সরে গিয়েছিল। সে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে পড়ল মৃগাঙ্কর ঘাড়ে।

রিভলবারের ট্রিগারের উপর মৃগাঙ্কের আঙুল ছিল। অতর্কিতে ধাক্কা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গুলি ছুটে গেল—পরমুহূর্তে করুণ চিৎকারে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। বুলেটের ধাক্কায় ঘরের আরেক প্রান্তে গিয়ে পড়েছে কাপুর। রক্তে ভিজে উঠল কার্পেট। যন্ত্রনায় ছটফট করতে লাগল সে।

মৃগাঙ্ক হতভম্ব হয়ে গেছে।

শশাঙ্ক কিন্তু মনের ব্যালেন্স হারায়নি। কাল বিলম্ব না করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তার সামনে এখন সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। একে অবহেলা করলে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা হবে। মৃগাঙ্ক তাকে অনেক ঠকিয়েছে। আজ তাকে চূড়ান্তভাবে ঠকাবে সে। এতে পাপ নেই। কোন পাপ নেই।

সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই বাইরের দিক থেকে দরজার ছিটকিনি আটকে দিল। দ্রুত পায়ে নিজেদের ঘরে গিয়ে হাতে তুলে নিল গয়নার সুটকেশটা। কোকেন বিক্রির অজস্র টাকা পকেটে তো আছেই। এগিয়ে চলল ল্যাট্রিনের দিকে।

কাপুরের দরজায় তখন প্রচণ্ড ধাক্কা পড়ছে।

ধাক্কা দিচ্ছে মৃগাঙ্ক। এ ডাকে আর শশাঙ্ক সাড়া দেবে না। এখন সে স্বাধীন—অনেক টাকার মালিক। মৃগাঙ্ক সুরকে চেনে না। কোনদিন চিনত না। নাম পর্যন্ত শোনেনি কখনও।

—শশাঙ্ক, দরজা খোল। প্লীজ, দরজা খোল। আমার সর্বনাশ এই ভাবে করো না। খোল, খুলে দাও দরজা—

মৃগাঙ্কর গলা দিয়ে করুণ আকুতি ঝরে পড়ছে।

শশাঙ্কর মুখে উপচে পড়া হাসি। বিদায় বন্ধু। বিদায়—।

ল্যাট্রিন সংলগ্ন মেথর আসার ঘোরান সিঁড়ি দিয়ে শশাঙ্ক বাগানে নে গেল। হোটেলের মধ্যে তখন ছুটোছুটি আরম্ভ হয়ে গেছে। বোর্ডারঃ চেঁচামেচি করছেন। প্রকৃত ঘটনাটা কি, গুলির আওয়াজ এল কোন্ ঘ থেকে, এখনো কেউই হয়ত বুঝে উঠতে পারেনি। ও সমস্ত বিষয় নিয়ে মাথ ঘামাবার অবসর শশাঙ্কর এখন নেই।

সে বাগানের পাঁচিল টপকে রাস্তায় গিয়ে নামল।

তারপর মিলিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে।

ভোর হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ আগে।

চৌরঙ্গী পাড়ার এক অভিজাত হোটেলের ২২৩ নম্বর ঘরের বোর্ডারে ঘুম ভেঙে গেল। দামী বিছানায় এপাশ ওপাশ করে উঠে পড়ল সে। কা রাত্রের ঘটনা এখন দুঃস্বপ্নের মতই তার মনে পড়ছে।

কাপুর কি মারা গেছে?

মৃগাংক কি ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে?

এই প্রশ্ন দুটির উত্তর দিতে পারে আজকের যে-কোন দৈনিক সংবাদপত্র সুতরাং এখন প্রধান কাজ হল যে কোন একটি দৈনিকপত্র সংগ্রহ করা।

শশাঙ্কর মুখে এখন নকল দাড়ি নেই।

সে হাত বাড়িয়ে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল। ফোনে কাউন্টার ক্লার্ককে বলল, এখুনি ২২৩ নম্বর ঘরে যেন একখানা বাংলা দৈনিকপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই কাগজ এল।

প্রথম পাতার নিচের দিকে খবরটা ছাপা হয়েছে।

সাগ্রহে পড়ল শশাঙ্ক—

গভীর রাত্রে মিডিলটন রোডে লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড

গতকাল মিডিলটন রোডের একটি হোটেলে জনৈক পাঞ্জাবি যুবক খুন হইয়াছে। এবং একটি তরুণীকে অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, হোটেলের ম্যানেজার প্রায় রাত আড়াই ঘটিকার সময় গুলির আওয়াজ শুনিতে পান। তিনি শব্দ লক্ষ্য করিয়া দ্বিতলে আসেন এবং একটি লোককে বাগানের মধ্য দিয়া পলাইতে দেখেন। অন্যান্য বোর্ডারের সাহায্যে লোকটিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহার কাছে রিভলবার ছিল। ধৃত ব্যক্তি একদিন পূর্বে অন্য একজনের সহিত এখানে ঘরভাড়া লইয়াছিল। পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ আসিয়া মৃতদেহ আবিষ্কার করে। বহু গ্রেন কোকেনও তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয়। ধৃত ব্যক্তির সঙ্গীটিকে

খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। পুলিশ অনুমান করে কোন গভীর চক্রান্ত এই হত্যাকাণ্ডর সহিত জড়িত। ইত্যাদি।

অত্যন্ত খুশি মনে দৈনিকখানা সরিয়ে রাখল শশাঙ্ক।

যাক, আর কোন ভাবনা নেই। মৃগাঙ্ক ধরা পড়েছে—।

এর পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত।

কিছুদিন বিচার চলার পর মৃগাঙ্কর কুড়ি বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে গেল।

শশাঙ্ক নিশ্চিন্ত মনে ব্যবসায় নামল।

কোকেন বিক্রির যে এক লাখ টাকা সঙ্গে এনেছিল, তারই অর্ধেক দিয়ে লোহার কারবার আরম্ভ করল। গয়না বিক্রির কথা সে মোটেই চিন্তা করল না। কারণ এখন ও-পথ মাড়ালেই ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

ব্যবসা জমে উঠল।

শশাঙ্কর এখন তুঙ্গে বৃহস্পতি।

যাতে হাত দিচ্ছে তাতেই টাকা। তিন বছরের মধ্যে ট্যাংরায় কারখানা ফেঁদে বসল। আর সেই কারখানাই এখন বিরাট আকার নিয়েছে। প্রায় দু'হাজার লোক কাজ করে সেখানে। সরকারের কিছু চাহিদা মেটাতে পারছে এই কারখানা।

আর ভাববেন না শশাঙ্ক। অতীতের কথা ভাবতে গেলেই সারা শরীর ঝিমঝিম করে ওঠে তাঁর।

কোথায় সশব্দে তিনটে বাজল।

রাত তিনটে। এ তল্লাটে এখন বোধহয় আর কেউ জেগে নেই। শীতের এই ঝাঁ-ঝাঁ রাতে সকলেই ঘুমের কোলে ঢলে রয়েছে। চিন্তার অথৈ সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে তিনিই শুধু জেগে আছেন।

কিন্তু আর নয়, এবার বিছানায় আশ্রয় নেবেন শশাঙ্ক। ঘুমোবার চেষ্টা করবেন। ঘুমিয়ে পড়লে অন্তত কিছুক্ষণ মৃগাংককে ভুলে থাকা যাবে।

শশাঙ্ক শ্লথ গতিতে এগিয়ে গিয়ে বিছানার ওপর বসলেন।

বেশ বেলায় ঘুম থেকে উঠলেন শশাঙ্ক।

এপাশ-ওপাশ করতে করতে প্রায় পৌনে চারটের সময় ঘুমিয়েছিলেন তিনি।

ঘর থেকে বেরিয়ে বাথরুমে যাবার পথে তাঁর সঙ্গে সোমার দেখা হল। মন স্নিগ্ধ হয়ে উঠল তাঁর।

অনিন্দ্যসুন্দর না হলেও বেশ দেখতে সোমাকে।

একহারা ও দীর্ঘাঙ্গী।

গায়ের রঙ দুগ্ধধবল না হলেও ওকে ফর্সা বলা যায়।

সোমা চিন্তিত গলায় বলল, তোমার এত বেলায় ঘুম ভাঙল কাকা! শরীর খারাপ হয়নি তো?

না, না, বেশি রাত্রে ঘুমিয়েছিলাম, তাই উঠতে দেরি হয়ে গেল।

তোমাকে কতবার বলেছি রাত জেগে কাজ করবে না। তোমার আর সে-বয়েস নেই। কিন্তু আমার কথায় কান দিলে তো! সোমার গলায় অনুযোগ।

কাল কোন কাজ করিনি। হঠাৎ রাজ্যের পুরোন কথা মনে পড়ে যাওয়ায় ঘুম আসতে দেরি হল। তুমি কখন ফিরলে মা?

ঘণ্টাখানেক হল। দানাপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জারে ফিরেছি।

শশাঙ্ক বাথরুমে চলে গেলেন।

সোমার কথা ভাবতে ভাবতেই বাথরুমে গেলেন তিনি। ওই রকম দুর্দান্ত স্বভাবের বাপের যে এমন চমৎকার মেয়ে হতে পারে ভাবাই যায় না। প্রমথ তালুকদারের মেয়ে সোমা।

তালুকদারের সঙ্গে প্রথম পরিচয় মিডিলটন রোডের সেই গ্রীনভিউ হোটেলে। অবশ্য তাকে পরিচয় না বলে বারকতক চোখের দেখা বললেই ঠিক বলা হয়। বেনারস থেকে কলকাতা এসে, মৃগাঙ্কর সঙ্গে শশাঙ্ক যখন গ্রীনভিউএ উঠলেন—তালুকদার তখন সেখানকার সর্বময় কর্তা, অর্থাৎ ম্যানেজার।

তাঁরই ঢালাও প্রশ্রয়ে কোকেনের ব্যবসা চলেছে গ্রীনভিউ হোটেলে জাঁকিয়ে।

যাই হোক, কাপুর-হত্যা সংক্রান্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল। অত্যন্ত ভাল ভাগ্য বলতে হবে তালুকদারের। এই ব্যাপারের মধ্যে তাঁর জড়িয়ে পড়াই স্বাভাবিক ছিল। কারণ কাপুরের স্ত্রী কোর্টে জেরার মুখে সহজেই বলে দিতে পারত তালুকদার এই কোকেন-ব্যবসার সঙ্গে কি ভাবে জড়িত।

কিন্তু সে রকম অঘটন ঘটল না। সম্পূর্ণ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রইলেন তালুকদার।

এ সমস্ত বিষয় খবর কাগজের মাধ্যমে অবগত ছিলেন শশাঙ্ক।

এরপর কেটে গেছে দু'বছর।

পিছনে ফেলে আসা অনেক কিছুকে ইচ্ছে করেই ভুলে গেছেন শশাঙ্ক। মৃগাঙ্ককেই যখন তাঁর আর মনে নেই, তখন দেড়দিনে বার কয়েক দেখা তালুকদারকে মনে করে রাখার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

কিন্তু এমনই দুর্দৈব, একদিন ধূমকেতুর মতই তালুকদার তাঁর জীবনে উদয় হলেন। কি একটা কাজে স্টিল কনট্রোল অফিসে গিয়েছিলেন শশাঙ্ক। এনকোয়্যারি কাউণ্টার থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যটি জেনে নিয়ে নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। কাউণ্টারের ধারে সে সময় আরেকজন দাঁড়িয়েছিলেন। বলা বাহুল্য তিনি প্রমথ তালুকদার।

তালুকদার কি প্রয়োজনে সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তা অবশ্য বলা যাচ্ছে না। তবে শশাঙ্ককে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চমকে উঠলেন।

একটু মোটা হয়ে পড়লেও ব্যক্তিটি যে কে তা মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারলেন। তবু নিশ্চিন্ত হবার জন্যে এনকোয়ারি-ক্লার্ককে প্রশ্ন করলেন, এই মাত্র যিনি ভেতরে গেলেন তিনি কি শশাঙ্ক নাগ ?

হ্যাঁ।

তালুকদারের মনের মধ্যে ঝিলিক খেলে গেল। সময়টা তাঁর উপস্থিত ভাল যাচ্ছে না। ভগবান কি তবে মুখ তুলে চাইলেন। তিনি কাউন্টারের কাছে অপেক্ষা না করে নিচে নেমে এলেন। ফুটপাথে পায়চারি করতে আরম্ভ করলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে শশাঙ্কও নেমে এলেন। নিজের গাড়িতে উঠতে যাবেন তালুকদার পাশে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, চিনতে পারছেন ?

কই, না।

স্বাভাবিক। আমার মত স্মরণশক্তি সকলের হবে তার কোন অর্থ নেই। আমি গ্রীনভিউ হোটেলের এক্স ম্যানেজার প্রমথ তালুকদার।

শশাঙ্কর মনের মধ্যে ঝড় উঠল। প্রলয়ঙ্কর ঝড়।

এ লোকটা আবার এসময় উদয় হল কেন ?

তিনি মনকে সংযত করে, হাল্কা গলায় বললেন, ওহো, মনে পড়েছে বটে। কেমন আছেন বলুন ?

ভাল নয়। তবে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় মনে হচ্ছে সময়টা বোধহয় আমার ফিরল।

কেন ?

গাড়িতে যেতে যেতেই বলব।

তালুকদার নির্বিকার ভাবে গাড়ির মধ্যে গিয়ে বসলেন। অগত্যা শশাঙ্ককে স্টিয়ারিংএর সামনে বসতে হল। গাড়িতে স্টার্ট নিতে হল।

ডালহৌসি থেকে বেরিয়ে, এসপ্ল্যানেড পেরিয়ে গাড়ি দক্ষিণ দিকে ছুটে চলেছে। কারুর মুখে কথা নেই। এক অস্বস্তিকর পরিবেশ। শেষে শশাঙ্কই নীরবতা ভঙ্গ করলেন। বললেন, দেখুন মিঃ তালুকদার আমি কাজের মানুষ। যদি আপনার কোন বক্তব্য থাকে তবে বলুন। নইলে—

গাড়ি থেকে নেমে যান, এই তো ? আমি আপনার কাছে সাদামাটা ভাষায় প্রস্তাব করছি, আমার আর্থিক অবস্থা উপস্থিত খুব শোচনীয়। পুলিশের হাত থেকে বেঁচে গেলেও সেই গোলমালের পর হোটেলের মালিক আমাকে আর কাজে রাখতে চাননি। কাজেই—

আমি কি করতে পারি বলুন ?

চিবিয়ে চিবিয়ে তালুকদার বললেন, এখনো মৃগাঙ্ক সুরের সেই অজ্ঞাত সঙ্গীটির নামে ওয়ারেন্ট ঝুলছে। তার নাম-ঠিকানা পুলিশকে দেওয়া এখন আমার পক্ষে মোটেই কষ্টকর নয়।

বুকের মধ্যে উত্তাল সমুদ্রের প্রলয় নাচন চলেছে শশাঙ্কর।

ধরা গলায় বললেন, আপনি আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চান ?

আপনি বুদ্ধিমান লোক। বুঝতে পেরেছেন দেখছি। আমার একটা হিল্লে করে দিলেই আমি সমস্ত কথা ভুলে যেতে প্রস্তুত আছি।

হিল্লে ?

হ্যাঁ। ছেলেমেয়েদের হাত ধরে পথে দাঁড়াতে আমার আর খুব বেশি বিলম্ব নেই। দেখা যখন আপনার পেয়েছি তখন সেরকম অবস্থায় যাতে আমাকে পড়তে না হয়, সে ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে বইকি।

তালুকদার নির্লিপ্ত গলায় কথাগুলো বললেন।

কি কুক্ষণে শশাঙ্ক আজ স্টিল কনট্রোল অফিসে এসেছিলেন। তিনি এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছেন, তালুকদারকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে তাঁর জীবনের সমস্ত পরিকল্পনার এখানেই পূর্ণচ্ছেদ পড়ল।

তিনি একটু ভেবে নিয়ে বললেন, আপনার কে কে আছে ?

তিন ছেলে ও দুই মেয়ে। স্ত্রী বছর পাঁচেক হল মারা গেছেন।

হুঁ। মোটা অঙ্কের একটা চেক আপনাকে আমি দিতে পারি। কিন্তু টাকাটা ফুরিয়ে গেলে আবার আপনি আসবেন আমাকে বিরক্ত করতে। আপনার যাতে সত্যি উপকার হয় সেই ব্যবস্থাই করছি।

কি ব্যবস্থা ?

আপনার বড় ছেলেকে আমি নিজের কারখানায় চাকরি দেব।

কত টাকা মাইনে হবে ?

পাঁচশ টাকা।

বেশ। তবে আমার দুটি ছেলেকে চাকরি দিতে হবে।

দুজনকে ?—তাই হবে। আপনাকেও আইনসঙ্গতভাবে লিখে দিতে হবে, আর কোন ব্যাপারে আপনি ভবিষ্যতে আমাকে বিরক্ত করতে পারবেন না।

তালুকদার সম্মত হলেন।

এই ঘটনার পর আরো দু'বছর কেটে গেছে।

তালুকদার মাঝে মাঝে আসেন শশাঙ্কর কাছে। এখন তাঁর আর কোন আব্দার নেই। ছেলে দুটি কাজ করছে। সংসার চলছে ভাল ভাবে। কাজেই—

তখন লাউডন স্ট্রীটের বাড়ির নির্মাণ কাজ সবে শেষ হয়েছে। টালিগঞ্জ থেকে এখানে উঠে এসেছেন শশাঙ্ক। কিন্তু এত বড় বাড়িতে ভীষণ ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। পৃথিবীতে তিনি সম্পূর্ণ একা একথা যেন বড় বেশি করে মনে পড়ছে আজ! যদি কোন সন্তানের জনক হতেন তিনি। আজ এই বাড়ি হাসি উচ্ছ্বাসে ভরে থাকত। কিন্তু ভাগ্য তাঁকে ওখানেই চোখ ঠেরেছে। প্রচণ্ড বিদ্রূপ করেছে।

গৃহ-প্রবেশের কোন অনুষ্ঠান হয়নি। অথচ এটা না করলেও নয়। তাই একদিন কয়েকজনকে মধ্যাহ্ন আহারে আমন্ত্রণ করলেন। তালুকদারও এলেন দুই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। সেদিন প্রথম সোমাকে দেখলেন শশাঙ্ক।

লাজনম্র কিশোরী। দেখেই ভাল লাগল। বার বার মনে হতে লাগল এইরকম মেয়ে যদি থাকত তাঁর। অসীম স্নেহে তাকে ডুবিয়ে রাখতেন। নিজের অবসর অতিবাহিত করতেন তার আদর আব্দার শুনে।

শেষে আর থাকতে পারলেন না। কথাটা বলেই ফেললেন তালুকদারকে।

আমার একটা কথা রাখবেন ?

বলুন ?

আপনাকে আমি আর একটু হালকা করতে চাই।

কিভাবে বলুন তো ?

আপনি জানেন, আমার সব আছে। নেই শুধু সন্তান। আপনার মেয়ে সোমাকে দেখে অবধি আমার মনের মধ্যেকার অতৃপ্ত পিতৃত্ব মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। আপনি কি সোমার দায়িত্ব আমাকে দিতে পারেন ?

দ্রুত চিন্তা করলেন তালুকদার। প্রস্তাবটা অভাবনীয় হলেও মন্দ নয়। সোমা শশাঙ্কর কাছে থাকলে তাঁর অনেক দায়িত্ব কমে যায়। প্রচুর বৈভবের মধ্যে যে শুধু মানুষ হবে তাই নয়, ভাল ঘরে, ভাল বরের হাতেও পড়বে।

তবু তালুকদার বললেন, একটু ভেবে দেখি।

ভেবে দেখবার কিছু ছিল না। শুধু নিজের দরটা বজায় রাখলেন।

পরের দিন নিজের সম্মতি জানালেন। এবং দিন কয়েকের মধ্যেই সোমা চলে এল। তারপর আট বছর কেটে গেছে এই লাডউন স্ট্রীটের বাড়িতে তার। শশাঙ্ক প্রাণ ঢেলে তাকে ভালবেসেছেন। সোমার কোন ইচ্ছে অপূর্ণ রাখেননি।

এগারটার সময় কারখানায় গেলেন শশাঙ্ক।

নিজের অফিস-ঘরে ঢুকেই ইন্টারকামের চাবি ঘোরালেন।

ওপাশ থেকে সাড়া পাওয়া গেল, ইয়েস স্যার—

সুদেশকে পাঠিয়ে দিন।

সুদেশ মুখার্জি কারখানার চিফ ফোরম্যান। শশাঙ্ক তাকে পছন্দ করেন। অত্যন্ত ভাল ছেলে।

আবার ইন্টারকামের কাছে মুখ নামিয়ে আনলেন তিনি।

দেবেশবাবুকেও পাঠিয়ে দিন।

দেবেশ রাহা কারখানার প্রোডাক্সন ম্যানেজার।

এদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে এখুনি তিনি ব্যাঙ্কে যাবেন। গয়নার বাক্সটা একলা আনতে সাহস হচ্ছে না তাঁর। কলকাতা শহর, পথে গোলমাল হওয়া বিচিত্র নয়। তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন। আর হাঙ্গামা বাড়াবেন না। গয়নাগুলো মৃগাঙ্ককে দিয়ে দেবেন।

দেবেশ রাহা ঘরে প্রবেশ করলেন।

বয়স বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশের মধ্যে। উচ্চতায় খুব বেশি নন তিনি।

আঁটসাট দেহ। মাথায় চকচকে টাক।

গুড মর্নিং স্যার।

মর্নিং। বসুন।

চেয়ারে বসে পড়ে রাহা বললেন, আমায় ডেকেছেন?

হ্যাঁ। সুদেশকেও ডেকেছি। ও আসুক। তারপর বলছি কেন ডেকেছি আপনাদের।

সুদেশ এল। বছর আটাশের দীর্ঘাঙ্গ যুবক।

গায়ের রং কালো। সারা মুখে একটা মিষ্টিভাব ছেয়ে রয়েছে।

গুড মর্নিং স্যার।

মর্নিং—

সুদেশ বসল।

পিয়ার্সন ধরালেন শশাঙ্ক। এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন।

দেবেশ রাহার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনাদের দুজনকে এখুনি একবার আমার সঙ্গে ব্যাঙ্কে যেতে হবে।

ব্যাঙ্কে?

হ্যাঁ। ভল্ট থেকে গয়নার বাক্স নিয়ে আসতে হবে। একলা যেতে সাহস পাচ্ছি না। কয়েক লাখ টাকার গয়না আছে বাক্সটায়।

সোমাদেবীর বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেছে নাকি? রাহা প্রশ্ন করলেন।

এখনো ঠিক হয়নি। সোমার বিয়ের গয়না আলাদা গড়ান আছে। এই হীরের গয়নাগুলো আমার এক বন্ধুর গচ্ছিত ছিল। ফিরিয়ে দিতে হবে।

কথাটা শেষ করেই শশাঙ্ক ড্রয়ার খুললেন।

কি যেন খোঁজাখুঁজি করলেন।

নির্দিষ্ট বস্তুটিকে না পেয়ে তিনি আবার বললেন, ভল্টের চাবিটা এইখানে নেই দেখছি। বাড়িতেই আছে ওয়ার্ডরোবে। সুদেশ তুমি আমার গাড়িটা নিয়ে চলে যাও। সোমাকে বলবে, সে যেন তোমায় আমার চামড়ার কী-কেসটা দিয়ে দেয়।

উঠে দাঁড়াল সুদেশ। ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

ট্যাংরা থেকে লাউডন স্ট্রীট পেঁছাতে ওর সময় লাগল প্রায় চল্লিশ মিনিট, এত সময় লাগবার কথা নয়। মাঝে পথ জ্যাম ছিল এক জায়গায়, তাই দেরি হল।

নাগ হাউসের পার্লার পার হয়ে করিডরে এল সুদেশ।

এ-বাড়িতে ওর অবাধ গতি।

সোমা শান্তিনিকেতনে গিয়েছিল একথা ওর অজানা নয়। আজই ফিরেছে। পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে বোধহয়? নিশ্চয়ই তাই।

একটা বেয়ারকে দেখে বলল, মিশিবাবাকে খবর দাও।

উনি ড্রইংরুমে আছেন।

সুদেশ ড্রইংরুমে চলে গেল।

সোমা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছিল।

সুদেশ তার পিছনে গিয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, ওমর খৈয়াম বলেছেন—

বাতায়ন পাশে একলা দাঁড়ায়ে
কে গো বিরহিনী তুমি—

এই ধরনের আরো কি সমস্ত বলেছেন তিনি, মনে পড়ছে না।

মুখ ফেরাল সোমা—ওমা, তুমি—?

প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। জানলার ধারে যখন তুমি দাঁড়িয়ে আছ, তখন আমাকে গাড়ি থেকে নামতে আগেই দেখেছ।

সোফায় এসে বসল দুজনে।

মৃদু হেসে সোমা বলল, তর সইল না বুঝি। আমি ফিরেছি খবর পেয়েই কারখানা পালিয়ে চলে এলে?

কার কাছ থেকে খবর পাব?

কাকা হয়ত বলেছেন।

কারখানাটা গাল-গল্প করবার জায়গা নয় ম্যাডাম। ওখানে সব-সময় গুরুগম্ভীর কাজ-কর্ম হয়।

হয় বুঝি?

হয়ই তো। এখন আমি এসেছি একটা জরুরী কাজ নিয়ে।

চোখ বড় বড় করে সোমা বলল, বাড়িতে জরুরী কাজ?

হুঁ। শুনতে চাও নাকি?

ওতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আমি শুধু অবাক হচ্ছি তোমার ব্যবহার দেখে।

বিস্মিত গলায় সুদেশ বলল, কেন? আমার ব্যবহারে তুমি কি ব্যতিক্রম দেখলে?

আমি শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে এলাম। কোথায় তুমি আমাকে প্রশ্ন করবে ওখানে কি-কি দেখলাম, জায়গাটা আমার ভাল লাগল কিনা, তা নয়—

তোমার সখের প্রাণ, তাই ও সমস্ত হাল্কা ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ। আমি এখন কত সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে চিন্তিত আছি জান? যে কাজে আমি এখানে এসেছি, তুমি শুনতে চাইলে না কি করব। তোমার জন্যেই আসলে—

আমার জন্যে আবার কি হল? আকাশ থেকে পড়ল সোমা।

গম্ভীর গলায় সুদেশ বলল, ভল্টের চাবিটা নিতে এসেছি। মিঃ নাগ তোমার গয়নাগুলো বার করে দেখবেন, আরো কিছু গড়াতে হবে কিনা। তোমার নাকি কোথায় বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে—

আমার! এই মিথ্যুক—

বিশ্বাস না করলে আমি কি করব।

আমার বিয়ের ঠিক হতেই পারে না।

কেন ?

কাকা সমস্ত জানেন বোধহয়।

কি জানেন বল তো ?

তোমাকে নিয়ে আর আমি পারি না বাপু। কাকার কি চোখ নেই ? তোমার হাবভাব তিনি বুঝতে পারেননি মনে করেছ ?

আব তোমার ?

আমাদের বোঝা এত সহজ নয় ফোরম্যানসাহেব। জ্ঞানীরা বলেছেন, মেয়েদের মন বোঝা নাকি দেবতাদেরও অসাধ্য।—সোমা ঘেঁসে এল সুদেশের কাছে।—বল না কি হয়েছে ?

কি আবার হবে ? মিঃ নাগের কী-কেসটা নিতে এসেছি।

কেন ?

ভল্ট থেকে কোন্ এক বন্ধুর গচ্ছিত গয়না বার করবেন।

ও।

সুদেশ সোমাকে কাছে টেনে আনল।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলে বোধহয় ?

বয়ে গেছে ! তুমি কি ভাব তোমাকে বিয়ে করবার জন্যে হা-পিত্যেস হয়ে বসে আছি ?

সুদেশ মৃদু হেসে বলল, আছই তো। আমার মত সৎপাত্র আর পাচ্ছ কোথায় বল। কিন্তু আর নয়, কথায় কথায় অনেক দেরি করে ফেলেছি।

সোমা সরে এল ওর কাছ থেকে। বলল, আজ তো মহরম। ব্যাঙ্ক বন্ধের দিন। গয়না কিভাবে বার হবে শুনি ?

তা-ও তো বটে।

এই বুদ্ধি নিয়ে তোমরা কারখানা চালাও ? দিনক্ষণেরই জ্ঞান নেই।

সুদেশ আবার হাসল।

ওদের কারখানায় কোন মুসলমান কর্মী নেই। কাজেই মহরম, ঈদ ইত্যাদিতে ছুটি দেওয়া হয় না। এই ছুটিগুলো অন্যভাবে দেওয়া হয়।

সুদেশ ফোন করল শশাংককে।

তাঁকে জানাল কথাটা। তিনি চাবি আনতে নিষেধ করলেন।

ফোন ছেড়ে দিয়ে বলল, এবার চলি—

চলি মানে ?

কারখানায় ফিরতে হবে না ?

না ফিরলেও চলে। বলো তো কাকাকে ফোন করে তোমার ছুটি মঞ্জুর করিয়ে দিই !

তাহলে সহজেই তিনি বুঝতে পারবেন, নিজের লঙ্কার মাথা কিভাবে চিবিয়ে খেয়েছে তাঁর আদরের ভাইঝি। চলি এখন, সন্ধ্যার দিকে আসব।

সুদেশ ওখান থেকে বিদায় নিল।

গেট দিয়ে গাড়ি বেরিয়ে যাবার পর, পার্লার থেকে নিজের ঘরে চলে গেল সোমা। মুখে তার অল্প একটু হাসি লেগে আছে। ভীষণ ছেলেমানুষ সুদেশ। এত দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে, তবু ওর ছেলেমানুষি গেল না।

সোমা বিছানায় গা এলিয়ে দিল।

খাট-সংলগ্ন বুককেস থেকে একটা বই টেনে নিয়ে মনসংযোগ করল।

॥ চার ॥

মোটরের পিছনের সিটে হেলান দিয়ে বসে আছে সুদেশ।

দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে কনভার্টেবল প্লাইমাউথ।

প্রথম জীবনে প্রচুর কষ্ট করেছে সুদেশ। বাবা মারা যাবার পর মা আর ছোটভাইকে নিয়ে প্রচণ্ড অভাবের মধ্যে দিন কাটিয়েছে, কারখানায় কারখানায় ঘুরে বেড়িয়েছে, কেউ ওর সার্টিফিকেটও উলটে দেখেনি।

কিন্তু শশাঙ্ক নাগ এক কথায় চাকরি দিয়েছেন ওকে। ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথ পরিষ্কার করে দিয়েছেন। এখন ওর সংসারে কোন অভাব নেই। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও সুদেশ আজ পরিপূর্ণ। ওর মনকে ভরিয়ে রেখেছে সোমা।

সোমার সঙ্গে আলাপটা একরকম দৈবাৎ হয়ে যায়।

বছর দেড়েক আগেকার কথা। তখন সুদেশ চিফ ফোরম্যান হয়নি।

বিশ্বকর্মা পুজো ছিল কারখানায়। প্রতি বছর খুব ঘটা করে পুজো হয়। কারখানার কর্মীরা থিয়েটার করে। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানান হয়। এবার পুজোয় খুব ধুমধামের ব্যবস্থা হয়েছে।

এই সমস্ত ব্যাপারে শশাঙ্ক নাগের খুব উৎসাহ আছে। সমস্ত খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন। প্রথম থেকে শেষ অবধি বসে থিয়েটার দেখেন। সোমা কোনবার আসে না। এবার কি খেয়াল হল থিয়েটার দেখতে এল কারখানায়।

কেদার রায় অভিনীত হচ্ছে। গোঁফ কামিয়ে পুরুষরাই মেয়ে সেজেছে। ওই কারণেই মন খুতখুত করছে। আজকালকার দিনে এ-সমস্ত অচল।

তাকে ছটফট করতে দেখে শশাঙ্ক প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে মা?

আমার ভাল লাগছে না কাকা।

কেন, অভিনয় তো বেশ ভালই হচ্ছে?

তা হোক। আমার ভাল লাগছে না। আমি বাড়ি যাব।

কিন্তু মা, আমি যদি এখুনি বাড়ি ফিরি, তাহলে এরা খুব মনক্ষুণ্ণ হবে যে।

তুমি থাক। আমি ড্রাইভারের সঙ্গে চলে যেতে পারব।

উঁহু। এত রাতে তোমাকে ড্রাইভারের সঙ্গে ছেড়ে দিতে পারি না।

আচ্ছা দাঁড়াও, সন্দেশকে তোমার সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি।

সন্দেশকে ডেকে তিনি সোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে বললেন সন্দেশ সোমাকে আগে না দেখলেও তার পরিচয় জানত। নির্জন পথের ওপ দিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে। রাত এখন সাড়ে এগারটা।

পিছনের সিটে বসেছে সোমা। সন্দেশ বসেছে ড্রাইভারের পাশে হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দ করে গাড়ি থেমে গেল।

ড্রাইভার বলল, টায়ার ফেটে গেছে।

সোমা উদ্বিগ্ন গলায় বলল, তোমার কাছে এক্সট্রা টায়ার আছে তো?

না, মিশিবাবা।

এখন উপায়! কেমন ভয় করতে লাগল সোমার।

এধারটা একেই নির্জন, তার ওপর এত রাত্রে লোক-চলাচল একেবারে নেই

সন্দেশ বলল, আমাদের এখন ট্যাক্সির সন্ধান করতে হবে।

এখানে পাওয়া যাবে না। আমাদের হেঁটে এখান থেকে কিছুদূর এগিয়ে যেতে হবে। আসুন—

কিন্তু—

সন্দেশ সহজ গলায় বলল, আমার ওপর আপনি বিশ্বাস রাখতে পারেন আজ পাঁচ বছর আমি কারখানায় কাজ করছি। শশাঙ্কবাবু আমাকে খুব ভালভাবে চেনেন। আর চেনেন বলেই আপনাকে পৌঁছাবার ভার আমাকে দিয়েছেন।

লজ্জিত হল সোমা।

না, না, আমি কথাটা সেভাবে বলিনি। চলুন—

সন্দেশ ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি গাড়িতেই অপেক্ষা কর। আমি কোন অটোমোবাইল ফার্মকে বলে ব্রেকডাউন পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।

ওরা এগোল।

নীরবেই দুজনে আধ মাইলের মত রাস্তা হেঁটে চলে এল।

শেষে ট্যাক্সি পাওয়া গেল। বাড়ি পৌঁছতে সাড়ে বারোটা।

আমি তাহলে এখন চলি।

সন্দেশের দিকে পরিপূর্ণভাবে তাকাল সোমা।

এতক্ষণ মন বিক্ষিপ্ত থাকায় ওর দিকে ভাল করে তাকায়নি সোমা। আকর্ষণীয় স্মার্ট চেহারা।

ধীর গলায় বলল, কারখানায় ফিরবেন?

না। একটা ব্রেকডাউন ভ্যানের ব্যবস্থা করেই বাড়ি ফিরব।

ও চলে গেল।

চিবিয়েলে ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় আসতেই সোমা লক্ষ্য করল কেমন একটা সন্দেহ ভাব। চাকর-বাকরেরা সকলে লনে জড়ো হয়ে কি সমস্ত বলাবলি করছে।

সোমা শশাঙ্কর শোবার ঘরে গেল। কি হয়েছে জেনে নেবে তাঁর কাছ থেকে।

তাকে দেখেই শশাঙ্ক বললেন, শুনেছ মা, কাল মোটরটাকে সম্পূর্ণ ড্যামেজ করে রেখে গেছে গুণ্ডারা।

সেকি! ব্রেকডাউন ভ্যান যায়নি ওখানে?

গিয়েছিল বৈকি। তারাই তো দেখতে পায় ড্রাইভার অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, আর গাড়ির দামী দামী পার্টসগুলো কারা খুলে নিয়ে গেছে।

কি সর্বনাশ! কলকাতায় কি হচ্ছে দিন দিন।

শশাঙ্ক বললেন, সৌভাগ্যক্রমে সুদেশ তোমাকে নিয়ে চলে এসেছিল তাই, নইলে তোমার ভাগ্যেও অনেক নিগ্রহ ছিল।

সোমা শিউরে উঠল।

তোমার কিন্তু মা সুদেশকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

সোমা চুপ করে রইল।

কাল যদি সুদেশ তাকে পেঁছাতে না আসত, পথের মধ্যে চাকা বিভ্রাট হত ঠিকই—গুণ্ডারা আসত, তখন সেকি করত। অথচ সুদেশ যখন তাকে বলেছিল এগিয়ে গিয়ে ট্যাক্সির সন্ধান করতে হবে—তার মনে সন্দেহের মেঘ জমা হয়েছিল।

কাল খুব অভদ্রর মত ব্যবহার করেছে সোমা ওর সঙ্গে, এমন কি ও যখন রাত্রে বিদায় নেয় তখনো একটা কৃতজ্ঞতার কথা বলেনি। কাকা ঠিকই বলেছেন, সুদেশকে ধন্যবাদ জানান উচিত তার।

দুপুরে কলেজ থেকেই কারখানায় ফোন করে জানতে পেরেছিল সোমা যে, আজ সুদেশ কাজে আসেনি। তখন একটু ইতস্তত করে কারখানার টেলিফোন অপারেটরকে বলল, বলতে পারেন, ওঁর বাড়ির ঠিকানাটা কি?

আপনি হোল্ড করুন। আমি দেখে বলছি।

অপারেটরের কাছ থেকে ঠিকানা পাওয়া গেল সুদেশের। কলেজ থেকে খুব দূর নয়। কেশব সেন স্ট্রীটে ও থাকে। দুটোর পর কলেজ থেকে বেরিয়ে পড়ল সোমা। কালকের ভুল আজকে শুধরে নেবার জন্যে সচেষ্ট হয়েছে।

বাড়ি খুঁজে পেতে খুব কষ্ট হল না। একতলা বাড়ি।

দরজার কড়া নাড়ল সোমা।

একজন সুশ্রী বিধবা মহিলা দরজা খুলে দিলেন।

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন।

সোমা মৃদু গলায় বলল, সুদেশবাবু বাড়ি আছেন?

আছে। ওর জ্বর হয়েছে।

ও। তাহলে আমি বরং····

জ্বর এমন কিছু বেশি নয়। তুমি এস ভিতরে। দেখা করে যাও।

সোমা ভেতরে গেল। মহিলাটি দরজা বন্ধ করে বললেন, এস—

মহিলাকে অনুসরণ করে প্রথম ঘরটি পার হয়ে দ্বিতীয় ঘরে এল সোমা। মাঝারি সাইজের ঘরখানা। খাটের ওপর পাশ ফিরে শুয়ে আছে সুদেশ।

মহিলাটি বললেন, এই দেখ, কে তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

সুদেশবাবু মুখ ফেরাল। মুখ ফিরিয়েই বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর কোনরকমে বলল, আপনি ?

কালকের একটা ভুল সংশোধন করতে এলাম।

মা, চেয়ারটাকে এগিয়ে দাও। উনি বসুন। আর চা করে নিয়ে এস।

একটু হেসে চেয়ার টেনে নিয়ে বসল সোমা। বলল, আপনি ভীষণ ব্যস্ত হচ্ছেন। দুপুরে আমি চা খাব না।

মা বললেন, তা কি হয় মা, তোমার পরিচয় অবশ্য আমি জানি না। তবু অতিথিকে তো খালি মুখে যেতে দিতে পারি না।

সুদেশ বলল, এঁর বিরাট বড় পরিচয় আছে। এঁদেরই কারখানায় আমি কাজ করি।

মা বড় বড় চোখ করে তাকালেন সোমার দিকে, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মান্যবর অতিথির যোগ্য সম্মানের ব্যবস্থা করবার জন্যেই বোধহয়।

চমৎকার মহিলা আপনার মা। আমার খুব ভাল লাগছে।

সকলেই তাই বলে। কিন্তু আপনি যে আমাদের বাড়িতে আসবেন একথা স্বপ্নেও আমি ভাবিনি। কিসের ভুল সংশোধনের কথা বলছিলেন ?

কাল আপনি আমার সঙ্গে না থাকলে আমাকে ভয়ানক বিপদে পড়তে হত।

কি রকম ?

সমস্ত খুলে বলল সোমা।

বলেন কি, এত কাণ্ড হয়ে গেছে ?

এর পরও যদি আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে না আসি, তাহলে কি আমার নরকেও স্থান হবে ?

হাসল সুদেশ। বেশ জোরেই হাসল। বলল, হাজার পড়াশুনা করলেও আমাদের দেশের মেয়েরা এখনো সেই সনাতন ভাব নিয়ে পড়ে আছে।

মা এলেন। হাতে সরবতের গেলাস আর মিষ্টির প্লেট। বললেন, চা নাই খেলে। সরবত আর মিষ্টিটুকু খেয়ে নাও।

সভয়ে সোমা বলল, ওই বুঝি টুকু হল ?

এমন কিছু বেশি নয়। ঠিক খেয়ে ফেলতে পারবে।

জলযোগ সেরে, গল্প-গুজব করে ওখান থেকে দেড় ঘণ্টা পরে উঠল সোমা। তার মনের মধ্যে অচেনা এক রাগ গুনগুনিয়ে চলেছে একটানা। মনোরম এক আবেশ নিয়ে বাড়ি ফিরল সোমা।

এরপর দুজনের প্রায় দেখা হয়েছে।

স্বাভাবিক ভাবেই আলাপ ক্রমে ক্রমে অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়েছে।

....একটা ঝাঁকুনিতে চটকা ভাঙল সুদেশের।

গাড়ি কারখানার কার-পার্কিংএ এসে থেমেছে।

সোমা ভেবেছিল বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়বে।

কাল সারারাত জেগেই আছে ট্রেন জার্নির দরুণ। তবু ঘুম আসছে না।

সুদেশ চলে গেছে কখন।

এখন হয়ত কারখানার কাজে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে রয়েছে ফোরম্যানসাহেব। এই সমস্ত অলস মুহূর্তে সুদেশের কথা ভাবতে বড় ভাল লাগে সোমার।

রজত ঘরে এল।

সোমার দাদা রজত। তালুকদার কয়েক বছর হল কলকাতার বাসা তুলে দিয়েছেন। চন্দননগরে থাকেন। মাঝে মাঝে আসেন মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে। ভাইরাও আসে।

রজতকে দেখে সোমা গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, দাদা, তুমি—

বিশেষ দরকারে তোমার কাছে এলাম।—নিজের খোঁচা খোঁচা দাড়ি-কন্টকিত মুখে হাত বুলোতে বুলোতে রজত বলল, কিছু টাকার দরকার।

টাকা! এই তো সেদিন সত্তর টাকা নিয়ে গেলে।

আবার দরকার আছে বলেই তো চাইছি।

ছোটবোনের কাছ থেকে এইভাবে বারবার টাকা নিতে লজ্জা করে না? তাছাড়া এত টাকা আমি পাবই বা কোথা থেকে?

লজ্জা! লজ্জা থাকলে মানুষকে অনেক ব্যাপারে ঠকতে হয়। অনর্থক আমি ঠকতেই বা যাব কেন। টাকা কোথায় পাবে বলছিলে? শশাঙ্ক নাগের তো কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আছে। তোমার আর ভাবনা কি?

তাঁর টাকাকে খোলামকুচির মত খরচ করবার অধিকার আমার নেই।

এত কথা আমি শুনতে চাই না। উপস্থিত একশো টাকা আমার দরকার।

দৃঢ় গলায় সোমা বলল, আমি তোমায় আর এক পয়সা দিতে পারব না। কাকাও এসমস্ত পছন্দ করেন না।

করেন না নাকি?

তিনি তোমাদের জন্যে অনেক করেন। প্রয়োজন হলেই বাবাকে টাকা দেন। দিদির বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন ভাল জায়গায়। তোমার ও খোকনের কারখানায় চাকরি করে দিয়েছেন। প্লিজ দাদা, তুমি ফ্লাশ খেলা ছেড়ে দাও—এভাবে পরের কাছে আর হাত পাততে হবে না।

আমি উপদেশ শুনতে আসিনি। তুমি টাকাটা দেবে কিনা বল?

না।

আমি তাহলে চুপ করে থাকব না বলে রাখছি। আমি সমস্ত কথা জানি।

কথা! কি কথা?

ওই সুদেশ—ছোঁড়াটার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি? সময়-অসময় তোমার কাছে সে কেন আসে, তুমিই বা তার বাড়ি কেন যাও, ভাবো এ-বিষয়ে আমি

অজ্ঞ ? সব জানি। এ কথাগুলো শশাঙ্ক নাগের কানে উঠলে তোমার কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছ ?

তুমি এত নিচে নেমে গেছ ভাবতে পারিনি। তুমি স্বচ্ছন্দে তাঁর কানে কথাগুলো তুলতে পার। আর নিশ্চয়ই তোমার কিছু বলার নেই ? আমি এখন বিশ্রাম করব।

রজত এক মিনিট সোমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর তীক্ষ্ম গলায় বলল, আমি এখন যাচ্ছি। তবে শশাঙ্ক নাগের এত টাকা আমি তোমায় একলা ভোগ করতে দেব না।

সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সোমা চিরদিনই লক্ষ্য করেছে, রজত এই ধরনের কথা বলে। সব সময় নিজের মেজাজকে সপ্তমে চড়িয়ে রেখেছে।

পিয়ার্স'নে ঘন ঘন টান দিচ্ছেন শশাঙ্ক।

ঘড়ির কাঁটা যতই এগিয়ে চলেছে, তাঁর বুকের মধ্যেকার গুমগুম ধ্বনি ততই বাড়ছে। মৃগাঙ্ক কি বিশ্বাস করবে আজ ব্যাঙ্ক বন্ধ বলেই তিনি গয়নার সুটকেশটা আনতে পারেননি !

শোবার ঘরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পদচারণা করছেন শশাঙ্ক নাগ। ঠোঁটের আগায় পিয়ার্স'ন জ্বলছে। ডিনার শেষ করেছেন কিছুক্ষণ আগে। টেবিলে গিয়ে শুধু বসেছিলেন। খাননি কিছুই।

দশটা বাজল।

সোমা এসে বলল, এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন কাকা।

এসে গেছে ! বুকের মধ্যে এবার যেন হাতুড়ি পড়তে লাগল। তিনি ড্রইংরুমের দিকে ধাবিত হলেন।

মৃগাঙ্ক কোচে বসে সিগারেট টানছিলেন। শশাঙ্ককে দেখে বললেন, মেয়েটি কে হে ?

কোন্ মেয়েটি ?

আমাকে এ-ঘরে বসিয়ে যে তোমাকে খবর দিতে গেল ?

আমি ওকে দত্তক নিয়েছি।

বাঃ, বেশ চয়েজ তোমার। এই ধরনের মেয়ে পেলে বিয়ে করি।

তুমি বিয়ে করবে !

কেন, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে কি কেউ বিয়ে করে না ? ভাল কথা, সামনের সপ্তাহ থেকে আমি এ-বাড়িতেই থাকব। তোমার কারখানায় একটা মানানসই চাকরি আমাকে জোগাড় করে দিও।

মৃগাঙ্কর কথার ধরনে ক্রমেই অতল জলে তলিয়ে যাচ্ছেন শশাঙ্ক। কোনরকমে তিনি বললেন, এ সমস্ত তুমি কি বলছ ?

নার্ভাস হয়ে গেলে দেখছি।

তুমি কি সুস্থভাবে আমাকে বাস করতে দেবে না মৃগাঙ্ক ?

না। তোমার বিবেচনার গুণে কুড়িটা বছর আমাকে জেলের মধ্যে ঘানি টানতে হত, কিন্তু সরকার অনুগ্রহ করে বারো বছরেই আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। আর সেই বারো বছর তুমি রাজভোগ খেয়েছ। এখনো তোমার সুস্থভাবে বাঁচার ইচ্ছে ?

কিন্তু তুমি তো বলেছিলে, গয়নার বাক্সটা পেলে তোমার আর কিছু চাই না ?

বলেছিলাম ঠিকই। কিন্তু মত যে পালটাব না এরকম কোন অ্যাসিওরেন্স দিয়েছিলাম কি ? যাক, ও-কথা পরে হবে। এখন গয়নার বাক্সটা এনে দাও।

আজ ব্যাঙ্ক বন্ধ ছিল। আনতে পারিনি। কাল···

অজুহাত আরম্ভ করলে ?

অজুহাত নয়। তুমি খোঁজ নিয়ে দেখতে পার আজ মহরমের জন্যে ব্যাঙ্ক বন্ধ ছিল কিনা।

বেশ, কাল আসব। কাল যেন আমায় খালি হাতে ফিরে যেতে না হয়।

মৃগাঙ্ক উঠে দাঁড়ালেন।

॥ পাঁচ ॥

পরের দিন বেলা এগারটার সময় দেবেশ রাহা ও সুদেশকে সঙ্গে নিয়ে শশাঙ্ক ব্যাঙ্কে গেলেন। ভল্ট থেকে গয়নার বাক্সটা বার করে আনলেন।

গয়নাগুলো মিলিয়ে দেখলেন সব ঠিক আছে।

অফিস ঘরের আয়রণ চেস্টে ভরে রাখলেন সুটকেশটা।

রাহাকে সমস্তক্ষণ বসিয়ে রাখলেন অফিস ঘরে। শুধু লাঞ্চের সময় এক ঘণ্টার জন্যে বাইরে যেতে দিলেন। দেবেশ রাহা ফিরে এলে তবে নিজে লাঞ্চে গেলেন। আয়রণ সেফের মধ্যে থাকলেও, এত টাকার জিনিস ব্যাঙ্কের বাইরে রাখা খুবই রিস্কি।

বিকেলে বাড়ি ফেরার সময় গয়নার সুটকেশটা নিয়ে যখন তিনি গাড়িতে উঠলেন, তখন বন্দুকধারী দুজন গেটম্যানকে সঙ্গে নিয়ে নিলেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে মনের মধ্যেটা খচখচ করছে শশাঙ্কর। এত টাকার গয়না তুলে দেবেন মৃগাঙ্কর হাতে ! কিন্তু উপায় কি ? গয়নাগুলো না পেলে সে কি তাঁকে ছেড়ে কথা বলবে ? হয়ত—। আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন।

এক সময় প্লাইমাউথ বাড়ির হাতার মধ্যে ঢুকল। সুটকেশ নিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন শশাঙ্ক। কোন দিকে না তাকিয়ে ওপরে চলে গেলেন। বারান্দাতেই তাঁর তালুকদারের সঙ্গে দেখা হল।

তালুকদার সোমার সঙ্গে কথা বলছিলেন।

তাঁকে দেখে মৃদু হেসে শশাঙ্ক প্রশ্ন করলেন, কখন এলেন ?

আধ ঘণ্টাটাক হল। আপনার হাতে একটা সুটকেশ দেখছি ?

এখন এ-বাড়িতে অবারিত দ্বার তালুকদারের। ঘন ঘন না হলেও মেয়ের

সঙ্গে দেখা করতে মাঝে মাঝে আসেন তিনি।

কি আছে ওতে কাকা? সোমাও প্রশ্ন করল।

গয়না আছে মা। শশাঙ্ক বললেন, আমার এক বন্ধুর গচ্ছিত এগুলো।

তালুকদার বলে উঠলেন, আপনাকে বিশ্বাস করে এক বাক্স গয়না গচ্ছিত রাখবেন -এরকম বন্ধু আপনার কেউ আছে বলে তো জানি না।

এই কথায় অত্যন্ত বিরক্ত হলেন শশাঙ্ক।

সোমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার বাবার চা জল-খাবারের ব্যবস্থা করো আর এক কাপ কফি আমাকে পাঠিয়ে দাও।

তিনি নিজের ঘরে চলে গেলেন।

তালুকদার ভ্রু কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইলেন কোমরে হাত দিয়ে। দেখলেন, শশাঙ্ক ঘরে গিয়ে ওয়ার্ডরোব খুলে সুটকেশটা রাখলেন তার মধ্যে।

কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময় মৃগাঙ্ক এলেন।

শশাঙ্ক তাঁর হাতে গয়নার সুটকেশটা তুলে দিলেন। বললেন, এবার তুমি যাও।

দাঁড়াও, আগে বাক্সটা খুলে দেখে নিই।

দেখবার কিছু নেই। আমি বলছি সব ঠিক আছে।

বেশ। এখন তাহলে উঠলাম। কাল কারখানায় আবার তোমার সঙ্গে দেখা করছি।

আবার কিসের জন্যে দেখা করবে?

শশাঙ্ক সঙ্কিত হলেন।

আমার একটা চাকরি চাই তোমাকে বলিনি? তাহলে ওই কথাই রইল। – মৃগাঙ্ক সুটকেশটা হাতে নিয়ে ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে গেলেন!

রাস্তায় তখন ট্যাক্সির মধ্যে বিরূপাক্ষ অপেক্ষা করছিল। মৃগাঙ্ককে সুটকেশ হাতে আসতে দেখে তার চোখ দুটো চকচকিয়ে উঠল। মৃগাঙ্ক তার পাশে এসে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি গতি নিল।

বিরূপাক্ষ প্রশ্ন করল, খুব সহজে দিয়ে দিলে তো?

দেবে না মানে? এতবড় বুকের পাটা তার আছে নাকি? শশাঙ্ককে মুহূর্তের মধ্যে আমি কোথা থেকে কোথা নিয়ে যেতে পারি সে জ্ঞান তার আছে। কাল থেকে তাহলে এগুলো বিলি-ব্যবস্থায় লেগে পড়।

বেশ।

ট্যাক্সিতে আর কোন কথা হল না!

বাসায় পেঁৗছেই বিরূপাক্ষ বলল, সুটকেশটা খুলুন। গয়নাগুলো দেখে একবার চোখ সার্থক করি।

মৃগাঙ্ক সুটকেশ খুললেন।

কিন্তু একি! গয়না কোথায়?

সুটকেশের মধ্যে কাগজের টুকরো আর কিছু পাথরের কুচি—এছাড়া আর

কিছু নেই। শেষ পর্যন্ত তাঁকে ঠকাল শশাঙ্ক? শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠে চলেছে মৃগাঙ্কর। কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছে।

বিরূপাক্ষ বলল, একি মশাই? সুটকেশ খুলে দেখে নেননি। এরকম আহাম্মুকের মত কাজ কেউ করে নাকি?

মৃগাঙ্ক একথার কোন উত্তর না দিয়ে ঝড়ের বেগে সুটকেশটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। রাস্তায় নেমেই কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা ট্যাক্সি পেলেন। পঁচিশ মিনিটের মধ্যে আবার পেঁছিলেন লাউডান স্ট্রীটে। হাঁকাহাঁকি করে শশাঙ্ককে ডেকে পাঠালেন ড্রইংরুমে। তখন সারা শরীর মৃগাঙ্কর কাঁপছে।

শশাঙ্ক বিস্মিত গলায় বললেন, কি হল? তুমি আবার এলে যে?

মৃগাঙ্ক সুর ফেটে পড়লেন।

সুটকেশের ডালাটা খুলে বললেন, আমি জানতে চাই, এসমস্ত কি?

আঃ, ষাঁড়ের মতন চেঁচাচ্ছ কেন? এ সমস্তর আমি কি জানি।

জান না মানে? গয়নাগুলো বার করে নিয়ে, কতকগুলো পাথরের টুকরো ভরে সুটকেশটা আমাকে দিয়েছ, আবার বলছ জান না!

সত্যি আমি জানি না। গয়নাগুলো ওর মধ্যেই ছিল।

ছিল তো গেল কোথায়?

তার উত্তর তুমিই ভাল করে দিতে পারবে - ভ্রূ কুঁচকে শশাঙ্ক বললেন, গয়নাগুলো যে তুমিই বার করে নাওনি তার ঠিক কি? নতুন করে কিছু আদায় করবার জন্যে এইভাবে আবার উদয় হলে হয়ত।

শশাঙ্ক—চিৎকার করে উঠলেন মৃগাঙ্ক, চালাকি করবার জায়গা পাওনি। ছোটলোক, ইতর কোথাকার—

চেঁচাতে তোমাকে একবার মানা করেছি। পরের বাড়িতে রাত দুপুরে এসে এইভাবে চেঁচামেচি করাটা যে কতদূর ভদ্রতা, প্রশ্ন সেটাই!

আমি তোমাকে শেষবার প্রশ্ন করছি, তোমার আসল উদ্দেশ্যটা কি? তুমি গয়নাগুলো দিতে চাও কি না?

আমি তোমাকে গয়নার সুটকেশটা হ্যাণ্ডওভার করে দিয়েছি মৃগাঙ্ক। তার মধ্যে গয়না ছিল। এখন তুমি যদি এসে বল, গয়না ছিল না, তাহলে আমি কোথা থেকে গয়নাগুলো এনে দেব বল?

মৃগাঙ্ক আর কিছু বলার অবকাশ পেলেন না, সোমা ঘরে এল।

তাকাল দুজনের দিকে অবাক হয়ে।

শশাঙ্ক আবার বললেন, তুমি এবার যাও মৃগাঙ্ক, রাত বেড়ে চলেছে।

মৃগাঙ্ক কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। অগ্নিময় দৃষ্টি হেনে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

কি হয়েছে কাকা?

তেমন কিছু নয়। ও আমার পুরানো বন্ধু। যাও, তুমি শুয়ে পড় গিয়ে।

তুমিও নিজের ঘরে যাও।

অন্যমনস্কভাবে একটা পিয়ার্সন ধরালেন শশাঙ্ক।

ভোররাত্রে ঘুম ভেঙে গেল সোমার।

কাল বিকেল থেকেই তার মন বিশেষ ভাল নেই। রজতের সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার ব্যাপারটা বেশ কিছু দূর গড়িয়েছে। তালুকদারের সেই কারণেই আগমন হয়েছিল। মেয়েকে তিনি বেশ কিছু কথা শুনিয়েছেন। রজতকে নাকি এভাবে অপমান করা যুক্তিসঙ্গত হয়নি ইত্যাদি।

সোমা অবশ্য কিছু বলেনি।

সত্যি কথা বলতে কি, সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। টাকা, আর টাকা। এত টাকা কেন দরকার হয় রজতের—তালুকদারেরই বা হয় কেন? হোক, তাতে অবশ্য কোন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এই অবান্তর চাহিদা বেশির ভাগ সময় মেটাতে হয় সোমাকে। শশাঙ্কর চোখ বাঁচিয়ে কত টাকা সে সংগ্রহ করতে পারে? অবশ্য একথা খুবই সত্যি যে, তার যে-কোন ব্যাপারে শশাঙ্কর দরাজ প্রশ্রয় রয়েছে। তাই বলে কি অন্যায় সুযোগ বারবার নেওয়া উচিত?

সোমা জানে যতদিন এইভাবে থাকবে, ততদিন এই আতান্তরের হাত থেকে তার নিস্তার নেই। এই পরিস্থিতি থেকে তাকে একমাত্র বাঁচাতে পারে সুদেশ। সন্ধ্যার সময় কাল তালুকদার চলে যাবার পর অতিষ্ঠ মনে সুদেশকে ফোন করেছিল। বলেছিল, আজ খুব ভোরেই এখানে আসতে। কথা আছে।

এত তাড়াতাড়ি গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করার ইচ্ছে ছিল না। গ্রাজুয়েট হবার পর ধীরে-সুস্থে সমস্ত কিছু হলেই হত। কিন্তু কাল সকালেই শশাঙ্ক বলেছেন, কিছুদিনের জন্যে তিনি ইংল্যান্ড যেতে চান। ব্যবসা সংক্রান্ত কি সমস্ত সেখানে করবার আছে। কাজেই শশাঙ্ক না থাকলে তালুকদার আর রজত তো তাকে আরো পেয়ে বসবে।

আরো খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ করবার পর, ছ'টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে উঠে পড়ল সোমা। ঘর থেকে বেরিয়ে পার্লারে এল। শশাঙ্ক তো দূরের কথা, বাড়ির চাকর-বাকরও এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি।

বেতের একটা চেয়ার টেনে বসল সোমা। শীতের সকালের কনকনে হাওয়া গায়ে এসে লাগছে। সুদেশ এসে উপস্থিত হল এই সময়। বলল, এত জোর তলব কেন?

এই সকালে বিছানা থেকে উঠে আসতে তোমার খুব কষ্ট হয়েছে, না?

এই কলকাতায় কেন, তোমার ডাক পেলে শীতের সকালে খালি গায়ে আমি গ্রীনল্যান্ডে গিয়ে উপস্থিত হতে পারি।

সোমা হাসল।

পার নাকি? খুশি হলাম। এখন আমার ঘরে এস, কথা আছে।

দুজনে সোমার ঘরে এল।

এইবার বলতো ব্যাপারটা কি? সহাস্যে সুদেশ প্রশ্ন করল।

তুমি তো জান, বাবা আর দাদা মিলে সব সময় টাকা টাকা করে আমায় অস্থির করে রেখেছেন। আমি এ বাড়িতে আছি যেন শুধু দুয়ে নেওয়া যন্ত্র হিসেবে। কিন্তু এ ব্যাপারটাকে আমি আর বাড়তে দিতে চাই না।

কিভাবে একে রোধ করতে চাও তুমি?

সুদেশের মুখের দিকে তাকিয়ে হালকাভাবে সোমা বলল, আমি যদি এ-বাড়িতে না থাকি, তাহলে সুন্দরভাবে ব্যাপারটার ওপর যবনিকাপাত হয়।

অর্থাৎ?

সব কথা পরিষ্কার করে আমাকেই বলতে হবে বুঝি? তুমি আমাকে বিয়ে করে এ-বাড়ি থেকে নিয়ে যেতে পার না?

সুদেশ আপাদমস্তক একবার সোমাকে দেখে নিল। তারপর তার কাঁধে হাত রেখে গাঢ় গলায় বলল, শুধু এই কারণেই তুমি বুঝি আমাকে বিয়ে করতে চাও?

বাঃ, তাই বললাম নাকি?

তাই তো বললে।

তুমি বাপু ভীষণ অবুঝ। বিয়ে তো আমাদের একদিন হবেই। এই কারণে না হয় একটু আগাম হল। চল, চায়ের টেবিলে। কাকা বোধহয় এতক্ষণ উঠে পড়েছেন।

এই সাত-সকালে তিনি আমাকে এখানে দেখলে কি ভাববেন বল তো?

ভাবলেই বা। ভালই হবে তো। তাঁর কাছে তোমার আর্জি পেশ করতে তোমার অনেক সুবিধা হবে। এত—

সুদেশ সোমাকে নিজের কাছে টেনে আনল। বলল, তোমাকে এখন কি বলতে ইচ্ছে করছে জান? বলতে ইচ্ছে করছে

রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতা তো? থাক, সাত-সকালে কাব্য করে দরকার নেই। এস—

মৃদু হেসে ওর কাছ থেকে সরে এল সোমা।

ওরা আবার পার্লারে এল। বসল দুজনে।

শশাঙ্কর খাস-বেয়ারা কালীপদকে দেখতে পেয়ে সোমা বলল, কাকা উঠেছেন?

আজ্ঞে তিনি তো ঘরে নেই। অনেকক্ষণ নেমে এসেছেন।

নেমে এসেছেন! এত সকালে বেরিয়ে গেলেন নাকি?

কালীপদ বিনীতভাবে বলল, গাড়ি গেরাজে রয়েছে বেরিয়ে যাননি। দেখি আবার কোথায় গেলেন।

কালীপদ কয়েক পা এগিয়েছে মাত্র, এমন সময় আরেকজন বেয়ারাকে ভীতভাবে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। সে সোমার দিকে তাকিয়ে কাঁপা গলায় বলল, ড্রইংরুমে সাহেব অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছেন।

সে কি!

একই সঙ্গে চেয়ার থেকে উঠে ড্রইংরুমের দিকে ছুটল সোমা ও সুদেশ।

বেয়ারার কথা মিথ্যে নয় ; ওরা গিয়ে দেখল, কোচের ওপর বসে সামনে সেণ্টার টেবিলটার ওপর মাথা রেখে পড়ে আছেন শশাঙ্ক নাগ। তাঁর পরনে শ্লিপিং স্যুট। সুস্থ লোকটার হঠাৎ কি হল ?

সুদেশ শশাঙ্ককে তুলে ধরতে গিয়েই চমকে উঠল। শরীর এত ঠাণ্ডা কেন ? শক্তও হয়ে উঠেছে যেন ! তবে কি—? ও তাড়াতাড়ি তাঁর পালস্ পরীক্ষা করল। না, সন্দেহের কোন অবকাশ আর নেই।

কি হল ? কি দেখলে ? সোমা ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করল।

উনি মারা গেছেন।

মারা গেছেন ? কি বলছ তুমি !

আমার তো তাই মনে হচ্ছে। তবু ডাক্তারকে একবার কল দেওয়া দরকার। আমি এখুনি চক্রবর্তীকে ফোন করে দিচ্ছি।

দু' হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বসে পড়ল সোমা।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই ডাঃ চক্রবর্তী এলেন।

শশাঙ্কর দেহ পরীক্ষা করে গম্ভীর মুখে বললেন, অন্তত পাঁচ ঘণ্টা আগে মারা গেছেন মিস্টার নাগ।

সুদেশ প্রশ্ন করল, হার্ট ফেলিওর বোধহয় ?

আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না।

আপনার কি মনে হচ্ছে ডাক্তার চক্রবর্তী ?

স্বাভাবিক মৃত্যু নয় বলেই মনে হচ্ছে। এক্ষেত্রে ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে আমি নিজেকে বিপদগ্রস্ত করতে চাই না।

আপনি কি বলতে চাইছেন ডাক্তার ? ভেজা চোখে সোমা বলল, কাকা, কি সুইসাইড করেছেন ?

মে বি হোমিসাইড। আমি এখন চলি। আপনারা আর দেরি না করে পুলিশে খবর দিন।—ডাঃ চক্রবর্তী বিদায় নিলেন।

কালবিলম্ব না করে পুলিশে খবর দেওয়া হল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই স্থানীয় থানা ইনচার্জ আনন্দ মল্লিক সদলে এলেন। মৃতদেহের ওপর তীব্র দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, বডি পোস্টমর্টেমে পাঠাতে হবে।

হ্যাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীটের বাইরের ঘরে বসে বাসব পেসেন্স খেলছিল।

শৈবাল বসেছিল খবরের কাগজে মুখ ডুবিয়ে।

সকাল তখন সাড়ে সাতটা।

বাসব তাস থেকে মুখ তুলে বলল, মিলছে না। তিনবার চেষ্টা করেও একবার মেলাতে পারলাম না।

শৈবাল সাড়া দিল না।

কি এত পড়ছ ডাক্তার ? খবরের কাগজে আজ-কাল খবর থাকে নাকি ?

আজ আছে। শৈবাল বলল, তোমার মনে লাগে এমন একটা খবর আজ আছে।

খবরের কাগজওয়ালাদের বুদ্ধি-বিবেচনা মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দেয় দেখছি। তা খবরটা কি ?

পরশু দিন রাত্রে সুবিখ্যাত লৌহ ব্যবসায়ী শশাঙ্ক নাগ মারা গেছেন। পুলিশের ধারণা কেউ তাঁকে খুন করেছে।

দেখি, দেখি।—বাসব কাগজটা নিল।

সংবাদটা পড়ে বলল, বিশেষ কিছু লেখেনি। ভদ্রলোকের বাড়ি ছিল লাউডন স্ট্রীটে। এই অঞ্চলেই। এখন ওখানকার থানা ইনচার্জ কে তোমার মনে আছে ডাক্তার ?

কেন, আনন্দ মল্লিক। তোমার তো সে খুব ভক্ত লোক হে।

হুঁ। তাহলে ভরসা করা যায় মল্লিক যদি হালে পানি না পায়, তবে সাহায্যের জন্যে আমার কাছে আসতেও পারে।

বাসবের কথা শেষ হবার পরই কলিংবেল বেজে উঠল।

বাহাদুর দরজা খুলে দিতে যুবক শ্রেণীর একজন ঘরে প্রবেশ করল।

তার মুখে ভয়-চকিত ভাব।

সে বলল, আমি বাসববাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

বলুন। আমিই—।

ইন্সপেক্টার আনন্দ মল্লিকের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে বিশেষ সাহাযোর আশায় এলাম।

বাসব শৈবালের দিকে তাকাল।

সাধ্যে কুলালে নিশ্চয়ই সাহায্য করব।

খবরের কাগজে পড়ে থাকবেন, ব্যবসায়ী শশাঙ্ক নাগ খুন হয়েছেন। আমি সেই সম্পর্কেই আপনার কাছে এসেছি।

ও। আপনার নামটা জানতে পারি কি ?

সুদেশ মুখার্জি। আমি নাগ আয়রণ ওয়ার্কসের চীফ ফোরম্যান। পুলিশ অবশ্য তদন্ত করছে। তবে আপনি কেসটা টেক আপ করলে, হত্যাকারী অনেক তাড়াতাড়ি ধরা পড়বে বলে আমি মনে করি।

এই ব্যাপারে আপনাকে অত্যন্ত ইন্টারেস্টেড মনে হচ্ছে ?

আমি মৃত মিস্টার নাগের ভাইঝির অনুরোধে আপনার কাছে এসেছি। তাছাড়া ব্যক্তিগত ইন্টারেস্ট যে আমার একেবারেই নেই তা নয়। মিস্টার নাগ আমার চরম দুর্দশার দিনে আমায় চাকরি দিয়েছিলেন। আমাকে স্নেহ করতেন। তাই আমি চাই হত্যাকারী অবিলম্বে ধরা পড়ুক।

বাসব কি একটু চিন্তা করল। তারপর বলল, বেশ, আমি আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। কাজ তাহলে এখুনি আরম্ভ করা যেতে পারে ?

নিশ্চয়ই।

বাসব এবার শশাঙ্ক নাগ কি প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়ে মোটামুটি খোঁজ-খবর নিল। তারপর প্রশ্ন করল, মারা যাবার আগে মিঃ নাগের সঙ্গে আপনার কবে শেষ কথা হয়?

সেই দিনই দুপুরবেলা। আমাকে নিয়ে উনি ব্যাঙ্কে গিয়েছিলেন।

ব্যাঙ্কে কেন?

সুদেশ ব্যাঙ্ক থেকে গয়নার বাক্স আনার কথা উল্লেখ করল।

হুঁ। ইন্সপেক্টার মল্লিকের সঙ্গে দেখা করা দরকার। তিনি বোধহয় আসবার সময় তাকে মিঃ নাগের বাড়িতেই দেখে এসেছি।

চলুন, তাহলে ওখানেই যাওয়া যাক। ডাক্তার, উঠে পড়।

থমথম করছে বাড়িটা।

পার্লারেই ইন্সপেক্টারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বাসবের। হোমিসাইড স্কোয়াডের সুবিখ্যাত বসুচৌধুরীও ছিলেন।

তিনি বাসবকে দেখে মৃদু হেসে বললেন, যাক, এসে পড়েছেন তাহলে। কিছুটা নিশ্চিন্ত এবার আমরা নিশ্চয়ই হতে পারি।

বাসবও একটু হাসল। বলল, কিরকম বুঝছেন?

মিস্টার নাগ আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রথমে সকলের ধারণা হয়েছিল। কিন্তু মৃতদেহের পজিশন দেখে এবং পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট পড়ে সহজেই বুঝতে পারা গেছে তাঁকে কেউ খুন করেছে।

মৃতদেহের পজিশন কিরকম ছিল?

বসুচৌধুরী বললেন, কোচের ওপর বসেছিলেন তিনি। মাথাটা ছিল সেণ্টার টেবিলের ওপর। ডান হাতটাও ছিল সেখানে। দু-আঙুলের ফাঁকে একটা সিগারেটের টুকরো গোঁজা ছিল, সিগারেটের ইঞ্চি দেড়েক পোড়া ছাই নিটোলভাবে যুক্ত ছিল টুকরোটার সঙ্গে। অর্থাৎ সিগারেট খেতে খেতেই হঠাৎ মৃত্যু এসে পড়ে।

পোস্টমর্টেমের রিপোর্টে কি বলা হয়েছে?

রিপোর্টে বলা হয়েছে, তাঁর শরীরের মধ্যে বিচিত্র এক ভেষজের সন্ধান পাওয়া গেছে। ওই ভেষজই মৃত্যুর কারণ। সেই ভেষজের সন্ধান পাওয়া গেছে আবার সেই সিগারেটের টুকরোটার মধ্যে থেকে।

ওই যে ভেষজের উল্লেখ করলেন, ওটা কি ধরনের?

এখনো ঠিক বুঝতে পারা যায়নি। ডাক্তাররা ও বিষয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন।

আপনি বলতে চান, ওই বিষাক্ত ভেষজ সিগারেটে প্রয়োগ করে মিস্টার নাগকে খুন করা হয়েছে?

ঠিক তাই।

শরীরের কোথাও উণ্ড আছে?

না।

আর কোন সূত্র পাননি তাহলে ?

এবার আনন্দ মল্লিক কথা বললেন, বড় রকমের সূত্রের সন্ধান আমরা পেয়েছি।

অর্থাৎ ?

আপনি নিশ্চয়ই জানেন, দীর্ঘমেয়াদির কয়েদিরা জেল থেকে বেরুবার পরও অনেক সময় তাদের ওপর ওয়াচ রাখা হয়।

শুনেছি।

খুনের অপরাধে মৃগাঙ্ক সুর নামে একজন লোকের কুড়ি বছর জেল হয়েছিল। কিন্তু তার আচার-আচরণের জন্যে তাকে বারো বছর পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। কয়েকদিন হল সে জেল থেকে বেরিয়েছে। তার ওপর ওয়াচ রাখা হয়েছিল। আমি খবর পেয়েছি, মৃগাঙ্ক পর পর তিনদিন রাত ন'টার পর এ বাড়িতে এসেছে। এমন কি খুনের দিন রাত্রে দু'বার তাকে আসতে দেখা গেছে।

তাই নাকি ?

এবাড়ির একজন বেয়ারা মৃগাঙ্কর ছবি দেখে সনাক্ত করেছে। সে বলেছে, মৃগাঙ্কর সঙ্গে মিস্টার নাগের তিনদিনই উত্তেজিতভাবে কি সমস্ত কথাবার্তা হয়েছে।

আপনি তাহলে মৃগাঙ্ককে সন্দেহ করছেন ?

তাকে আমি একটু নেড়ে-চেড়ে দেখতে চাই। ইন্সপেক্টার মল্লিক বললেন, ঠিকানা আমাদের কাছে আছে। মৃগাঙ্ককে ডেকে থানায় নিয়ে যাবার জন্যে লোক পাঠিয়েছি।

মিস্টার নাগ মারা গেছেন কোথায় ? শোবার ঘরে ?

না, ড্রইংরুমে।

বাসব বলল, আমি ড্রইংরুমটা একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই।

বেশ তো। আসুন—

ড্রইংরুমে তালা দেওয়া ছিল।

একজন কনস্টেবল মোতায়েন ছিল সেখানে।

বসুচৌধুরী বিদায় নিলেন এই সময়।

যাবার সময় বাসবকে বলে গেলেন, আমার অফিসে একদিন আসুন। কেসটার বিষয় ভাল করে আলোচনা করা যাবে।

শৈবাল ও আনন্দ মল্লিককে সঙ্গে নিয়ে বাসব ড্রইংরুমে প্রবেশ করল। ঘরের চারিদিকে তাকাল। গৃহস্বামীর রুচির পরিচয় চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে। খুঁটিয়ে দেখতে লাগল চারিধার। তারপর এগিয়ে গেল সেণ্টার টেবিলটার কাছে। এর ওপর মাথা রেখে মারা গিয়েছিলেন শশাঙ্ক নাগ। বাঁ-দিকের কোচের পাশে একটা চোদ্দ-পনেরো ইঞ্চির সুটকেশ রাখা রয়েছে।

বাসব সুটকেশটা খুলল। সম্পূর্ণ ঝকঝকে নতুন জিনিসটা। কিন্তু সুটকেশের মধ্যে রয়েছে রাজ্যের কাগজের টুকরো ও পাথরের কুচি। আশ্চর্য! ও সুটকেশ বন্ধ করল।

হঠাৎ ওর নজরে পড়ল সেণ্টার টেবিলের ওপর রাখা অ্যাসট্রের ওপর। গোটা তিনেক সিগারেটের টুকরো রয়েছে তাতে। একটা টুকরো তুলে নিল বাসব। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। লেবেলটা পুড়ে যায়নি। সোনালি অক্ষরে লেখা রয়েছে, পিয়ার্সন। ফিলা—ডেলফিয়া। ইউ. এস. এ।

বাসব বলল, ভদ্রলোক বেশ সৌখীন ছিলেন।

শৈবাল বলল, বাড়ির চতুর্দিকে তাকালে তো তাই মনে হয়।

শুধু তাই নয়, সিগারেটও খেতেন আমেরিকান ব্র্যাণ্ড।

বাসব ঘরের জানলাগুলো পরীক্ষা করল। যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিল এগিয়ে গিয়ে সেটা দেখতে লাগল খুঁটিয়ে। ওর চোখ আটকাল গিয়ে চৌকাঠের কাছে। চৌকাঠের ওপর একটু খানি মাটি পড়ে রয়েছে। বোধহয় জুতো থেকে ঝরে যাওয়া মাটি।

কাগজে মাটিটুকু মুড়ে নিয়ে পকেটস্থ করল বাসব। এর আগে অবশ্য সিগারেটের টুকরোটা পকেটে চালান দিয়েছে।

এখানকার কাজ শেষ হয়েছিল।

ওরা তিনজন বেরিয়ে এল ড্রইংরুম থেকে।

বারান্দায় সুদেশ, তালুকদার ও দেবেশ রাহা দাঁড়িয়েছিলেন।

তালুকদার ও দেবেশ রাহার সঙ্গে পরিচয় হল বাসবের।

ও বলল, আপনাদের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। তবে তার আগে আমি সোমাদেবীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিতে চাই। মিস্টার মুখার্জি, আপনি একবার এদিকে শুনুন।

সুদেশকে একপাশে টেনে নিয়ে গেল বাসব। বলল, সোমাদেবীর কি কোন অসুবিধা হবে এখন আমার সঙ্গে দেখা করতে?

নিজের ঘরে ও অপেক্ষা করছে আপনার জন্যে।

ধরা পড়ে গেলেন কিন্তু?

ধরা! কিসের?

উনি বললে অবশ্য কিছু বলবার ছিল না। ও কথাটায় বিশেষ কিছু কি ইণ্ডিকেট করছে না মিস্টার মুখার্জি?

সুদেশ মাথা নত করল।

আপনাদের ঘনিষ্টতা কত দিনের?

বছর কয়েকের।

মিস্টার নাগ একথা জানতেন?

জানতেন বলেই আমাদের ধারণা।

সুদেশকে অনুসরণ করে বাসব সোমার ঘরে প্রবেশ করল।

সোমা জানলার পাশে দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়িয়েছিল বিষাদের মূর্তিমতি ছবি হয়ে।

সুরূপা মেয়েটিকে খুঁটিয়ে দেখল বাসব। ওরা ঘরে প্রবেশ করবার পর

সোমাও ফিরে তাকিয়েছিল ; বলল, বসুন।

বাসব একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল, আপনি আমাকে এই কাজে নিয়োগ করেছেন সুদেশবাবুর মুখে শুনলাম। যদিও আপনার মনের অবস্থা ভাল থাকার কথা নয়, তবু তদন্তের সুবিধার জন্যে গোটা কয়েক প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই।

বলুন ?

মিস্টার মুখার্জি, আপনি যদি বারান্দায় গিয়ে অপেক্ষা করেন, তাহলে বিশেষ ভাল হয়।

বেশ তো, আমি যাচ্ছি।

সুদেশ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে বাসব বলল, মারা যাবার দিন ভল্ট থেকে কিছু গয়না মিস্টার নাগ নিয়ে এসেছিলেন, একথা আপনি জানতেন ?

জানতাম।

কিভাবে জানলেন ?

কাকা বলেছিলেন, গয়নাগুলো তাঁর এক বন্ধুর। গচ্ছিত ছিল তাঁর কাছে।

কত টাকার গয়না ছিল, এবিষয়ে তিনি কিছু বলেছিলেন ?

না।

আচ্ছা, গয়নাগুলো ব্যাঙ্ক থেকে কিসের মধ্যে ভরে আনা হয়েছিল বলুন তো ?

একটা সুটকেশে করে।

ড্রইংরুমে যে সুটকেশটা রাখা রয়েছে, সেইটাই কি ?

হ্যাঁ।

যেদিন মিস্টার নাগ মারা যান, সেদিন সন্ধ্যা থেকে শুতে যাবার আগে পর্যন্ত আপনার নজরে বিশেষ কিছু পড়েছিল কি ?

বিশেষ কিছু—সোমা একটু ভেবে নিয়ে বলল, কই না। তবে ডিনারের পর কাকা ড্রইংরুমে গিয়ে কার সঙ্গে কথা বলছিলেন। হঠাৎ চেঁচামেচির শব্দ পেয়ে ও-ঘরে গেলাম। কাকা তখন আগন্তুক লোকটিকে বলছেন, মৃগাঙ্ক, অনেক রাত হল। এখন তুমি যাও।

তারপর ?

তারপর আমিও কাকাকে বললাম, তুমি শুয়ে পড় গিয়ে। তিনি শুতে গেলেন। আমিও নিজের ঘরে চলে গেলাম।

মিঃ নাগ আপনার নিজের কাকা ছিলেন ?

না, আমি তাঁর এক বন্ধুর মেয়ে। তিনি আমাকে দত্তক নিয়েছিলেন।

ও। আপনার আত্মীয়-স্বজনরা সকলে কোথায় থাকেন ?

চন্দননগরে। বাবা আসেন মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ করতে ?

আপনার বাবার সঙ্গে মিঃ নাগের নিশ্চয়ই খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল ?

একটু চুপ করে থেকে সোমা বলল, খুব ঘনিষ্ঠ বোধহয় ছিল না। দুজনে

দুজনকে আপনি সম্বোধন করে কথা বলতেন।

হুঁ। আপনাকে আর আমি বিরক্ত করব না। পরে হয়ত আবার আপনার কাছে আসতে হতে পারে।

বাসব ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এল বারান্দার সেই অংশে—যেখানে ইন্সপেক্টর মল্লিক, দেবেশ রাহা, প্রমথ তালুকদার ও সুদেশ রয়েছে।

প্রমথ তালুকদারের দিকে তাকিয়ে বাসব বলল, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার সময় মিঃ মল্লিক বলেছিলেন, আপনি মিঃ নাগের বন্ধু। তখন মোটেই বুঝতে পারিনি সোমাদেবী আপনারই মেয়ে।

ভ্রু কুঁচকে হাসি হাসি মুখ করবার চেষ্টা করলেন তালুকদার।

চলুন পার্লারে গিয়ে বসি। কিছু কথা আছে আপনার সঙ্গে।

আমার যা বলবার সমস্তই পুলিশকে বলেছি।

তা হয়ত বলেছেন। কিন্তু এমনও তো কিছু কথা থাকতে পারে, যা আপনি পুলিশকে বলেননি, অথচ আমি জানতে চাই। আসুন—

অনিচ্ছার সঙ্গে বাসবকে অনুসরণ করলেন তালুকদার।

শৈবাল ও আনন্দ মল্লিক গেলেন সঙ্গে।

চারজনে পার্লারে এসে বসলেন।

কি জানতে চান, বলুন?

মিঃ নাগের সঙ্গে আপনার পরিচয় কতদিনের?

বছর দশেকের।

আপনার মেয়েকে তিনি হঠাৎ দত্তক নিলেন কেন?

খুনের সঙ্গে এই সমস্ত কথার কি কোন সম্পর্ক আছে?

আছে, আবার নেইও। বাসব সিগারেট ধরিয়ে বলল, অর্থাৎ কোন্ ঘটনা যে কোন্ ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত, তা এখন বলা খুবই দুস্কর। কাজেই সমস্ত কিছুই আমাকে জেনে নিতে হবে। তারপর সেই ঘটনার মিছিলের মধ্যে থেকে আসল ব্যাপারটাকে টেনে বার করতে হবে। আমার প্রশ্নের উত্তর দিন মিঃ তালুকদার।

বোধহয় খেয়ালের বসে। মিঃ নাগ বেশ খেয়ালী লোক ছিলেন।

আপনার সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা হয় কবে?

মারা যাবার আগের দিন সন্ধ্যেবেলা।

শুনলাম আপনি মাঝে মাঝে এ-বাড়িতে আসেন। সেদিন এমনি এসেছিলেন, না বিশেষ কোন কারণে?

কোন কারণে নয়, এমনি এসেছিলাম। তালুকদার নিরস গলায় বললেন, আর কোন প্রশ্ন নিশ্চয়ই আপনার নেই? দেবেশ রাহার মুখে শুনছিলাম ডাকাত-খুনেদের ধরার ব্যাপারে নাকি আপনি অতি যোগ্য লোক। কিন্তু··· কথাটা তিনি শেষ করলেন না।

মৃদু হাসল বাসব। প্রমথ তালুকদারের বিদ্রূপকে গায়ে না মেখে বলল,

আরেকটা প্রশ্ন আছে। সেদিন মিঃ নাগ যখন কারখানা থেকে ফিরে আসেন, তখন তাঁর হাতে একটা গয়নার স্যুটকেশ ছিল। আপনি দেখেছিলেন ?

দেখেছিলাম। আমার সামনেই সে গয়নার স্যুটকেশটা ওয়ার্ডরোবে তুলে রেখেছিল।

ধন্যবাদ। আর কোন প্রশ্ন আমার নেই।

তালুকদার চলে যাবার পর মল্লিক বললেন, পৃথিবীতে কত শ্রেণীর যে লোক আছে, তার হিসেব কে রেখেছে। যাই হোক, আর কারুর সঙ্গে কথা বলবেন নাকি ?

দেবেশ রাহাকে ডেকে পাঠান। তাঁর সঙ্গে কথা বলে নিই এই ফাঁকে।

॥ ছয় ॥

চল্লিশের কোঠা পেরিয়েছেন দেবেশ রাহা।

আঁটসাঁট চেহারা। ধবধবে গায়ের রঙ।

যোগ্য লোকের সমাদর শশাঙ্ক নাগ সব সময় করতেন। তাই প্রডাকসন ম্যানেজারের পদ সহজেই এঁকে তিনি দিয়েছিলেন।

বাসব এক নজর তাঁকে দেখে নিয়ে বলল, আপনাকে গোটা কয়েক প্রশ্ন করতে চাই।

বেশ তো।

আপনি তো মিঃ নাগের সঙ্গে অনেক দিন আছেন। বলতে পারেন তাঁর কোন শত্রু ছিল কিনা ? অর্থাৎ ব্যবসার ব্যাপারে কারুর সঙ্গে শোচনীয় রকমের মনোমালিন্য হওয়ার দরুণ কেউ তার শত্রু হয়ে পড়েছিল কিনা ?

না। অন্তত আমি জানি না।

সেদিন তাকে খুব ভীত দেখাচ্ছিল কি ?

না। তবে মনে হচ্ছিল যেন খুব চিন্তিত।

মিঃ তালুকদারকে আপনি চেনেন ?

চিনি। ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা সত্ত্বেও মিঃ নাগ তাঁকে পছন্দ করতেন না।

কি রকম ?

এই প্রসঙ্গে তিনি আমাকে একদিন বলেছিলেন—রাহা বললেন লোকটা অত্যন্ত লোভী আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে অথচ সোমা ওরই মেয়ে, কত সংযত চরিত্রের।

হুঁ। বাসব উঠে দাঁড়াল। বলল, আমার এখনকার মত কাজ শেষ হয়েছে। মিস্টার রাহা, আমি হয়ত কালই আপনাদের কারখানায় গিয়ে উপস্থিত হতে পারি।

বেশ তো, আসুন না।

ঢং ঢং করে ছ টা বাজল।

শৈবাল একটা ইংরাজী পত্রিকার পাতা উলটে চলেছে। পাতাই উলটাচ্ছে শুধু, কোন কিছু পড়ার উৎসাহ তার আছে বলে মনে হচ্ছে না।

পাতা উলটোবার ফাঁকে ফাঁকে শৈবাল একটা বন্ধ দরজার দিকে তাকাচ্ছে।

আরো মিনিট কুড়ি কাটল। বন্ধ দরজাটা খুলে গেল। বেরিয়ে এল বাসব।

ওর মুখে অল্প একটু হাসি। ডান হাতের দু'আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট।

বাসব বসতে বসতে বলল, কতক্ষণ এসেছ ডাক্তার?

ঘণ্টা দেড়েক হবে। ল্যাবরেটারিতে এতক্ষণ কি করছিলে?

কয়েকটা জিনিসের ওপর পরীক্ষা চালাচ্ছিলাম। ভালই ফল পাওয়া গেছে।

কি রকম, শুনি?

বাসব ঘন ঘন সিগারেটে বার কয়েক টান দিয়ে বলল, তার আগে তুমি আমার একটা প্রশ্নের ভেবে-চিন্তে উত্তর দাও।

বল?

আজ সকালে মিঃ নাগের বাড়িতে তুমিও আমার সঙ্গে ছিলে। সকলের কথাবার্তা শুনেছ। কেসটার সম্বন্ধে তোমার মতামত কি?

শৈবাল মিনিট দুয়েক চুপ করে থেকে বলল, কেসটা খুবই জটিল সন্দেহ নেই। অকারণে কেউ কাউকে খুন করে না। মিঃ নাগের খুন হওয়ার পেছনে নিশ্চয়ই একটা বড় রকমের যুক্তি আছে। আমার মনে হয়, গয়না সংক্রান্ত ব্যাপারেই তিনি খুন হয়েছেন।

বাসব সিগারেটের টুকরোটা য়্যাসট্রেতে ফেলে দিয়ে বলল, তারপর?

আমরা জানতে পেরেছি ড্রইংরুমে যে সুটকেশটা পাওয়া গেছে, তার মধ্যেই গয়নাগুলো ছিল। অথচ এখন নেই। কাজেই ধরে নেওয়া যায়, হত্যাকারী নাগকে খুন করে গয়নাগুলো নিয়ে সরে পড়েছে।

সেদিন গয়নার সুটকেশটা নিয়ে নাগ ড্রইংরুমে গিয়েছিলেন। সোমাদেবী মৃগাংক নামে কোন লোককে সেখানে উপস্থিত দেখেছিলেন। এই লোকই হয়ত বারো বছর পরে ছাড়া পাওয়া মৃগাঙ্ক সুর। এমনও তো হতে পারে গয়নাগুলো মৃগাংককেই দেবার কথা ছিল নাগের।

হয়ত তোমার কথাই ঠিক।—শৈবাল বলল, তবে একটা প্রশ্ন আবার তাহলে দেখা দেবে। মৃগাঙ্ক গয়নাগুলো নিয়ে সুটকেশের মধ্যে কাগজের টুকরো আর পাথরের কুচি ভরে রাখবেন কেন?

বাসব শৈবালের পিঠ চাপড়ে বলল, হিয়ার, হিয়ার ডাক্তার। তোমার অভূতপূর্ব রকমের উন্নতি হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। বাস্তবিকই এ একটা প্রশ্ন বটে। যদি ধরেও নেওয়া যায়, মৃগাঙ্ককেই গয়নাগুলো দিয়েছেন মিস্টার নাগ, তবে সুটকেশের মধ্যে ওই জঞ্জাল ভরা কেন? আচ্ছা, আর কিছু বলবার আছে এসম্বন্ধে তোমার?

আর কিছু নেই। শুধু একজনের হাবভাব কিছু সন্দেহজনক বলে আমার মনে হয়েছে।

কার?

প্রমথ তালুকদারের। এবার এই কেসটার সম্বন্ধে তোমার মতামত শুনতে চাই।

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, যদিও কোন দৃঢ় ভিত্তি আমাদের সামনে নেই, তবু গয়নাগুলোর সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের যে-কোন সম্পর্ক আছে, এ বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে একমত। এখন মোটিভ সম্বন্ধে জোরাল সূত্র সংগ্রহ করতে গেলে আমাদের প্রথমে মিস্টার নাগের সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজ নিতে হবে। সে পরের কথা। এখন তোমাকে আমার গোটা কয়েক আবিষ্কারের বিষয় বলি। তুমি লক্ষ্য করে থাকবে, আমি নাগ-হাউস থেকে তিনটে জিনিস সঙ্গে করে এনেছিলাম। সেগুলো হল, ড্রইংরুমের চৌকাঠে পড়ে থাকা খানিকটা মাটি বা গুঁড়ো, সেই সুটকেশটা ও একটা সিগারেটের টুকরো।

হ্যাঁ, আমি দেখেছিলাম।

সেগুলো নিয়ে আমি এতক্ষণ ল্যাবরেটরিতে ব্যস্ত ছিলাম। পরীক্ষা করে চমৎকার ফল পাওয়া গেছে। প্রথমে সিগারেটের টুকরোটার কথা ধরা যাক। পিয়ার্সন খুবই দামী এবং নামী আমেরিকান সিগারেট। শশাঙ্ক নাগ এই সিগারেটের ভক্ত ছিলেন এটা খুব বড় সংবাদ নয়। সংবাদ আছে ওই টুকরোটার মিক্সচারের মধ্যে। তুমি আগেই ইন্সপেক্টারের মুখে শুনেছ, পোস্টমর্টেমের রিপোর্টে বলা হয়েছে, মিঃ নাগের শরীরের মধ্যে থেকে কোন এক ভেষজের সন্ধান পাওয়া গেছে। মৃত্যু হয়েছে ওতেই। এই ভেষজ ইঞ্জেক্ট করে শরীরের মধ্যে ঢোকান হয়ে থাকতে পারে। তবে প্রথমেই আমার মনে হয়েছিল সিগারেট খেতে খেতেই যখন তিনি মারা গিয়েছিলেন, তখন সিগারেটের মধ্যেই হয়ত কোন কারচুপি করা আছে। মিক্সচারে পরীক্ষা করতেই সমস্ত জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। মিক্সচারের মধ্যে আমি সাদা সাদা গুঁড়োর সন্ধান পেলাম। প্রথমে মনে হয়েছিল কোকেন। কিন্তু কোকেনের ধোঁয়ায় মারা যাবার সম্ভাবনা কোথায়? কাজেই ওই যুক্তি বাতিল করে দিতে হল। গুঁড়োগুলো নিয়ে আবার পরীক্ষা চালিয়ে বুঝতে পারলাম, ওগুলো মর্ফিনের গুঁড়ো।

মর্ফিন?

কেন, মর্ফিনে লোক মরতে পারে না?

নিশ্চয়ই পারে। কয়েকদিন আগেই তো একটা কেস আমার হাতে এসেছিল। গোপাল বলল, একজন অ্যাংলো বার্মিজ সিরাপের সঙ্গে বেশি মাত্রায় মর্ফিন খেয়ে ফেলেছিল। অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু বাঁচান গেল না।

কাজেই দেখা যাচ্ছে মর্ফিন ক্রমেই আমাদের দেশে প্রবেশ অধিকার পাচ্ছে। বস্তুটা আসলে কি, তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে ডাক্তার।

বিষদভাবে কিছু নেই। তবে শুনেছি, গাছ বিশেষের একটা কুঁড়ি থেকে

আধ গ্রেন আফিম পাওয়া যায়, আর এক পাউণ্ড সংগ্রহ করতে লাগে চোদ্দ হাজার কুঁড়ি। এই এক পাউণ্ড আফিম থেকে আট গ্রেন মর্ফিন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

প্রায় আশি বছর আগে একজন জার্মান রাসায়নিক আফিম থেকে মর্ফিন বের করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। বস্তুটি ভাল কি মন্দ এই বিচার হবার আগেই সারা ইউরোপে বহুল প্রচলন হয়ে পড়ে। উত্তেজনার চরম সীমায় পেঁছিবার জন্যে লোকে এর ব্যবহার আরম্ভ করল। কিন্তু ডাক্তাররা পরীক্ষা করে দেখলেন, খুব বেশি মাত্রায় মর্ফিন শরীরে গেলে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু অনিবার্য। শশাঙ্ক নাগের বেলাতেও তাই হয়েছে। অত্যন্ত দ্রুত এবং বেশি মাত্রায় মর্ফিন সিগারেটের মাধ্যমে তাঁর শরীরে প্রবেশ করায় তিনি মারা গেছেন।

এবার তোমার দু'নম্বর আবিষ্কারের কথা শুনি?

ড্রইংরুমের দরজার চৌকাঠের ওপর যে খানিকটা মাটি পেয়েছি তা জুতোর তলা থেকে খসে পড়া ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ চতুর্দিক পরিচ্ছন্নতায় তকতক করছে, চৌকাঠের ওপর মাটি আসবার ওই হল একমাত্র সম্ভাবনা। আমি মাটিটা পরীক্ষা করে দেখলাম, সুরকি ও লোহার গুঁড়ো রয়েছে তার মধ্যে। হয়ত এই মাটির অংশটুকু হত্যাকারীর জুতোর তলা থেকেই খসে পড়েছিল।

মিঃ নাগ কিম্বা মৃগাঙ্ক সুরের জুতোর তলা থেকেও খসে পড়ে থাকতে পারে।

মিঃ নাগকে লিস্ট থেকে বাদ দিতে হবে, কারণ তিনি বাড়ির দরজার গোড়ায় মোটরে গিয়ে উঠতেন এবং কারখানার অফিসের দরজার গোড়ায় গাড়ি থেকে নামতেন। তাঁর জুতোর তলায় মাটির মাখামাখি হওয়া একটু কষ্টকর ছিল। অবশ্য মৃগাঙ্ক সুর সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। তাঁর জুতোর তলায় ওই ধরনের মাটি আসা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। হয়ত তিনিই হত্যাকারী। এবার আমার তৃতীয় আবিষ্কারের কথা শোন। তুমি জান আমি সুটকেশটা সঙ্গে এনেছিলাম। ওটাকেও খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলাম। সুটকেশটা সম্পূর্ণ নতুন এবং কলকাতার তৈরি বলেই মনে হয়। ভেতরে যে সমস্ত কাগজের টুকরো ছিল, তা থেকে চমৎকার একটা জিনিস জানা গেছে। কাগজগুলো সমস্তই একগাদা প্ল্যানের ব্লু-প্রিন্টের ছেঁড়া অংশ।

প্ল্যান?

আমি ছেঁড়া অংশগুলোকে যতদূর সম্ভব পর পর সাজিয়ে দেখেছি, ওগুলো বাড়ির প্ল্যান ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু একটা প্রশ্ন যে এখনো থেকে যাচ্ছে?

কোন্ প্রশ্ন?

মিঃ নাগের সিগারেটে মর্ফিন মিশিয়ে দেওয়া হল কিভাবে?

যে মিশিয়েছে, সে মিঃ নাগের ঘনিষ্ঠ লোক। আমার ধারণা, কোন ৫

অসতর্ক মুহূর্তে হত্যাকারী মিস্টার নাগের টিন বা কেশের প্রত্যেকটা সিগারেটেই লিকুইড মর্ফিন খোলা অংশ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে ভেতরে ঢেলে দেয়।

ঝন ঝন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল এই সময়।

বাসব উঠে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিল।

ইন্সপেক্টার মল্লিক ফোন করছেন। মৃগাঙ্ক সুরকে থানায় আনা হয়েছে। বাসব ইচ্ছে করলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারে।

বাসব জানাল দশ মিনিটের মধ্যে আসছে থানায়।

বাসব শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে থানায় চলে এল।

ওদের দেখে আনন্দ মল্লিক বললেন, মৃগাঙ্ক সুর নাকি শশাংক নাগের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।

বাসব বলল, একজন হত্যাকারীর সঙ্গে শশাঙ্ক নাগের মত বিগবসের অন্তরঙ্গতা কিভাবে হয়েছিল, এ সম্বন্ধে কিছু জানতে পারলেন নাকি?

শুনলাম, শশাঙ্ক নাগের অবস্থা নাকি আগে অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। দুজনে ঘনিষ্ঠতা হয় তখনই।

আর কিছু জানতে পারলেন?

না।

মৃগাঙ্ক সুর কোথায়? তাঁর সঙ্গে আমি একবার কথা বলে দেখতে চাই।

পাশের ঘরে বসিয়ে রেখেছি।

বাসব পাশের ঘরে গেল।

মৃগাঙ্ক সুর বসে সিগারেট টানছিলেন। বাসবকে দেখে ভ্রূ-কুঁচকালেন।

ও বলল, আমি পুলিশের লোক নই। বেসরকারীভাবে এই খুনের তদন্তে নিযুক্ত হয়েছি। যদি আমাকে গোটা কয়েক সত্যি কথা বলেন, তাহলে আপনি অনেক ঝামেলাকে এড়িয়ে যাবার পথ পরিষ্কার করবেন।

বিলেতের মত এখানেও বেসরকারী গোয়েন্দা আছে দেখছি।

নিশ্চয়ই আছে। নইলে আমি আপনার সামনে উপস্থিত হলাম কিভাবে। আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবেন কি?

কি জানতে চান বলুন?

শশাঙ্ক নাগের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব কত দিনের?

তেরো-চোদ্দ বছরের।

এক বাক্স গয়না আপনি তাঁর কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন?

না, মানে···

অস্বীকার করবার চেষ্টা করবেন না। মিঃ নাগ ভল্ট থেকে এক সুটকেশ গয়না বার করে এনেছিলেন। তিনি সোমাদেবীকে বলেছিলেন, গয়নাগুলো তাঁর এক বন্ধুর এবং রাত্রে ওই গয়না সমেত সুটকেশ নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা

করেছিলেন। কাজেই—

মৃগাঙ্ক সুর এবার স্বাভাবিক গলাতেই বললেন, গয়নাগুলো আমারই ছিল। কোথা থেকে সেগুলো পেয়েছিলেন নিশ্চয়ই বলতে আপত্তি নেই।

অবান্তর প্রশ্ন। এ সমস্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই না।

ও! অতীতের কথা আমি বাদ দিলাম। কিন্তু বর্তমানে গয়নাগুলো নিয়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, সে সম্বন্ধে দু-চারটে প্রশ্নের উত্তর যে আপনাকে দিতেই হবে।

দিতেই হবে?

না দিলে আপনি চূড়ান্ত পুলিশি হাঙ্গামায় পড়বেন বলা বাহুল্য। আমার মনে হয়, তা বোধহয় আপনার পক্ষে খুব শুভ হবে না।

একটু ভেবে নিয়ে মৃগাঙ্ক বললেন, বলুন।

মিঃ নাগের কাছ থেকে আপনি গয়নাগুলো পেয়ে গেছেন?

না, সে আমাকে গয়নাগুলো দেয়নি। আমাকে ঠকিয়েছিল।

কি রকম?

সেদিন রাত্রের ঘটনার বর্ণনা দিলেন মৃগাঙ্ক। গয়না সমেত সুটকেশ বাসায় নিয়ে গিয়ে কিভাবে তার মধ্যে পাথর ও কাগজ ভরা রয়েছে ইত্যাদি সমস্ত কথাই বললেন।

আপনি বলতে চান, মিঃ নাগ আপনাকে ওই ভাবে ঠকিয়েছিলেন?

নিশ্চয়ই।

তাহলে এখানে আরেকটা প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে মিস্টার সুর। গয়নাগুলো না পাওয়ায় আপনার প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল মিঃ নাগের ওপর। হয়ত

আমিই শশাঙ্ককে খুন করেছি। জোরে হেসে উঠলেন মৃগাঙ্ক।— চমৎকার। আপনার বুদ্ধি সত্যি খুব তীক্ষ্ন।

আমাকে বিদ্রূপ করে লাভ নেই। আমার প্রয়োজনীয় কিছু কথা নিশ্চিত ভাবে চেপে যাচ্ছেন অনুমান করছি। যদি না বলতে চান, আমি আপনাকে আর চাপ দেব না। তবে পুলিশ হাঙ্গামার কথাটা আরেকবার স্মরণ করিয়ে দেব। মিঃ নাগের হত্যার অপরাধে পুলিশ আর কাউকে গ্রেপ্তার করতে না পারলে, নিশ্চিত ভাবে আপনার বিরুদ্ধে চার্জ সাজাবে। এই চার্জকে আরো জোরালো করবে আপনার অতীতের কীর্তিকলাপ। খুনের দায়ে আপনি একবার বারো বছর জেল খেটেছেন—একথা ভুলে যাবার নয়। তবে আমার সঙ্গে যদি সহযোগিতা করেন, কথা দিচ্ছি নির্দোষ হলে পুলিশের হাত থেকে আপনাকে বাঁচাবই।

কথাটা শেষ করেই বাসব দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

শুনুন?

বাসব ঘুরে দাঁড়াল।

মৃগাঙ্ক চিন্তিত গলায় বললেন, শশাঙ্ক কিভাবে মারা গেছে আমি জানি না। গয়নাগুলো পাইনি। কাজেই ও-বিষয় কিছু সংবাদ আমি আপনাকে দিতে পারব না। তবে আমাদের দুজনের অতীত সম্বন্ধে যদি কিছু শুনলে উপকার হয়, তাহলে বলছি।

বলুন।

বাসবের কথায় মৃগাঙ্ক বুঝতে পেরেছিলেন, এদের সঙ্গে সহযোগিতা না করলে তাঁর বিপদ অনিবার্য। কাজেই পরিষ্কার করে সব কথা বলাই ভাল। তিনি অল্প কথায় শশাঙ্কর সঙ্গে প্রথম আলাপ থেকে, গয়নার বাক্স চুরি ও তাঁর পুলিশের হাতে ধরা পড়া পর্যন্ত সমস্ত কিছু বললেন।

বাসব একাগ্র মনে শুনল।

প্রশ্ন করল, আচ্ছা, ইসরার খালেদের গয়নার সুটকেশটা কানপুরের তৈরি ছিল কিনা, মনে পড়ে আপনার?

না। সৌদি আরবের তৈরি সুটকেশ সেটা।

দেখতে এদেশী সুটকেশের মত হলেও, তার ভেতর দিকে সৌদি আরবের লেবেল লাগান ছিল।

এখন আমি চলি মিস্টার সুর। আপনার বক্তব্য মূল্যবান। দেখি কতদূর কি করতে পারি।

বাসব ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

॥ সাত ॥

বেলা পড়ে আসছে।

সোমা নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে এল।

চারদিক থমথম করছে। কলেজ যাচ্ছে না এখন সোমা। মনের যা অবস্থা, তাতে কবে যেতে পারবে তারও কোন ঠিক নেই। জলজ্যান্ত মানুষটা হঠাৎ এইভাবে মারা গেলেন। ভাবতেও পারা যায় না।

সোমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন তিনি। তার অভাব অভিযোগকে তিনি বিন্দুমাত্র অবহেলা করতেন না। আজ নেই তিনি। শুধু মাত্র তাঁর জন্যে সারা বাড়িটা যেন গুমরে গুমরে কাঁদছে। তিনি একাই একশো ছিলেন।

সোমা হাঁপিয়ে উঠেছে। আর এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করছে না এখানে। সুদেশকে বলেছিল একথা কাল।

আমার আর ভাল লাগছে না এখানে। কোথাও আমাকে নিয়ে চল না।

সুদেশ বিব্রত হয়েছিল। বলেছিল, বিয়ের আগে আমাদের এক সঙ্গে যাওয়াটা কি উচিত হবে?

উচিত হবে না তাও তো জানি। কিন্তু

তুমি আর কিছুদিন ধৈর্য ধরে থাক সোমা। সাময়িক গোলমালটা মিটে

যাক। তারপর আমরা বিয়ের পর্বটা সেরে নিয়ে কোচিন চলে যাব। কেরালায় বেশ কিছুদিন কাটিয়ে আসবার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের।

ভাবতে ভাবতে সোমা নিজের পড়ার ঘরে এসে ঢুকল। কিন্তু ঘরে পা দেবা মাত্রই তাকে থামতে হল, কারণ টেবিলের সামনের চেয়ারটা অধিকার করে রয়েছে রজত।

রজত তালুকদার সোমার বড়ভাই।

আজও তার সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। উসকো-খুসকো চুল। জ্বলজ্বলে চাউনি।

সোমা মনে মনে অত্যন্ত বিচলিত হল। দ্রুত গলায় বলল, একি, তুমি—?

তুমি একলা রয়েছ তাই এলাম।

কোন দরকার ছিল না আসবার। আমি বেশ আছি। আমার জন্যে তোমাদের চিন্তিত হবার কোন প্রয়োজন নেই।

প্রয়োজন নেই বললে কি চলে? এতদিন শশাঙ্কবাবু ছিলেন, বলবার কিছু ছিল না। আজ তিনি নেই। কাজেই তোমাকে আর তাঁর কল-কারখানা, বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা এখন আমাদেরই করতে হবে। বাবাও সেই কথাই বলছিলেন।

সোমার ইচ্ছে হল ডাক ছেড়ে কাঁদে। এদের লোভী দৃষ্টির হাত থেকে কিছুতেই কি রেহাই পাবার উপায় নেই?

দৃঢ় গলায় বলল, কাকা তোমাদের মোটেই পছন্দ করতেন না। তাঁর আত্মার কষ্ট হোক—এ রকম কোন কাজ আমরা করতে পারব না। কারখানা দেখাশোনা করবার লোক আছে, সে জন্যে তোমাদের বিন্দুমাত্র চিন্তিত হতে হবে না। আমার মন-মেজাজ এখন ভাল নেই। আর আমাকে বকিও না।

নির্লিপ্তভাবে রজত বলল, তোমাকে বেশি বকিয়ে আমার লাভও নেই। কোন্ ঘরে থাকব তার ব্যবস্থাটা করে দাও। আমিও এই বেলা চন্দননগর থেকে নিজের জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আসি।

সোমা কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলা হল না। দরজার গোড়ায় একজন বেয়ারা এসে দাঁড়িয়েছে; সোমা তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

বেয়ারা বলল, বাসববাবু এসেছেন।

এখানে নিয়ে এস।

বেয়ারা বাসব ও শৈবালকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল।

বাসব বলল, আবার অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম।

না, না, বিরক্ত আর কি। বসুন।

বসতে বসতে বাসব বলল, দুটো কাজ নিয়ে এলাম। প্রথম, চাকর-বেয়ারাদের কিছু প্রশ্ন করবার আছে। আর দ্বিতীয়, মিস্টার নাগের ঘরখানা একবার পরীক্ষা করে দেখব।

বেশ তো। বেয়ারাদের এক সঙ্গেই সকলকে ডাকব কি?

না। প্রথমে মিস্টার নাগের খাসবেয়ারাকে ডাকান।

সোমা সুইচ বোর্ডের কাছে গিয়ে একটা বোতাম পুস করল।

একজন বেয়ারা এসে দাঁড়াল।

কালীপদকে ডেকে দাও।

বেয়ারা চলে যাবার পর সোমা বলল, এঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি আমার দাদা রজত তালুকদার। আর তুমি নিশ্চয়ই এঁদের কথা বাবার মুখে শুনে থাকবে? বাসববাবু ও শৈবালবাবু।

নমস্কার বিনিময় হল;

রজতের মুখে প্রসন্নতার অভাব।

কালীপদ ঘরে এল।

আমাকে ডেকেছেন?

হ্যাঁ। সোমা বলল, ইনি তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলবেন!

বাসব কালীপদকে খুঁটিয়ে দেখল। বছর পঞ্চাশ বয়স হবে। লম্বায় খুব বেশি নয়। পেটা চেহারা। রেখা সমাকীর্ণ মুখ। এক মাথা কাঁচা-পাকা চুল। মুখের ভাব দেখে প্রভুর মৃত্যুতে সে কিছুটা কাতর হয়েছে বলেই মনে হয়।

বাসব বলল, তুমি কতদিন এখানে কাজ করছ কালীপদ?

আজ্ঞে, তা দশ বছর হবে।

তার আগে কোথায় কাজ করতে?

শ্যামপুকুরের ঘটকবাবুদের বাড়ি।

তোমার বাবু এইভাবে মারা গেলেন খুবই দুঃখের কথা।

ভাগ্যের ফের বাবু, - কালীপদ বলল, তিনি দেবতুল্য লোক ছিলেন।

আচ্ছা কালীপদ, যেদিন রাত্রে তোমার বাবু খুন হন, সেদিন যখন তিনি শুতে গিয়েছিলেন, তখন তুমি কোথায় ছিলে?

কালীপদ জানে এই বাবুটি পুলিশেরই লোক। সেদিন দারোগার সঙ্গে যেরকম মাখামাখি দেখেছে, তাতে সেই ধারণাই দৃঢ় হয়। সে সাধ্যমত ভালভাবে কথা বলবার চেষ্টা করছিল। বলল, আজ্ঞে, তাঁর ঘরেই ছিলাম। বিছানা ঝাড়ছিলাম। তিনি আমাকে বড় আলোটা নিভিয়ে ঘর থেকে যেতে বললেন।

তারপর কি হল?

আমি আলো নিভিয়ে দরজা ভেজিয়ে বারান্দায় চলে এলাম। খাওয়া-দাওয়া সেরে মাদুর বিছিয়ে ওখানে গিয়ে শুলাম। রোজ রাত্তিরে আমি বাবুর ঘরের সামনের বারান্দাতেই শুতাম। কখন কি তাঁর দরকার পড়ে তাই।

তারপর তোমার ঘুম ভাঙল কখন?

অনেক রাত্তিরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল বাবু। চোখ মেলে দেখি বাবু ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

কোথায় গেলেন তিনি।

আজ্ঞে, ড্রইংরুমে। কিছুক্ষণ পরে মোটরের শব্দ পেলাম। কে একজন এসে বাবুর সঙ্গে কথা বলছিল। তারপর আমি আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

আবার তোমার ঘুম ভাঙল কখন?

খুব ভোরবেলা। উঠে দেখি বাবু ঘরে নেই। খোঁজাখুঁজির পর দেখি, ড্রইংরুমে মরে পড়ে আছেন। দিদিমণি আর সুদেশবাবু সেখানে রয়েছেন।

বাসব একটু চিন্তা করে নিয়ে বলল, তোমার বাবুর সঙ্গে সে রাত্রে যে দেখা করতে এসেছিল, সে কে বলতে পার?

আজ্ঞে, আমি বলতে পারব না।

মোটরের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ পেয়েছিলে?

আর কোন শব্দ? কালীপদ একটু থেমে বলল, বাবু টেলিফোন করছিলেন, তারই চাকি ঘোরাবার শব্দ পেয়েছিলাম।

টেলিফোন তিনি কখন করছিলেন? মোটর আসবার আগে না পরে?

আগে।

এবার বাসব সোমার দিকে ফিরে বলল, মিঃ নাগের শোবার ঘরটা একবার আমি দেখতে চাই।

চলুন।

আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। আপনারা কথাবার্তা বলুন, আমরা কালীপদর সঙ্গে যাচ্ছি।

বাসব ও শৈবাল কালীপদকে নিয়ে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

রজত তেরছা ভাবে একবার সোমার দিকে তাকিয়ে বলল, ভদ্রলোকের নাম শুনেছি বটে। শুনলাম, তুমিই এঁকে অ্যাপয়েন্ট করেছ?

হ্যাঁ।

কতকগুলো পয়সার শ্রাদ্ধ হল এই আর কি। শশাঙ্ক নাগকে কে খুন করেছে একথা জেনে তোমার লাভ কি? হত্যাকারী ধরা পড়লে শ্মশান ফুঁড়ে ভদ্রলোক বেঁচে উঠবেন বলে তো আমার মনে হয় না।

একটা জলজ্যান্ত মানুষকে খুন করে হত্যাকারী সকলের চোখের আড়ালে নিজের পরিচয় লুকিয়ে রেখে সুখ ভোগ করবে, তা আমি হতে দিতে পারি না। যাই হোক, এসমস্ত আলোচনা আমি তোমার সঙ্গে করতে চাই না। তোমার এবাড়িতে থাকাও চলবে না। তাছাড়া এবাড়ি আমিও ছেড়ে দিচ্ছি।

ছেড়ে দিচ্ছ? আকাশ থেকে পড়ল রজত।

পুলিশের হাঙ্গামা মিটে গেলেই আমি শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে কথাবার্তা বলব। কাকার নামে এই বাড়িতে মেয়েদের কলেজ হবে।

এদিকে—

শশাঙ্ক নাগের শোবার ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বাসব, শৈবাল ও কালীপদ।

ঘরের দরজা বন্ধ। শশাঙ্ক মারা যাওয়ার পর থেকেই এই ঘর অর্গল রুদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

কালীপদ দরজা খুলে দিল।

শশাঙ্ক নাগের শোবার ঘরখানা পরিপাটি করে সাজান।

খাটখানা রয়েছে দক্ষিণ দিকের দেওয়াল ঘেঁসে। দুখানা ডেক চেয়ার পর পর। টিপয়ের ওপর জনিওয়াকারের বোতল, ডিকেণ্টার, এক পাশে ওয়ার্ডরোব। ঘরের আরেকপ্রান্তে ড্রেসিং টেবিল—আলনা বুককেশ।

বড় বড় চারখানা জানলা আছে ঘরে। গরাদহীন জানলাগুলোর ওপর কালারের মেলভিন নেটের পর্দা। বাসব ঘরের চারিধারে অলসভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তারপর জানলাগুলো পরীক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

পর পর তিনটে জানলায় দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত কিছু ছিল না। সব শেষের জানলাটা বাসবকে আকৃষ্ট করল। জানলার সামনে পর্দা থাকলেও কাচের পাল্লা দুটো বন্ধ ছিল। একটা পাল্লার খানিকটা কাচ ভাঙা দেখা গেল। সেই ভাঙা কাচের গায়ে লাল মত জলীয় কিছু শুকিয়ে রয়েছে।

বাসব বলল, ডাক্তার তোমার কি মনে হয় এটা রক্তের দাগ?

শৈবাল কাচটা পরীক্ষা করে বলল, তাই তো মনে হচ্ছে।

কালীপদ, কাচটা ভাঙা ছিল, না সম্প্রতি ভেঙেছে?

ভাঙা তো আগে ছিল না বাবু।

বাসব জানলা দিয়ে ঝুঁকে বাইরের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল, ওয়াটার পাইপটা জানলার খুব কাছ দিয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে।

এই সময় শৈবাল বলে উঠল, ওহে, ওয়ার্ডরোবটা খোলা দেখছি।

তাই নাকি!—বাসব ওয়ার্ডরোবের কাছে এগিয়ে এল। সত্যি খোলা।

কালীপদ, এটা খোলা থাকে নাকি?

আজ্ঞে না। বাবু চাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখেন।

তুমি এক কাজ কর, তোমার দিদিমণিকে ডেকে নিয়ে এস।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সোমা এল।

বাসব বলল, ওয়ার্ডরোবটা খোলা রয়েছে। দেখুন তো মিস তালুকদার, এর মধ্যে থেকে কিছু হারিয়েছে কিনা?

সোমা ওয়ার্ডরোবের মধ্যেটা পরীক্ষা করল।

তারপর শুকনো মুখে বলল, অনেক কিছুই হারিয়েছে।

কি, কি—?

কাকার হীরের বোতাম, ঘাড়, আমার কিছু খুচরো গয়না ছিল—সেগুলো। মারা যাবার দিন সন্ধ্যাবেলা তেরোশো টাকা রেখেছিলেন কাকা, তাও দেখতে পাচ্ছি না।

হুঁ। এখনকার মত আমার কাজ শেষ হয়েছে। এখন তাহলে চলি মিস তালুকদার। এসো ডাক্তার।

শশাঙ্ক নাগের বাড়ি থেকে বেরিয়ে শৈবাল বলল, কোথায় যাবে? বাড়ি ফিরবে?

না। চল, এই বেলা নাগ আয়রণ ওয়ার্কস থেকে ঘুরে আসি।

চল।

ওরা একটা ট্যাক্সি ডেকে ড্রাইভারকে ট্যাংরার দিকে যাবার নির্দেশ দিল।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে কারখানাটা। চারিপারে বাউণ্ডারি ওয়াল দেওয়া। করগেটের সেড দেওয়া বিরাট কারখানাটা দাঁড়িয়ে রয়েছে দৈত্যের মত। যন্ত্রের শব্দ ভেসে আসছে একটানা। পূর্ণোদ্দমে কাজ চলেছে কারখানার মধ্যে। একধারে অর্ধ-সমাপ্ত গোটা কয়েক বাড়ি। সেখানেও মিস্ত্রিরা এক মনে কাজ করে চলেছে।

সংবাদ পেয়ে দেবেশ রাহা ও সুদেশ ওদের অভ্যর্থনা জানাল।

বাসব বলল, আমাকে মিঃ নাগের অফিস-রুমে নিয়ে চলুন।

সকলে অফিস-রুমে সমবেত হল।

খুব বড় নয় ঘরখানা।

ঘরে ঢুকেই প্রথমে চোখে পড়ে কোণাকুণিভাবে রাখা অর্ধচন্দ্রাকৃতি সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার ওপর। পুরো কাচে ঢাকা আধুনিক ধরনের টেবিল। টেবিলের পিছন দিকের দেওয়ালে ফিক্সড করা আয়রণ সেফ।

বাসব রাহার দিকে তাকিয়ে বলল, এই সেফের মধ্যে গয়নার সুটকেশটা এনে মিঃ নাগ রেখেছিলেন, না—

হ্যাঁ।

বিচিত্র গঠনের সেফ দেখছি। খোলা হয় কিভাবে?

সুদেশ বলল, ওয়ার্ড লক সিস্টেমে। মিঃ নাগ ছাড়া সেফটা খোলার কায়দা আর কেউ জানত না।

তবে তো এখন আর সেফ খোলা যাবে না?

যাবে। মিঃ নাগের ডায়েরিতে লকের ওয়ার্ডগুলো লেখা আছে।

আচ্ছা, গয়নার সুটকেশটার ওপর কোন আবরণ ছিল?

রাহা বললেন, ছিল। কাপড় জড়িয়ে গালা দিয়ে বন্ধ করা ছিল। মিঃ নাগ কাপড় ছিঁড়ে, সুটকেশ খুলে গয়না দেখিয়েছিলেন।

তারপর ধারাবাহিকভাবে বলুন তো কি হয়েছিল?

উনি এই ঘরেই বসে রইলেন। আমাকেও কাজ করতে না দিয়ে বসিয়ে রাখলেন। এক সময় বললেন, আপনি লাঞ্চটা সেরে আসুন। আপনি এলে তবে আমি যাব। আর ঘর খালি রাখা মোটেই সঙ্গত নয়।

যখন উনি লাঞ্চে যান, তখন কি সঙ্গে করে কিছু নিয়ে গিয়েছিলেন?

কই, না।

তুচ্ছ কিছু নিয়ে গিয়ে থাকলেও বলুন?

পরিষ্কার মনে আছে কিছু নিয়ে যাননি।

এবার আপনারা একটু বাইরে যান। এই ঘরে আমার কিছু কাজ আছে।

দেবেশ রাহা ও সুদেশ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে, বাসব দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল। তারপর সঙ্গে আনা ওভার নাইট ব্যাগ থেকে কিছু জিনিসপত্র বার করে টেবিলের ওপর রাখল।

॥ আট ॥

সূর্য ক্রমেই পশ্চিমে হেলে পড়েছে।

ধীরে ধীরে কলকাতার উপর নেমে আসছে জাফরাণী সন্ধ্যা।

মৃগাঙ্ক সুর এতক্ষণ গঙ্গার ধারে বসেছিলেন। অসংখ্য চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে পাক খেয়ে যাচ্ছিল। সন্ধ্যার মুখে তিনি ফিরে এলেন গ্রে স্ট্রীটের বাসায়। বিরূপাক্ষ বাসায় অনুপস্থিত। কোথায় বেরিয়েছে কে জানে।

গম্ভীর মুখে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াতে লাগলেন মৃগাঙ্ক।

তাঁর কিছুই ভাল লাগছে না। এত কাণ্ড কারখানা করবার পরও গয়নাগুলো হাতে পেলেন না, এটা কম আক্ষেপের বিষয় নয়। শশাংক মারা গেছে—ঠিক মারা যায়নি, তাঁর সঙ্গে শঠতা করবার উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে বলা চলে।

কিন্তু গয়নাগুলো !

তাঁর ওপর বাটপাড়ি করল কে ?

বিরূপাক্ষ এই সময় বাড়ি ফিরল। মৃগাঙ্ককে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে দেখে তার মুখে বিদ্রূপের হাসি খেলে গেল। বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে একটা মোড়ায় বসল বিরূপাক্ষ।

ঘন ঘন কয়েকবার বিড়িতে টান দিয়ে বলল, আপনি কি এত চিন্তা করছেন বুঝতে পারছি না।

—চিন্তা করব না ! তুমি কি বলছ বিরূপাক্ষ ? যে গয়নাগুলোর জন্যে আমি এত কাণ্ড করলাম, শেষ পর্যন্ত পেলাম না সেগুলোই। পুলিশ আর টিকটিকির কাছে কাঁদুনি অবশ্য অনেক গেয়ে এসেছি, তাতে কি আর গয়না ফেরত পাব ?

- আপনি অযান্তর সমস্ত চিন্তা মাথায় পুরে রেখেছেন। পুলিশ কি করবে? এখন একটু সতর্ক হয়ে চিন্তা করুন গয়নার বাক্সটা কার কাছে থাকতে পারে।

—চিন্তা করে দেখেছি। কিন্তু

—আমি জানি কার কাছে আছে।

—সাগ্রহে মৃগাঙ্ক বললেন, তুমি জান !

—জানি বই কি ?

—কে সে বিরূপাক্ষ ? আমি কি তার কাছ থেকে বাক্সটা উদ্ধার করে আনতে পারব ?

—নিশ্চয় পারবেন।—বিরূপাক্ষ বিড়ির টুকরোটা ঘরের কোণে ফেলে দিয়ে

বলল, অনেক মাথা খাটিয়ে আমি এই সত্য আবিষ্কার করেছি। আপনার প্রথমেই বোঝা উচিত গয়নাগুলো শশাঙ্ক নাগ আপনাকে দিতে চাননি। যারা ধনী, ধনদৌলতের প্রতি লালসা তাদেরই বেশি হয়। সুটকেশে আবর্জনা পুরে তিনি আপনাকে ঠকিয়েছিলেন। গয়নাগুলো এখনো তাঁর বাড়িতেই আছে।

—বাড়িতেই আছে! তোমার কথাই মেনে নিলাম। কিন্তু সেগুলো আমাদের হাতে আসবে কিভাবে?

—সারা জীবন তো দুর্নীতি আর দুঃসাহসকে প্রশ্রয় দিলেন। আরেকবার না হয়

—দুঃসাহস দেখানোটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল, ওই বিরাট বাড়ির মধ্যে শশাঙ্ক কোথায় গয়নাগুলো রেখেছিল তার সন্ধান পাব কি ভাবে।

—অতি সহজেই তার সন্ধান পাবেন।

—সহজেই! কি ভাবে?

—আমার দৃঢ় বিশ্বাস গয়নাগুলো কোথায় আছে শশাঙ্ক নাগের অতি আদরের সোমাদেবীর অজানা থাকার কথা নয়। এরপর আপনি স্থির করে নিন—অর্থাৎ প্ল্যানটা ছকে নিন অগ্রসর হবেন কোন্ পথ ধরে।

—হুঁ।

আর কিছু বললেন না মৃগাঙ্ক।

সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে দ্রুত পায়চারি করতে লাগলেন।

তালুকদারের বাড়ি চন্দননগরের তেলিনিপাড়া অঞ্চলে।

বাড়ির বাইরের ঘরে গৃহকর্তা প্রমথ তালুকদার গাম্ভীর্যের মিনার হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর মুখের ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেই পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় কোন কারণে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

রজত জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এক সময় তালুকদার বললেন, শশাঙ্ক মারা যাবার পর ভেবেছিলাম বাকি জীবনটা বুঝি নোটের তাড়ার ওপর শুয়েই কেটে যাবে। ভাবতে পারিনি নিজের সন্তান এইভাবে বাদ সাধবে। বেশ বুঝতে পারছি মেয়েটার মাথা শশাঙ্ক চিবিয়ে খেয়ে গেছে।

—সত্যি আমিও ভাবতে পারিনি বাবা—রজত বলল, সোমা আমাদের সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করবে!

—কিন্তু ওর স্বেচ্ছাচারিতাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না রজত। আমি কাল সারা রাত ভেবেছি। এখন ওকে বাধা না দিলে শশাঙ্কর বিপুল সম্পত্তি শের হাতে চলে যাবে। বোকা মেয়ে বুঝতে পারছে না সম্পত্তি লাভের তুচ্ছসেবে সুদেশ ওকে ব্যবহার করছে।

পরিস্থাবে বাধা দেওয়া যাবে। কোন পরিকল্পনা কি

এবার টা পরিকল্পনা আমার মনে উঁকি ঝুঁকি মারছে কতদূর সফল হব

আমি জানি না।

একটু থেমে তালুকদার বললেন, তুমি ওকে বোঝাতে গিয়েছিলে, অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছ। আমি গেলে আমারও ওই একই অবস্থা হবে। কাজেই মনের মধ্যে যে পরিকল্পনা উঁকি ঝুঁকি মারছে শেষ পর্যন্ত হয়ত তাকেই কার্যকরি করতে হবে।

—পরিকল্পনাটা কি বাবা ?

—এখন বলব না। একটু ধৈর্য ধরে থাক। সবই জানতে পারবে।

রজত কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার দৃষ্টি জানলার বাইরে প্রসারিত হতেই থেমে গেল। তালুকদার তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে সবিস্ময়ে দেখলেন, সোমা বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করছে।

মেঘ না চাইতেই জল।

তালুকদার দ্রুত চিন্তা করতে লাগলেন। রজতও। সোমার এই অভাবনীয় আগমনের উদ্দেশ্য কি ? ওকি মত পালটালো ? বাপের বাড়ির লোকেদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে চায় হয়ত। সময় সময় কত অবিশ্বাস্য ঘটনাও তো ঘটে থাকে।

সোমা ঘরে এল।

দুজনের মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে সোমা বলল, সুরথকে নিয়ে যেতে এসেছি।

সুরথ সোমার ছোটভাই। শশাঙ্কর কারখানাতেই কাজ করে।

—সুরথ কে ? সবিস্ময়ে তালুকদার প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ।

—কেন ?

—লাউডন স্ট্রীটের বাড়িতে একলা থাকতে কেমন অস্বস্তি বোধ করছি। যে কদিন ওখানে আছি, সুরথ আমার সঙ্গে থাকবে।

—যে কদিন আছি মানে ? লাউডন স্ট্রীটের বাড়িতে থাকছ না নাকি ?

—না। সে কথা তো জানিয়েছি দাদাকে। কাকার নামে ওই বাড়িতে কলেজ হবে। শিক্ষাদপ্তরের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে। যাক ওকথা, সুরথ কোথায় ?

—সুরথের কি প্রয়োজন সোমা ? রজতকেই তো পাঠিয়েছিলাম তোমার কাছে। এক রকম অপমান করে তাকে তুমি তাড়িয়ে দিয়েছ।

—অপমান আমি দাদাকে করিনি। কাকা যা অপছন্দ করতেন সেই সমস্ত বিষয়কে আমি প্রশ্রয় দিতে পারব না। এই কথাই জানিয়েছিলাম।

কথাটা শেষ করে সোমা বাড়ির ভিতর দিকে পা বাড়াল।

প্রমথ তালুকদার বললেন, সুরথ বাড়ি নেই।

—ও। আমি চললাম। সুরথ বাড়ি ফিরলে তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

—তুমি কেন অবুঝের মত আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করছ মা ? শশাঙ্ক তোমায় পিতৃস্নেহে পালন করেছে বটে, আমি তোমার জন্মদাতা এ কথা তুমি

ভুলে যাচ্ছ কেন ? আমার প্রতি কি তোমার কোন কর্তব্য নেই।

—কোন কর্তব্য করিনি একথা তুমি বলতে পার না বাবা। যখনই তোমরা টাকা চেয়েছ, যে করে হোক আমি সংগ্রহ করে দিয়েছি। তা ছাড়া তুমি আমার জন্যেই কাকার কাছ থেকে নানাভাবে উপকৃত হয়েছ, একথা নতুন করে মনে করিয়ে দিতে হবে ভাবিনি।

—আজ তো শশাঙ্ক নেই

ম্রিয়মান গলায় সোমা বলল, নেই। তাঁর মত মানুষকে এই ভাবে চলে যেতে হবে ভাবতেও পারিনি।

–তাকে তুমি অনর্থকই এত উঁচু আসনে বসিয়েছ। সে লোক ভাল ছিল না। আমি জানি তার অতীত জীবনে চরম কলঙ্কের ছাপ ছিল।

বাবা -!!!

–জানি বলেই বলছি।

—আমি সে কথা শুনতে চাই না। আমি তাঁকে যে রূপে দেখেছি সে রকম মানুষ বিরল। কেউ আমাকে তাঁর সম্পর্কে অন্য কোন কথা বলে প্রভাবিত করতে পারবে না। এবার আমি যাচ্ছি।

রজত এতক্ষণ কথা বলেনি।

এবার বলল, কি দরকার তোমার কলকাতা ফিরে। এখানেই থেকে যাও না কটা দিন। অবশ্য বাড়ি ছোট। তোমার কষ্ট হবে জানি তবে

—বিদ্রূপ মানুষকে কিভাবে করতে হয় আমি জানি দাদা। সোমা বলল, এ বাড়িতে যে আমি কিছুদিন না কাটিয়ে গেছি তা নয়। তবে এখন আর এক মিনিটও থাকবার ইচ্ছে আমার নেই।

সোমা দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এদিকে—

বিরূপাক্ষ বেশ তাতিয়ে তুলেছে মৃগাঙ্ককে। তার স্বার্থ অনেক। গয়নাগুলো উদ্ধার হলে সে অল্প মূল্যেই সংগ্রহ করতে পারবে। তারপর চড়া দরেই সেগুলো জায়গামত ছাড়তে তার কোন অসুবিধা হবে না।

মৃগাঙ্ক মন স্থির করে ফেলেছেন। গয়নাগুলো কখনই হাত ছাড়া হতে দেবেন না। দিন দুয়েক মনে মনে তিনি প্ল্যান ভেঁজে কাজে নামলেন। সাফল্য লাভ তাকে করতেই হবে।

ভোরবেলা থেকেই তিনি নাগহাউসের উপর দৃষ্টি রেখেছেন।

দুপুরে একবার খেতে গিয়েছিলেন। আবার ফিরে এসেছেন।

দুপুর পড়ে আসবার পর লক্ষ্য করলেন, সোমা নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে। অসহায় চোখে এদিকে ওদিকে তাকালেন মৃগাঙ্ক। ভাগ্য ভাল বলতে হবে। একখানা খালি ট্যাক্সি এদিকে আসছে লক্ষ্য করলেন। কাল বিলম্ব না করে উঠে বসলেন তাতে। সোমার গাড়ি ততক্ষণে এগিয়ে গেছে।

একটা দশ টাকার নোট ড্রাইভারের দিকে এগিয়ে ধরে মৃগাঙ্ক বললেন, সামনের গাড়িটা চোখের বাইরে যেন চলে না যায়।

ড্রাইভার কিছু না বলে আদেশ পালন করবার জন্যে তৎপর হল।

মৃগাঙ্ক কেন যে সোমাকে অনুসরণ করলেন সঠিকভাবে তার কারণ নিজেও জানেন না। অবচেতন মন তাঁকে ব্যস্ত করে তুলল--মোট কথা, তিনি চান সোমাকে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে পেতে। প্রস্তুত হয়েই আছেন। এমন কি ক্লোরোফর্মের মত বস্তুও শিশির মধ্যে ভরা অবস্থায় পকেটের এক কোণে আশ্রয় নিয়ে রয়েছে।

সোমার গাড়ি ক্রমে শ্যামবাজার অতিক্রম করে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপর পড়ল। মৃগাঙ্কর বিস্ময় বর্ধিত হল। ওদিকে কেন, কোথায় চলেছে মেয়েটা! ওদিকে কোন নাগর টাগর আছে নাকি? থাকলেই হল। আজকালকার মেয়েদের মতিগতির কথা কারুর সাধ্য নেই বলতে পারে। দেখাই যাক কোথায় যায়।

চন্দননগরে এসে তেলিনিপাড়ার একটা বাড়ির সামনে গাড়ি থামাল সোমা। ইঞ্জিন বন্ধ করে গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির ভেতরে চলে গেল। মৃগাঙ্ক ট্যাক্সি ছেড়ে দিলেন। পরিকল্পনা সাজিয়ে নিলেন সঙ্গে সঙ্গে। জায়গাটা বেশ নির্জন। এদিক ওদিক তাকিয়ে সোমার গাড়ির পিছনের সিটের দিকে সেঁধিয়ে গেলেন।

বেশ বড় গাড়ি। পা রাখার জায়গায় সহজেই বসতে পারলেন। বলা বাহুল্য তিনি বেশ রিস্ক নিলেন। সোমা একা না ফিরে সঙ্গে করে যদি দু-একজনকে নিয়ে আসে তাহলে আর আত্মগোপন করে থাকা সম্ভব হবে না। ধরা পড়ে যাবেন। চিরকালই কপাল ঠুকে কাজে নেমেছেন। সফল হয়েছেন সর্বক্ষেত্রে।

কিছুক্ষণ পরে সোমা ফিরে এল। একাই ফিরল। গম্ভীর মুখে স্টিয়ারিং-এর সামনে বসে গাড়ি ছেড়ে দিল। গাড়ি বেশ কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর মৃগাঙ্ক সিটের উপর উঠে বসলেন। অল্প শব্দ হয়েছিল। সোমা মুখ ফিরিয়ে দেখতে যাবার আগেই তিনি ছোরার ফলা ঘাড়ে ঠেকিয়ে বললেন, চেঁচাবার চেষ্টা কর না। গাড়ি থামাও।

সোমা ভিতু মেয়ে নয়। তবু ভয় পেয়ে গেল।

কাঁপা গলায় বলল, কে আপনি?

—জানবার দরকার নেই। গাড়ি থামাও।

আদেশ অমান্য করলে বিপদ গুরুতর আকার নিয়ে দেখা দিতে পারে সহজেই সে বুঝতে পারল। কোন কথা না বলে রাস্তার এক পাশে গাড়ি থামাল।

কাল বিলম্ব না করে রুমালে মৃগাঙ্ক ক্লোরোফর্ম ঢেলে পিছন দিক থেকে সোমার মুখে চেপে ধরলেন। বারকয়েক ব্যর্থ ছটপটানি, তারপর সোমা এলিয়ে

পড়ল সিটের উপর। মৃগাঙ্ক ড্রাইভিং সিটে এসে বসলেন। স্টার্ট নিলেন গাড়িতে।

ঘটনাটা ঘটে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যে। রাস্তায় গাড়ির বিরাম নেই। কেউই ঘটনাটা লক্ষ্য করার অবকাশ পেল না। সকলেই ব্যস্ত। যে যার নিজের গন্তব্যস্থলে দ্রুত পৌঁছবার চিন্তায় একাগ্র। আবছা অন্ধকারের মধ্যে কোথায় কি ঘটল তা লক্ষ্য করবার অবকাশ কোথায়?

গাড়ি নিয়ে ঝড়ের বেগে গ্রে স্ট্রীটে পৌঁছলেন মৃগাঙ্ক।

বিরূপাক্ষ বাড়িতেই ছিল। ধরাধরি করে সোমার অচেতন দেহ নামান হল। বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল গিয়ে। তার সুন্দর মুখের ওপর ক্লান্ত ভাব জড়িয়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়েছে যেন।

বিরূপাক্ষ বলল, শ্রীমতীকে শেষ পর্যন্ত হাতের মুঠোয় পেয়েছেন।

--প্রচুর রিস্ক নিতে হয়েছে এর জন্যে। তাড়াতাড়িতে মাত্রা ঠিক রাখতে পারিনি। বেশি মাত্রায় ক্লোফর্ম দেওয়া হয়েছে। মনে হচ্ছে, জ্ঞান ফিরতে দেরি হবে। জ্ঞান ফিরে আসবার পরই যে কোন উপায়ে গয়নার বাক্সর সন্ধানটা জেনে নিতে হবে।

—যাই বলুন, দেখতে কিন্তু বেড়ে। এরকম

—আঃ বিরূপাক্ষ ও সমস্ত কথা থাক। আমি এখুনি বেরচ্ছি। গাড়িটা মাঝপথে ফেলে আসতে হবে। পুলিশের কানে কথাটা ওঠবার আগে কাজটা সেরে ফেলতে না পারলে ভীষণ মুস্কিলে পড়ে যাব।

মৃগাঙ্ক ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

॥ নয় ॥

দুপুর তখন দ্রুতগতিতে বিকেলের দিকে এগোচ্ছে।

আনন্দ মল্লিক থানাতেই ছিলেন। হোমিসাইড স্কোয়াডের বসুচৌধুরীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। তাঁদের আলোচনা অবশ্য শশাঙ্ক-হত্যা সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই তদন্তটির কোন সমাধান না হওয়ায় পুলিশের নেতৃস্থানীয়রা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন।

আনন্দ মল্লিকের একমাত্র ভরসা এখন বাসব।

সে যদি কিছু পারে তাহলেই তাঁর সম্মান বজায় থাকবে। অবশ্য কৈফিয়তের হাত থেকে যে বেহাই পাবেন, এরকম সম্ভাবনা নেই একেবারেই।

এই সময় বাসব থানায় এসে উপস্থিত হল।

শৈবাল অন্যত্র কাজে ব্যস্ত থাকায় বাসব একলাই এসেছে।

চায়ের আদেশ দিলেন ইন্সপেক্টার মল্লিক।

বাসব প্রশ্ন করল, কতদূর এগোলেন আপনারা?

বসুচৌধুরী উত্তর দিলেন, আমাদের অবস্থা যথা পূর্বং। আপনি?

আমি মোটামুটি ভালই এগিয়েছি। শুনুন, যে কথা বলতে এখন এলাম। শশাঙ্কবাবুর খাস বেয়ারা কালীপদকে এখুনি অ্যারেস্ট করাবার ব্যবস্থা করুন।

কালীপদকে! আকাশ থেকে পড়লেন দু'জনে।

হ্যাঁ। গুরুতর অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে। এখন আমার ঘড়িতে চারটে দশ। ঘণ্টা-চারেকের মধ্যে আসছি। তখন কিছু মূল্যবান কথা আপনাদের উপহার দিতে পারব আশা করি। তবে কালীপদর এখানে উপস্থিতি তখন নিশ্চিতভাবে প্রয়োজন।

বাসব যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ বিদায় নিল, চা না খেয়েই।

ওদিকে শৈবাল ঘণ্টা খানেক ধরে অপেক্ষা করেছে হ্যাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীটের বাইরের ঘরে বসে। বাসব বাড়ি নেই। বাহাদুরের মুখে ও শুনল খাওয়া-দাওয়া সেরে সেই দুপুরেই বেরিয়ে গেছে।

সাতটা বাজল এক সময়।

এই শীতেও বাসব ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে ঘরে ঢুকল।

একটা কোচে গা এলিয়ে দিয়ে গলা ছাড়ল, বাহাদুর

সঙ্গে সঙ্গে দরজার সামনে বাহাদুরের ভাবলেশহীন মুখখানা দেখতে পাওয়া গেল।

কফি। বুঝলে ডাক্তার, আমার দৃঢ় ধারণা চায়ের চেয়ে কফিতেই শ্রান্ত মন বেশি চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

তা তো বুঝলাম। কিন্তু তুমি গিয়েছিলে কোথায়?

প্রথমে গিয়েছিলাম শশাঙ্কবাবুর বাড়ি। গিয়ে দেখলাম, সোমাদেবী নেই। কালীপদকে ডেকে স্টেশনে পাঠালাম টাইম টেবিল কিনতে।

সেকি! কেন?

আসলে কালীপদকে বেশ কিছুক্ষণ দূরে রাখাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। লাউডান স্ট্রীট থেকে শিয়ালদার দূরত্ব অনেক, কাজেই ও ফিরে আসবার আগেই আমি ওর ঘর সহজেই খানাতল্লাসী করতে পারলাম।

কালীপদর ঘরে কি তল্লাস করতে ঢুকেছিলে?

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, অভিপ্ট বস্তুর সন্ধান সেখানে আমি পেয়েছি। কিন্তু ওকথা এখন থাক। আর কোথায় কোথায় গেলাম শোন আগে। তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম সুটকেশের দোকানে দোকানে।

সুটকেশের দোকানে কেন?

কেনর উত্তরটা তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই ডাক্তার। প্রায় তের বছর আগে যে সুটকেশে ইসরার খালেদ গয়না রেখেছিলেন স্বাভাবিকভাবেই সেটা পুরোন হয়ে যাবার কথা। অথচ গয়নার সুটকেশ বলে কথিত যে সুটকেশটা আমরা পেয়েছি, তা আনকোরা নতুন। এখন

তুমি বলতে চাও, এই সুটকেশে করে মিঃ নাগ গয়না ব্যাঙ্ক থেকে মোটেই আনেননি। সেটা আলাদা সুটকেশ ছিল ?

এক্সজ্যাক্টলি। সুটকেশের মধ্যে কোথাও সৌদিআরবের কোন লেবেল নেই। যা নাকি থাকা উচিত ছিল। কাজেই সুটকেশটা হাতে নিয়ে ধর্মতলা, ভবানীপুর, শেয়ালদা, হ্যারিসন রোড প্রভৃতি যে সমস্ত জায়গা সুটকেশের আড়ৎ, সেই সমস্ত জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হল। আমার ভাগ্য ভাল বলতে হবে, হ্যারিসন রোডের একটা দোকানে আসল কথার সন্ধান পেলাম। দোকানদার বললে দিন কয়েক আগে দুপুরবেলা এক ভদ্রলোক এই সুটকেশটা কিনে নিয়ে যান। দোকানদার ক্রেতার চেহারার মোটামুটি বর্ণনাও আমাকে দিয়েছে।

বাহাদুর ট্রেতে কফি নিয়ে ঘরে এল।

শৈবাল বলল, বল কি! আসল ব্যাপারটা কিন্তু এখনো আমার মাথায় ঢুকছে না ?

ব্যাপার অতি সোজা। হত্যাকারী গয়নার সুটকেশের সঙ্গে নতুন কেনা সুটকেশটা ট্যাক্টফুলি বদল করে নিয়েছিল।

তাই যদি হয়, তাহলে সে শশাঙ্ক নাগকে খুন করতে গেল কেন ?

কফির পেয়ালা তুলে নিয়ে বাসব বলল, এই জায়গায় আমি একটু ধাঁধায় আছি। আমার ধারণা, মিঃ নাগ বুঝতে পেরেছিলেন এই কারসাজি কে করেছে। তাই মার্ডারারের তাঁকে খুন না করে উপায় ছিল না।

কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে শৈবাল বলল, তারপর কোথায় গেলে।

থানায়। থানা থেকে বেরিয়ে টেলিফোন বিভাগের পরিচিত এক কর্তাব্যক্তির কাছে গেলাম। খুন হওয়ার দিন মাঝরাতে মিঃ নাগ কাকে ফোন করেছিলেন খবর নিতে। ওখানে আমাকে নিরাশ হতে হল। অনেক চেষ্টা করেও এতদিন পরে ওসম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভব হল না। তারপর সোজা বাড়ি চলে আসছি। কফিটা শেষ করে নাও, এখুনি আমাদের থানায় যেতে হবে।

থানায় ?

হ্যাঁ। ও'রা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

আটটার কয়েক মিনিট আগেই শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে থানায় পৌঁছাল বাসব।

ওদের দেখেই ইন্সপেক্টার মল্লিক বললেন, কালীপদকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে।

ধন্যবাদ। বাসব বলল, আমার কথার ওপর নির্ভর করেই যে আপনি একাজ করেছেন, সে জন্যে সত্যি খুশি হয়েছি।

কাজটা বে-আইনী করলাম কিনা বুঝতে পারছি না। ওর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না পেয়েই…

আপনি ব্যস্ত হবেন না মিঃ মল্লিক। কালীপদকে এখানে আনান। আপনার ব্যস্ততা আমি এখুনি দূর করে দিচ্ছি।

কালীপদকে আনান হল।

হাউ হাউ করে সে কেঁদে উঠল বাসবকে দেখে।

বাবু, আমি কিছু করিনি, তবু পুলিশ আমাকে ধরে এনেছে।

কিছু একটা তুমি নিশ্চয়ই করেছ কালীপদ বাসব বলল, তা নইলে পুলিশ কি তোমাকে ধরে আনতে পারে?

না বাবু। আমি সত্যি কিছু করিনি।

বেশ, তুমি আমার গোটাকতক কথার সঠিক উত্তর দিয়ে প্রমাণ করে দাও যে, তুমি নির্দোষ।

কালীপদ চুপ করে রইল।

বাসব বলল, সেদিন রাত্রে যখন তোমার ঘুম ভেঙে গেল, তখন তুমি দেখতে পেলে তোমার বাবু নিচে নেমে যাচ্ছেন। তারপর তিনি ফোন করলেন। কে একজন তাঁর সঙ্গে দেখা করল। তুমি এক সময় ঘুমিয়ে পড়লে। এই কথাই তো আমাকে বলেছিলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কিন্তু একটা কথা যে ওই সঙ্গে বলতে ভুলে গিয়েছিলে কালীপদ?

হোমিসাইড স্কোয়াডের বসুচৌধুরী, আনন্দ মল্লিক ও শৈবাল এক মনে বাসবের কথা শুনছিল।

কালীপদ ভীত ভাবে বলল, কি কথা বাবু?

তুমি আর একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিলে—কাচ ভাঙার শব্দ। তারপর সেই শব্দ অনুসরণ করে তুমি তোমার বাবুর ঘরের মধ্যে গিয়েছিলে। সেখানে তোমার সঙ্গে একজনের দেখা হল। সে জানলার কাচ ভেঙে ঘরে ঢুকেছিল। তারপর তোমরা দুজনে

প্রায় চিৎকার করে উঠল কালীপদ, এ সমস্ত কি বলছেন?

যা ঘটেছে তাই বলছি।

না, এ-সমস্ত ঘটেনি। এ-সবের আমি কিছু জানি না।

জানো বৈকি। ওয়ার্ডরোবের চাবি যে বালিশের তলায় রেখে তোমার বাবু ঘুমোন, একথা তো বাইরের লোকের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আর তুমি তাকে চাবির সন্ধান দিতে পেরেছিলে বলে মোটা কিছু হাতাতে পেরেছ?

না—না—না—

এই গয়নাগুলো চিনতে পারছ কালীপদ?

বাসব নিজের পকেট থেকে তিন-চারখানা কানের ও হাতের গয়না বার করল। বলল, তোমাকে টাইমটেবিল আনতে পাঠিয়ে তোমারই বাক্স ঘেঁটে এগুলোর সন্ধান পেয়েছি।

রাজ্যের অন্ধকার নেমে এল কালীপদর মুখের ওপর।

সে মাটিতে বসে পড়ল।

তোমার এ বিষয়ে কিছু বলবার নেই?

এবার সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ল কালীপদ।

আ···আমি বাবু এ-কাজ করতে চাইনি।···লোভে পড়ে··· সামনের গরমেই মেয়ের বিয়ে লোভ সামলাতে না পেরে

যে জানলা টপকে ঘরে ঢুকেছিল, সে কে?

আজ্ঞে --

পরিষ্কার করে বললে তোমার ভালই হবে।

দিদিমণির বড়ভাই রজতবাবু।

বাসব ইন্সপেক্টারের দিকে তাকাল। বলল, এই চোরাই মালগুলো রাখুন। এগুলো সোমাদেবীর।

এই সময় একজন সাব-ইন্সপেক্টার ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি নিচু গলায় আনন্দ মল্লিককে বেশ কিছুক্ষণ ধরে কি সমস্ত বললেন। মল্লিক কালীপদকে হাজতে পাঠালেন। তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত গলায় বললেন, এই মাত্র সুদেশ মুখার্জি ফোন করেছিলেন, বিকেল থেকে নাকি সোমাদেবীকে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি এখুনি আসছেন এখানে।

মিনিট দশের মধ্যেই দেবেশ রাহা ও সুদেশ থানায় এসে পৌঁছল।

প্রশ্নের উত্তরে সুদেশ বলল, এগারোটার সময় কারখানায় ফোন করেছিল সোমা। বলেছিল আমি আর দেবেশবাবু যেন ছুটির পর লাউডন স্ট্রীটে যাই। কাজকর্ম সম্পর্কে কি সমস্ত বলবে। আমরা ছুটির পর ওখানে গিয়ে শুনলাম সে বাড়ি নেই। দুপুরে বেরিয়েছে। দু-ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরও যখন ফিরল না, তখন আমরা চিন্তিত হলাম। পরিচিত সমস্ত জায়গায় ফোনে খবর নিলাম। কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন থানায় খবর দিলাম।

বাড়ির গাড়িতে বেরিয়েছিলেন? বাসব প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ।

খুবই চিন্তার বিষয় হল দেখছি। হাসপাতালগুলোতে খোঁজ নিয়েছেন

নিয়েছি। সন্ধান পাওয়া যায়নি।

ইন্সপেক্টার, আপনি এক কাজ করুন, গাড়ির নম্বরটা ওয়ারলেশকে জানিয়ে দিন। ওরা খোঁজ নিয়ে দেখুক এই নম্বরের গাড়ি কোথাও পার্ক করা আছে কিনা।

সুদেশ ও দেবেশ রাহার স্টেটমেণ্ট ডায়েরিভুক্ত করে নিয়ে আনন্দ মল্লিক নির্দিষ্ট জায়গায় গাড়ির নম্বর জানিয়ে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করলেন।

মিনিট পঁয়তাল্লিশের মধ্যেই সন্ধান পাওয়া গেল।

একটা ওয়ারলেশ ভ্যান গাড়িখানাকে আবিষ্কার করেছে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ওপর। বরানগর পেরিয়ে রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সম্পূর্ণ খালি গাড়িখানা।

সকলে তখুনি পুলিশের গাড়িতে চড়ে ঘটনাস্থলে যাত্রা করলেন।

স্নদেশের মুখ থেকে আগেই খবর পাওয়া গিয়েছিল. ড্রাইভারকে সঙ্গে নেয়নি সোমা। নিজেই ড্রাইভ করছিল।

নির্দিষ্ট জায়গায় পেঁছিতে খুব বেশি সময় লাগল না।

আনন্দ মল্লিক ও বাসব গাড়িখানাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন।

বাসব বলল. গাড়ির মুখ কলকাতার দিকে। মনে হয় ভদ্রমহিলা কলকাতায় ফিরছিলেন।

দেবেশ রাহা বললেন, চন্দননগরে ওঁর বাবা থাকেন, হয়ত ওখান থেকে ফিরছিলেন।

হতে পারে।

প্রমথ তালুকদারের কাছে সংবাদ পাঠানো হল।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি এলেন। সঙ্গে রজতও আছে।

তিনি বললেন, বিকেলে সোমা তাঁর ওখানে গিয়েছিল। মিনিট পনের থেকে চলে এসেছে। তারপর আর তিনি কিছু জানেন না।

বাসব তখনও তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চতুর্দিক পরীক্ষা করে চলেছে। হঠাৎ একটা সম্ভাবনার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় মল্লিকের দিকে তাকিয়ে সে বলল, কোন সূত্রের সন্ধান তো পাওয়া যাচ্ছে না। তবে একটা অনুমান ক্রমেই মনের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। আর কোন সম্ভাবনা উপস্থিত হাতের কাছে না থাকায়, আপনি সেই অনুমানের ওপর নির্ভর করে অনুসন্ধান চালাতে পারেন।

কোন্ অনুমানের কথা বলছেন ?

বাসব বসুচৌধুরী ও মল্লিককে এক পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে কি সমস্ত বলল।

তারপর সকলে গাড়িতে চড়ে বসলেন।

বসুচৌধুরী বললেন. মল্লিক, আপনি আমাদের শশাঙ্কবাবুর বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে তবে যান। ততক্ষণ ওখানেই আমরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করব।

রাত প্রায় এগারোটার সময় সকলকে শশাঙ্ক নাগের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গেলেন আনন্দ মল্লিক। সকলে পার্লারে গিয়ে বসলেন। অতর্কিতে এই ঘটনাটা ঘটে যাওয়ায় সকলেই কেমন দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

সুদেশ একজন বেয়ারাকে ডেকে চায়ের আদেশ দিল।

চা পানের পরও সকলে চিন্তিত মুখে বসে রইলেন। শুধু মেয়ের দুঃখে মাঝে মাঝে প্রমথ তালুকদার কাতরে উঠছেন।

শেষে বাসব বলল. আমার মনে হয় ইন্সপেক্টার সোমাদেবীকে সঙ্গে নিয়েই ফিরবেন। ওই সঙ্গে সেই লোকটিকেও, যে তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু উপস্থিত আমাদের চুপচাপ বসে থেকে লাভ নেই। এই অবকাশে শশাঙ্কবাবুর মৃত্যু-রহস্যটা পরিষ্কার করে নেওয়া যেতে পারে।

বসুচৌধুরী বিস্মিত গলায় বললেন, হত্যা-রহস্যের সমাধান করে ফেলেছেন নাকি ?

আজ বিকেলে প্রথম যখন আপনার সঙ্গে দেখা হয়, তখনও সমস্যার দোলায়

দ্ললাছ। কিন্তু তারপরই কয়েকটা অন্সন্ধানে আশাতীত রকমের সাফল্য লাভ করলাম। সেই স্ত্রেই এখন আমি সমাধানের কূলে এসে দাঁড়িয়েছি। তবে সমস্ত কথা বলার আগে রজতবাব্কে একটা প্রশ্ন করেনি, আপনি এবাড়িতে চুরি করতে ঢুকেছিলেন কেন?

আকাশ থেকে পড়ল রজত।

আমি চুরি করতে....

বিস্ময়ের ভান করবেন না। কালীপদ আমাদের সব বলেছে।

তাল্কদার কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।

একটু চুপ করে থেকে পরিষ্কার গলায় রজত বলল, আমার টাকার দরকার ছিল। যে-কোন উপায়ে টাকা সংগ্রহ করতে না পারলে আমায় বিপদে পড়তে হত।

বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পেতে গিয়ে পরের বাড়িতে চুরি করতে যাওয়া নিশ্চয়ই শোভনীয় নয়। যাই হোক, আপনাকে প্লিশের হাতে দেওয়া হবে কিনা, তা নির্ভর করছে আপনার বোনের সদিচ্ছার ওপর। যাক্ ওকথা। এখন আসল আলোচনায় আসা যাক। আলোচনার প্রারম্ভেই কিছ্ গ্র্তর জিনিসের অবতারণা করতে চাই। শশাঙ্ক কিসে মারা গেলেন, এসম্বন্ধে অনেকেরই মনে প্রশ্ন থাকতে পারে। যেক্ষেত্রে পোস্টমর্টেমের রিপোর্টে এ বিষয়ে কিছ্ বলা হয়নি।

বস্চৌধ্রী বললেন, আপনি ধরতে পেরেছেন?

হ্যাঁ। তাঁকে মর্ফিন প্রয়োগ করা হয়েছিল।

মর্ফিন! মৃদ্-গ্ঞ্জন উঠল।

বস্তুটা কি? স্দেশ প্রশ্ন করল।

আফিম গাছের নির্যাস থেকে প্রস্তুত একরকম ওষ্ধ। বিদেশে এর চলন অত্যন্ত বেশি। সাময়িক উত্তেজনা ও শারীরিক যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাবার আদর্শ জিনিস। তবে বেশি মাত্রায় মর্ফিন শরীরে গেলে মারাত্মক র্প যে নিতে পারে তার প্রমাণ শশাঙ্কবাব্র মৃত্যু।

হত্যাকারী কি তাঁকে মর্ফিন খাইয়ে দিয়েছিল? তাহলে তো....

না। খাইয়ে দিলে খ্ব তাড়াতাড়িই ধরে ফেলা যেত। আসলে তিনি মর্ফিন-য্ক্ত সিগারেট স্মোক করেছিলেন। আশা করি আপনারা ব্যাপারটা ব্ঝতে পেরেছেন? এবার আপনাদের একটা গল্প শোনাতে চাই।

দেবেশ রাহা আশ্চর্য হয়ে বললেন, গল্প শোনাবেন!

প্রমথ তাল্কদার অবজ্ঞা করে হাসলেন। বললেন, গল্পই শোনা যাক তাহলে।

শ্নতে খ্ব খারাপ লাগবে না,—বাসব বলল, খ্নের গল্প; শ্ন্ন। এক বন্ধ্ আরেক বন্ধ্র কাছে এক স্টকেশ গয়না গচ্ছিত রেখে বারো বছরের জন্যে উধাও হয়। ধর্ন, যে বন্ধ্টির কাছে গয়না গচ্ছিত ছিল, তাঁর নাম

শশাঙ্ক নাগ। বন্ধুটি ফিরে এসে গয়না দাবী করলেন। শশাঙ্ক বললেন, ভল্টে জমা রেখেছি। তুমি অমুক দিন রাত্রে এসে নিয়ে যেও। তারপর তিনি দুজন সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে ভল্ট থেকে গয়নার বাক্সটা বার করে নিয়ে এসে অফিস-রুমের সেফে বন্ধ করে রাখলেন। সেফটা প্রথম শ্রেণীর—তালার কোন ব্যবস্থা নেই, ওয়ার্ডলক সিস্টেম। সেই সিস্টেমের বিষয় একমাত্র তিনিই জানেন। পাছে ভুলে যান বলে ডায়েরিতে টুকে রেখেছেন। অফিস-রুম থেকে তিনি আর বেরুলেন না। শুধু কিছুক্ষণের জন্যে লাঞ্চে গিয়েছিলেন একবার। অবশ্য ঘর খালি রাখেননি, একজন সহকর্মীকে বসিয়ে রেখেছিলেন। বিকেলে বাড়ি ফেরার সময় গয়নার সুটকেশটা নিজের শোবার ঘরের ওয়ার্ডরোবে গিয়ে রাখলেন শশাঙ্ক। রাত্রে বন্ধু এলেন। সুটকেশ হস্তান্তরিত হল। বন্ধু সুটকেশ খুলে দেখেন গয়না নেই। এই খবর পেতেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল শশাঙ্কর। কোথায় গেল গয়না – কিভাবে চুরি গেল! ভাবতে ভাবতে তিনি ব্যাপারটা ধরে ফেললেন। রাত্রি তখন অনেক, শোবার ঘর থেকে ড্রয়িংরুমে নেমে এলেন। ফোন করে ডেকে পাঠালেন গয়না চোরকে। গয়না চোর কিন্তু জানত যে, শশাঙ্ক নাগ তার কারচুপি ধরে ফেলবেন। তাই আগে থেকেই সমস্ত ব্যবস্থা সে পাকা করে রেখেছিল, অর্থাৎ তাঁর সিগারেটের টিন বা কেসে মর্ফিন ছিটিয়ে রেখেছিল বহু আগেই। মিস্টার নাগ একের পর এক সিগারেট নিঃশেষ করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। মারাও গেলেন মাঝরাতে। অবশ্য ফোন পেয়ে হত্যাকারী এসেছিল। দুজনের মধ্যে কি কথা হয়েছিল জানা নেই। তবে হত্যাকারী নিশ্চিত ছিল যে শশাঙ্ক নাগের মারা যেতে আর খুব বিলম্ব নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে হত্যাকারী কে?

কারুর মুখে কথা নেই।

বাসব সিগারেট ধরাল।

সকলে তারই মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

এই সময় পোর্টিকোয় একটা গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে প্রথমে নামলেন আনন্দ মল্লিক, তারপর সোমা। তাকে অত্যন্ত শ্রান্ত দেখাচ্ছে।

সকলে যে যার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন ততক্ষণে।

সুদেশ দ্রুত পায়ে তার কাছে গিয়ে ব্যগ্র গলায় বলল, খুব অসুস্থ বোধ করছ কি?

মাথা নাড়ল সোমা। বেতের চেয়ারে এসে বসল।

প্রমথ তালুকদার বললেন, কোথায় ছিল আমার মেয়ে?

আনন্দ মল্লিক বললেন, আপনারা স্থির হয়ে যে-যার চেয়ারে বসুন; আমি বলছি। আপনার অনুমানই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে বাসববাবু, মৃগাঙ্ক সুরই আটকে রেখেছিলেন সোমাদেবীকে। আমি সদলে তাঁর গ্রে স্ট্রীটের বাসায় গিয়ে পড়লে আর পালাবার পথ পেলেন না।

বাসব বলল, এ সম্পর্কে মৃগাঙ্ক সুরের কথা আমার মনে হওয়ার একমাত্র

কারণ হল, তিনি যে-প্রকৃতির লোক তাতে গচ্ছিত গয়নাগুলো না পেয়ে যে চুপ করে থাকবেন, তা মনে হয় না। তাঁর এই ধারণাই হবে, শশাঙ্ক তাঁকে গয়নাগুলো দিতে চাননি। এখন গয়নাগুলোর সন্ধান একমাত্র সোমাদেবীই দিতে পারবেন। তাই হয়ত তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আপনার কথাই ঠিক। মৃগাঙ্ক অন্যায় কাজটা করে ফেলবার পরই কেমন ঝিমিয়ে পড়েছেন। তিনি সমস্ত কথা আমার কাছে স্বীকার করলেন। তাঁকে ও তাঁর সাকরেদ বিরূপাক্ষকে হাজতে চালান দিয়েছি।

দেবেশবাবু বললেন, কিভাবে ওঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ?

সোমাদেবী যখন চন্দননগরে প্রমথবাবুর বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে ভেতরে গিয়েছিলেন, মৃগাঙ্ক তখন গাড়ির পিছনের সিটের পাদানির কাছে লুকিয়ে ছিলেন। সোমাদেবী ফিরে এসে গাড়িতে স্টার্ট নেবার পর মৃগাঙ্ক কৌশলে তাকে ক্লোরফর্ম করেন। গাড়ি সমেত সোমাদেবীকে গ্রে স্ট্রীটের বাসায় নিয়ে যান। তারপর আবার গাড়িখানা ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে ফেলে রেখে আসেন।

বেয়ারার কাছ থেকে এক গেলাস জল চেয়ে নিয়ে খেল সোমা।

বাসব বলল, সুখের কথা মিস তালুকদারকে বেশিক্ষণ নিগ্রহ ভোগ করতে হয়নি। যাই হোক, রাত বাড়ছে। এদিকে ইন্সপেক্টার মল্লিক সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই রয়েছেন দেখছি। কাজেই এখন আমি নিজের বক্তব্য শেষ করতে পারি।

আনন্দ মল্লিককে পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে বলে বসুচৌধুরী বললেন, বলুন মিস্টার ব্যানার্জি।

বাসব বলল, হত্যাকারী কে, এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমি খুব সহজেই পেয়েছিলাম। আটঘাট বেঁধে কাজ করলেও, কিভাবে সে সুটকেশ বদল করেছিল তার সমাধান করে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই হত্যাকারীর পরিচয় আমার কাছে আর অস্পষ্ট রইল না। শশাঙ্ক নাগ আমারই মত তার প্ল্যানটা ধরে ফেলেছিলেন। এখনো আপনারা ধাঁধায় রয়েছেন ? বুঝতে পারছেন না এই মরণ যজ্ঞের হোতা কে ? আমিই বলছি। দেবেশবাবু আপনার এ বিষয়ে কোন বক্তব্য আছে ?

আমার ! দেবেশ রাহা বিস্ময়ের শেষ ধাপে। আমার আবার কিসের বক্তব্য ?

আপনার মুখের ভাব খুবই রিয়েলিস্টিক হয়েছে। কিন্তু ওতে বিশেষ কাজ হবে না মিস্টার রাহা। আমি জানি গয়নাগুলোর লোভে পড়ে কত স্মার্টলি আপনি শশাঙ্ক নাগকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছেন।

নিজের চেয়ার থেকে ছিটকে পড়লেন দেবেশ রাহা।

তাঁর সারা মুখে যেন আবিরের পুরু প্রলেপ।

দাঁতে দাঁত চেপে তিনি বললেন, হাউ ডেয়ার ইউ আর—

ডেয়ার আমি চিরকালই। ভাববেন না, একটা কারণেই আমি আপনাকে সন্দেহ করেছি। একাধিক কারণ আমাকে টেনে নিয়ে গেছে আপনার দিকে। যে দোকান থেকে আপনি সুটকেশ কিনেছিলেন, তার সন্ধান আমি পেয়েছি।

দোকানদার আপনার চেহারার নিখুঁত বর্ণনা আমাকে দিয়েছে। তার স্মরণশক্তির প্রশংসা অবশ্য না করে থাকা যায় না। আমি আপনার চেহারার বর্ণনা পাবার পরই বুঝতে পারলাম, আপনি কিভাবে সুটকেশ বদল করেছিলেন। যে-সময় আপনাকে ঘরে বসিয়ে মিঃ নাগ লাঞ্চে গিয়েছিলেন, আপনাকে কাজ সারতে হয়েছিল সেই সময়। আপনার ভাষায় বলি, মিঃ নাগ কোন কিছু না নিয়ে, অর্থাৎ ফোলিও ইত্যাদি—যার মধ্যে ডায়েরি ছিল—না নিয়েই বাড়ি চলে যান লাঞ্চ সারতে। আপনি ডায়েরি থেকে ওয়ার্ডলকের ফরমুলাটা জেনে নিয়ে সেফ খুলে সুটকেশটা বার করে, সদ্য কেনা সুটকেশটা সেফে ভরে রাখেন। তার আগে মিঃ নাগের ড্রইংরুমে জুতোর একটু ধুলো সংগ্রহ করি। যার এনালিসিস করে জানতে পারা যায়, তার মধ্যে সুরকি ও লোহার গুঁড়ো রয়েছে। এই দুটো জিনিস আপনার ও সুদেশবাবুর জুতোর তলায় স্বাভাবিকভাবে আসতে পারে। কারণ আপনারা কারখানায় কাজ করেন এবং ওখানে কিছু ইঁট-সুরকিরও কাজ হচ্ছে। সুদেশবাবুকে সন্দেহের লিস্ট থেকে এই কারণে বাদ দিতে হবে যে, তিনি রাজকন্যা লাভের সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছেন। রাজ্য লাভ তাঁর হবেই। কাজেই গয়নার লোভেই শশাঙ্ক নাগকে খুন করে তিনি নিশ্চয়ই নিজের আখের নষ্ট করবেন না। আপনাদের সেদিন ঘর থেকে বার করে দিয়ে, আমি মিঃ নাগের সেক্রেটারিয়েট টেবিলে আপনি যেখানে হাত রেখেছিলেন—সেখান থেকে ছাপটা তুলে নিই। সুটকেশের মধ্যে যে ছেঁড়া বাড়ির নক্সা পাওয়া যায়—যা নিশ্চয়ই কারখানারই কোন প্ল্যান, তার মধ্যে এবং সুটকেশের গায়ে যে হাতের কয়েকটা ছাপ পাওয়া গেল, যার একটার সঙ্গে আপনার হাতের সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। যা কিন্তু থাকবার কথা নয়। এই সমস্ত মিলিয়ে আমি আপনার সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হয়েছি। আপনাকে এখন কিভাবে আদালতে উপস্থিত করা হবে সে দায়িত্ব আমার নয়—পুলিশের। তবে আমি এইটুকু বলতে পারি, আপনার বাড়ি তল্লাশ করলে গয়নার সুটকেশটা ওখানে পাওয়া যাবে।

এক নাগাড়ে এতটা বলার পর বাসব থামল।

উত্তেজনার মুখে রাহা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, আবার বসে পড়লেন চেয়ারে। দু'হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে ফেললেন।

আর সকলে নির্বাক হয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছেন তাঁরই দিকে।

ইন্সপেক্টার মল্লিক উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে গেলেন রাহার দিকে। খুট করে একটা শব্দ হল, দেবেশ রাহার একটা হাত তখন লোহবলয়ের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে।

বাসবও উঠে দাঁড়াল। বলল, সুদেশবাবু, এখন আমি চললাম। ভরসা আছে আগামীকাল যে কোন সময় আপনি পেমেন্টের ব্যাপারে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। মিস্টার বসুচৌধুরী—মিস্টার মল্লিক, চলি।—ডাক্তার এস।

বাসব ও শৈবাল পার্লার থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

কালোচোখের তারা

বৃষ্টি হচ্ছে।

ঝমঝম শব্দে একটানা বৃষ্টি হয়ে চলেছে।

কাচের শার্শির মধ্যে দিয়ে বাইরের ঝাপসা প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আছে চম্পা। জলে ভেজা, দ্রুত সরে-যাওয়া প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকলেও প্রাকৃতিক শোভায় ডুবে যায়নি ও। সে আনমনে ভাবছে—কত কী ভাবছে। আকাশ পাতাল। আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেসের ছোট একটি সেকেণ্ড ক্লাস কামরা।

চম্পা অবশ্য একাই নেই কামরায়। আরো পাঁচজন যাত্রী রয়েছেন। দুজন মহিলা ও তিনজন পুরুষ। সকলেই অবাঙ্গালী।

দ্রুত এগিয়ে চলেছে আপার ইণ্ডিয়া।

গত রাত্রে যখন শেয়ালদায় ট্রেন ধরতে আসে চম্পা, তখনো বৃষ্টি হচ্ছিল। এখনো সে বৃষ্টির বিরাম নেই। এক এক সময় ও নিজেই অবাক হচ্ছে। কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি চম্পা, হঠাৎ এই ভাবে ওকে প্রায় তিনশ' মাইল পথ পার হতে হবে। কারণ গত পনের বছরের মধ্যে কলকাতা থেকে এক পা বাইরে যাওয়ার সুযোগ ওর হয়নি। পনের বছর আগেও যে খুব বেশীদূর গিয়েছিল তা নয়—গিয়েছিল মামার বাড়ি কৃষ্ণনগর। তখন অবশ্য মা বেঁচেছিলেন।

সশব্দে নিশ্বাস ফেলে চম্পা। জানলার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রিস্ট-ওয়াচের দিকে তাকায়, আটটা দশ। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জামালপুর স্টেশনে ট্রেন ইন করবে।

জামালপুর।

যদিও জামালপুর ওর গন্তব্যস্থল নয়, ও যাবে মুঙ্গের।

মুঙ্গের নামটার সঙ্গে চম্পা পরিচিত ইতিহাসের মাধ্যমেই। মীরকাশিম যখন বাংলার মসনদে, মুঙ্গের তখন বাংলা-বিহারের রাজধানী ছিল। স্কুল জীবনে একথা ইতিহাস পড়ার পর চম্পার মনে এক এক সময় উদয় হয়েছে, মুর্শিদাবাদের এতদূরে বিহারের ওই ছোট্ট শহরেই বা মীরকাশিম নতুন করে রাজধানী পত্তন করতে গেলেন কেন?

সেই মুঙ্গেরে যাবার আহ্বান যে ওর কাছে একদিন আসবে—কল্পনারও অতীত ছিল চম্পার। নিজের ছোটবেলাকার কথা ভাল করে মনে পড়ে না। সম্পূর্ণ জ্ঞান হওয়ার পর থেকে ও শুধু মাকেই দেখে আসছে নিজের পাশে। তিনি ওকে ঘিরে রেখেছিলেন গভীর মমতা দিয়ে।

চম্পা তখন ম্যাট্রিকে পড়ে। মা কাজ করেন একটি মহিলাকেন্দ্রের সেলাই বিভাগে। অতি সামান্য আয়। সংসারের অভাব সে আয়ে পূর্ণ করা সম্ভব হয় না। তবে হাজার অনটনের মধ্যেও মা তাকে যতদূর সম্ভব সুখে রাখবার চেষ্টা করতেন, একথা পরিষ্কার মনে আছে চম্পার। তবু মাঝে মাঝে আক্ষেপ

করে বলতেন, তোর কী এত কষ্ট পাবার কথা ! সবই আমার ভাগ্য।

চম্পা অনেক সময় প্রশ্ন করত, তুমি বার বার একথা কেন বল মা ?

মা এড়িয়ে যেতেন প্রশ্নটা। যা হোক একটা কিছু বলে উঠে চলে যেতেন অন্যত্র কোথাও।

এইভাবেই কোনক্রমে গড়িয়ে গড়িয়ে দিন কাটছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে প্রবাহও বজায় থাকল না। ঝড় উঠল যেন। কাল বৈশাখীর ঝড়। আর ঝড়ের তাণ্ডব চম্পার জীবনের সমস্ত কিছুকে ছত্রাকারে ছড়িয়ে দিয়ে গেল।

ম্যাট্রিকের ফাইনাল পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছিল।

আজই ছিল তার শেষ দিন।

চম্পা পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরে এল তিনটের পর।

মা বাড়ি নেই। পাঁচটার আগে তাঁর ফেরার কথাও নয়। চম্পা সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। একনাগাড়ে কয়েকদিন ধরে পরীক্ষা দিয়ে ও বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

ঘুম এসে গিয়েছিল। হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দে ওর তন্দ্রা টুটে গেল। এখন আবার কে এল ? মা কী— ! ও তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে দরজাটা গিয়ে খুলে দিল।

দরজার সামনে একটি দারোয়ান শ্রেণীর লোক দাঁড়িয়ে। চম্পা বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

লোকটি বলল, আপনার নাম কি চম্পা চ্যাটার্জি ?

—হ্যাঁ। কেন ?

—আমি ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ থেকে আসছি।

চম্পা আশ্চর্য কণ্ঠে বলল, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ! কিন্তু···

--আপনার নামে একটা চিঠি আছে।

একটা ভাঁজ করা কাগজ লোকটি ওর হাতে দিল।

কাঁপা হাতে কাগজের ভাঁজ খুলে দ্রুত চিঠিখানা পড়ে ফেলল চম্পা। এ কী !····মা !!····মা'র অ্যাক্সিডেন্ড হয়েছে—!!!

মাত্র মিনিট দশেক হল শ্মশান থেকে ফিরে এসেছে চম্পা।

হাসপাতালে জীবিত অবস্থায় মাকে ও দেখতে পায়নি। ওর পৌঁছাবার মিনিট কুড়িক আগেই তিনি মারা গিয়েছিলেন।

সার্কুলার রোডে বাস থেকে নামতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়েন তিনি। আঘাত গুরুতর হয়েছিল। তবে জ্ঞান ছিল শেষ পর্যন্ত তাঁর। চম্পাকে দেখবার এক গভীর ব্যাকুলতা তিনি ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ করেছিলেন।

চম্পার চোখে জল নেই। পৃথিবীতে মাকে ছাড়া আর কাউকে সে নিজের বলে জানত না। তবু ওর চোখে জল নেই। গভীর শোকে নিজের অসহায়তার কথা চিন্তা করে পাথর হয়ে গেছে চম্পা।

আনন্দবাবু এলেন। আনন্দ রায়—বাড়িওয়ালা। প্রকৃত ভদ্রলোক তিনি। আজ-কালকার দিনে এরকম বাড়িওয়ালা বড় একটা দেখা যায় না।

চম্পার মাথায় হাত রেখে শান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, এই শোকে তোমাকে সান্ত্বনা দেবার মত কোন ভাষা আমার নেই মা। তবে

—আমি আমার কি হবে কাকাবাবু ?

—তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। আমার সাধ্য থাকলে এর সমাধান এখুনি হয়ে যেত। কিন্তু—তোমার মামা রয়েছেন। আমার মনে হয় তোমার এখন কৃষ্ণনগর চলে যাওয়াই উচিত।

কৃষ্ণনগরে যেতে হল না চম্পাকে।

পরের দিন মামা এলেন। বোনের মৃত্যুতে, শোকের দু'চারটে বাঁধা-গৎ আওড়াবার পর তিনি নিজের মনের আসল কথাটা প্রকাশ করলেন।

তিনি চম্পাকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে পারলে আনন্দিত হতেন। কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে না। একে অভাবের সংসার তার ওপর দুটি বয়স্থা কন্যা এখনো অবিবাহিতা। তাদের পাত্রস্থ করবার জন্যে তিনি হন্যে কুকুরের মত চারিদিক চষে বেড়াচ্ছেন। কাজেই অনূঢ়া ভাগ্নীর ভার গ্রহণ করে তিনি আর নিজেকে বিপদগ্রস্ত করতে চান না। ইত্যাদি—

মামা চলে যাওয়ার পর অবশ্য চম্পাকে সত্যিই ভেসে বেড়াতে হয়নি। হাজার অসুবিধা সত্ত্বেও আনন্দবাবু তাকে নিজের পরিবারভুক্ত করে নিয়েছেন। এ অনুগ্রহটুকু মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না চম্পার।

লেখাপড়ায় ও খারাপ নয়। মেধাবিনী ছাত্রী হিসেবে স্কুলে ওর সুনাম ছিল। তাই ম্যাট্রিকের দরজা ও সহজেই পার হয়ে এল। আনন্দবাবু একটা কাজের ব্যবস্থা করেছিলেন ওর। কাজ হল একজন ধনী রুগ্ন বৃদ্ধের সঙ্গদান করা—তাঁকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, খবর-কাগজ পড়ে শোনানো, তাঁর হয়ে চিঠি লিখে দেওয়া, খুচরো ফাইফরমাশ কিছু খাটা ইত্যাদি—।

মাসিক দক্ষিণা পঞ্চাশ টাকা।

এই ব্যবস্থায় আনন্দিত হয়েছে চম্পা। আনন্দবাবুর সংসারে কিছুটা সাহায্য অন্তত করতে পারবে, এতেই আনন্দিত।

এরপর কেটে গেছে কয়েক বছর।

পনের বছরের চম্পা এখন ঊনিশ বছরের।

নানা ওঠা-পড়ার মধ্যে কখনো ঝিমিয়ে আবার কখনো দ্রুততালে এগিয়ে এসেছে ওর জীবন প্রবাহ। একটানা চার বছর এইভাবে কাটার পর ওর দ্রুত চলমান জীবন-প্রবাহ হঠাৎ হোঁচট খেয়ে থেমে পড়েছে সম্প্রতি।

মাসখানেক ধরে বেকার বসে আছে চম্পা। প্রচুর সন্ধান করেও একটা কাজের জোগাড় ও করে উঠতে পারছে না। অথচ এর আগে একটা কাজ যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা কাজ পেয়েছে কত তাড়াতাড়ি। অনেক সময়ে

লোকে বাড়ি বয়ে এসে ওকে কাজে নিযুক্ত করে গেছে। কিন্তু এখন—তাই ভাবছে চম্পা।

আনন্দবাবুর অভাবের সংসার উপস্থিত আরো অভাবের ভারে নুয়ে পড়েছে। চারটে ছোট ছোট ঘর তিনি ভাড়া দেন—কয়েক মাসের ভাড়া ভাড়াটে বাকি রেখেছে। আনন্দবাবুর চাকরি জীবনের এই হল শেষ মাস। আসছে মাসে তিনি রিটায়ার করবেন। ওর চাকরিটাও গেল ঠিক সময় বুঝেই।

কাজেই চিন্তার শেষ নেই চম্পার।

ওর চরম বিপদের দিনে আনন্দবাবু ওকে আশ্রয় দিয়েছিলেন—আজ তাঁর দুর্দিনে চম্পা তাঁকে সাহায্য করতে পারছে না, এটা কী কম পরিতাপের বিষয়!

দরজার কড়া নড়ে উঠল এই সময়।

ও উঠে গিয়ে দরজা খুলল। একটি যুবক দাঁড়িয়ে।

ওকে দেখেই যুবকটি বলল, আনন্দবাবু বাড়ি আছেন?

—তিনি এখনো অফিস থেকে ফেরেননি। আপনার তাঁকে কিছু বলবার থাকলে আমায় বলে যেতে পারেন।

—প্রয়োজন ঠিক তাঁর সঙ্গে নয়। যুবকটি বলল, চম্পা চ্যাটার্জি নামে যে মহিলাটি এখানে থাকেন—

—বলুন! আমিই—

—ও, আপনি। আমি মিত্র এ্যাণ্ড রে এ্যাটর্নি অফিস থেকে আসছি।

এ্যাটর্নি অফিস থেকে! চম্পা বিস্ময়ে ভেঙ্গে পড়ে। —কি ব্যাপার বলুন ত?

—কাল দুপুরে আপনাকে একবার আমাদের ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটের অফিসে যেতে হবে।

—আমাকে? কেন?

—আমি ঠিক বলতে পারব না। এই যে, অফিসিয়াল চিঠিটা নিন। কাল দুটোর পর গেলেই আমাদের সুবিধা হবে।

যুবকটি ওর হাতে মুখবন্ধ একটি খাম দিয়ে বিদায় নিল।

আনন্দবাবু আজ আর অফিস গেলেন না।

চম্পাকে নিয়ে এ্যাটর্নি পাড়ায় এলেন দুটোর পর।

চম্পার মত তিনিও কোন হদিস খুঁজে পাচ্ছেন না, হঠাৎ এই এ্যাটর্নি অফিস থেকে আহ্বানের। ঠিকানা খুঁজে বার করতে খুব কষ্ট হল না ওঁদের।

একটি বিরাট বাড়ির অসংখ্য ঘরে নানা ধরনের অফিস।

দোতলার দক্ষিণ প্রান্তের চারখানা ঘর নিয়ে মিত্র এ্যাণ্ড রে।

স্লিপ পাঠাতেই সিনিয়ার পার্টনার মহীতোষ মিত্র স্বয়ং এসে চম্পা ও আনন্দবাবুকে নিজের চেম্বারে নিয়ে গেলেন। বসতে অনুরোধ করলেন। চা এল তারপর।

মিঃ মিত্র বললেন, আপনারা নিশ্চয়ই আশ্চর্য হচ্ছেন, আপনাদের এভাবে হঠাৎ ডেকে পাঠাবার জন্য ?

আনন্দবাবু বললেন, অবাক হবার কথা বৈকি !

—আমি আমার এক বিশিষ্ট মক্কেলের অনুরোধেই আপনাদের আহ্বান করেছি।

—মক্কেল ! তিনি কে ?

—আমি বুঝিয়ে বলছি ব্যাপারটা। মিঃ মিত্র বললেন, এখান থেকে ২৮৬ মাইল দূরে বিহারের একটি শহর আছে, নাম তার মুঙ্গের।

জানি। মীরকাশিমের আমলে বাংলার রাজধানী ছিল। চম্পা বলল।

--ঠিকই বলেছেন। সেখানে আমার এক মক্কেলের বার্ষিক দু-লক্ষ টাকা আয় বিশিষ্ট এক সম্পত্তি আছে। তিনি আমায় লিখিত ভাবে আদেশ দেন, তাঁর মৃত্যুর পর যখন উইল পড়া হবে তখন যেন ৺দেবনারায়ণ চ্যাটার্জির কন্যা চম্পা চ্যাটার্জি সেখানে উপস্থিত থাকেন।

চম্পা অবাক দৃষ্টিতে মিঃ মিত্রের মুখের দিকে তাকায়।

আনন্দবাবু বললেন, আপনার মক্কেলের নাম জানতে পারি ?

---নিশ্চয়ই। রাজনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

---তিনি কি মারা গেছেন ?

---আমার মক্কেল মারা গেছেন মাস দুয়েক আগে।

চম্পা নিজের বিহ্বল ভাবটা দমন করে এবার বলল, কিন্তু আমি তো এ নামে কাউকে চিনি না। তাঁর উইল পড়ার সময় আমি সেখানে উপস্থিত থাকব কেন ?

চোখ থেকে চশমাটা খুলে রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে মহীতোষ মিত্র বললেন, কেন'র উত্তরটা উইল পড়ার পরই পাওয়া যাবে।

—আপনি আমার ঠিকানা পেলেন কি ভাবে ?

--আপনার মামার বাড়ির ঠিকানা আমার কাছে দেওয়া ছিল। ওখান থেকেই আমি আপনার বর্তমান ঠিকানা সংগ্রহ করেছি।

--কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না—একজন অপরিচিত ধনী ভদ্রলোক আমাকে · আমাকেই বা ·· আচ্ছা, আমি ইচ্ছে করলে তো নাও যেতে পারি ?

—যাওয়া না যাওয়া সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছের উপর নির্ভর করছে। তবে আমার মতে না যাওয়াটা যুক্তি সঙ্গত হবে না। যাই হোক, এই আপনার পরিচয়-পত্র রইল। যাওয়ার মনস্থ করলে কালকের রাত্রের ট্রেনে রওয়ানা হবেন।

আনন্দবাবু প্রশ্ন করলেন, কবে উইল পড়া হবে ?

—আগামী সোমবার, অর্থাৎ আজ থেকে চারদিন পরে উইল পড়া হবে।

টেবিলের ওপর থেকে খামে মোড়া পরিচয়-পত্রটা হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল চম্পা। আনন্দবাবুও।

তারপর নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিল দুজনে।

অনেক রাত্রি অবধি ঘুমতে পারল না চম্পা।

রাজ্যের চিন্তা ওকে কুরেকুরে খেয়ে চলেছে। কোথাকার মিলওনিয়ার রাজনারায়ণ চ্যাটার্জি মারা যাবার আগে ওর সম্বন্ধে এই রকম অদ্ভুত নির্দেশই বা দিয়ে গেছেন কেন?

চম্পা এ নাম আগে কোনদিন শোনেনি। এমনকি মাও ওকে বলেনিন কোনদিন।

কে এই রাজনারায়ণ?

বিছানায় উঠে বসল চম্পা। এরকম ঘটনা উপন্যাসেই পড়া যায়। নায়িকাদের জীবনেই এই রকম চকমপ্রদ ঘটনা ঘটে থাকে। ও কী উপন্যাসের নায়িকা হয়ে উঠল!

বিছানা থেকে নেমে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল চম্পা।

বৃষ্টি হচ্ছে। অনেকক্ষণ থেকেই একটানা হয়ে চলেছে বৃষ্টি। রাস্তায় বেশ জল জমেছে। ছপ ছপ করে শব্দ তুলে একটা কুকুর জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। আহারের সন্ধানেই তাকে এই বৃষ্টি মাথায় করে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে হয়তো।

চম্পা জানলার গরাদ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

হ্যাঁ, ও যাবে মুঙ্গেরে। রাজনারায়ণ চ্যাটার্জি যতই তার অপরিচিত হোন না কেন, তবু··· । অন্তত কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যেই যাবে।

পাশের ঘরের ঘড়িতে সশব্দে তিনটে বাজল। চম্পা জানলা বন্ধ করে বিছানার দিকে ফিরে চলল। এবার একটু ঘুমের আরাধনা করা উচিত।

আনন্দবাবু কিন্তু মুঙ্গের যেতে রাজি হলেন না।

এ্যাটর্নি মহীতোষ মিত্র চম্পাকেই মুঙ্গেরে যেতে বলেছেন, সে ক্ষেত্রে—। আত্মমর্যাদাশীল এই লোকটির মনের ভাব বুঝতে চম্পার কষ্ট হয় না। কাজেই একাই রওয়ানা হতে হল ওকে।

ট্রেনে বিশেষ ভিড় ছিল না। বৃষ্টির মাতামাতির জন্য অনেকেই নিজের যাত্রা স্থগিত রেখেছে কিনা বলা শক্ত। তবে···

প্রবল শব্দে চটকা ভাঙল চম্পার। অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে এল ও। কাচের শার্শির দিকে চোখ ফেরাতেই ও দেখল, ট্রেন তখন একটা টানেলের মধ্যে দিয়ে চলেছে।

॥ এক ॥

মুঙ্গেরের প্রতিষ্ঠা মহাভারতের যুগেই।

তখন অবশ্য এই শহরটির নাম ছিল মুদগলপুর। কথিত আছে মহাবীর কর্ণ নিজের রাজধানী থেকে মাসের মধ্যে কয়েকবার এখানে আসতেন, মুক্তহস্তে

জনসাধারণকে অর্থদান করবার জন্যে। যে বিশেষ জায়গাটিতে বসে কর্ণ দান করতেন, তা এখন কারণচৌড়া (কথাটা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে এই রকম রূপ নিয়েছে—) নামে প্রসিদ্ধ।

পরবর্তীকালে মুঙ্গেরের বুকের ওপর দিয়ে অনেক রাজনৈতিক ঝড়ঝাপটা বয়ে গেছে। দিল্লীর সিংহাসনে তখন সাজাহান।

স্থবির ভারতসম্রাট সাজাহান। প্রজাপালক হিসেবে তাঁর নাম ইতিহাসে যে অক্ষরেই লেখা থাক না কেন—পারিবারিক ক্ষেত্রে তিনি চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ব্যাপারে যদি একটু দৃঢ়তা প্রকাশ করতেন তাহলে ইতিহাস অন্যভাবে রচিত হত।

সবে আরম্ভ হয়েছে ভায়ে ভায়ে হানাহানি।

আওরাংজেবের স্বরূপ প্রকাশ পাচ্ছে ক্রমেই।

সুজা সসৈন্যে মুঙ্গেরে এসে উপস্থিত হলেন। নিজের শক্তিবৃদ্ধির জন্যে তিনি এখান থেকেই সৈন্য সংগ্রহ করতে আরম্ভ করলেন। তারপর—

তারপর আবার ঐতিহাসিক পর্দা স্মরণীয় ভাবে উত্তোলিত হল নবাবী আমলে। বিশেষ রাজনৈতিক কারণে মীরকাশিম মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী মুঙ্গেরে তুলে এনেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এখানে রাজত্ব তিনি করতে পারেননি। ইংরেজদের দুর্বার গতিকে ঠেকিয়ে রাখার মত শক্তি তাঁর ছিল না। তিনি·····

এরপর কেটে গেছে বছরের পর বছর।

অনেক ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাসকে পেছনে ফেলে মুঙ্গের আজ নিটোল রূপ নিয়েছে। এখন আর নেই কোন হানাহানির আতঙ্ক। সুন্দর ছবির মত শহরের সুনাম আজ সর্বত্র।

হাজার দুয়েক বাঙ্গালী এখানে বাস করেন। সকলেই বেশ প্রতিষ্ঠাপন্ন। নিজেদের বাড়ি আছে প্রায় সব পরিবারেরই। তবে মুঙ্গেরে পা দেওয়ার পরই প্রথমেই যে বাড়িখানা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার বৈভব বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী দুই মহলেরই সমস্ত ঐশ্বর্যকে ম্লান করে দিয়েছে।

এই বাড়িখানি 'রাজনারায়ণ লজ' নামেই বিখ্যাত। দেড়বিঘা জমির উপর এই তেতলা বাড়িটার কোথাও কণামাত্র আধুনিকতার ছাপ নেই। সেকালের মূর্তিশিল্পের ঐতিহ্য নিয়ে একালেও বিরাট দৈত্যের মত বাড়িখানি দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন।

বাড়ির মালিক রাজনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় শুধু বিরাট ধনীই ছিলেন না—সামাজিক বহুতর কাজে উৎসাহদাতা হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল।

সম্প্রতি তিনি মারা গেছেন।

মুঙ্গেরের মত শহরে এই ধনী লোকটি কীভাবে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, তার একটা ইতিহাস আছে। রাজনারায়ণ প্রথমে এখানে আসেননি, প্রথমে এসেছিলেন তাঁর ঠাকুরদা। পুরুতের কাজ করে আর নিজের পেট ভরাতে না

পেরে, প্রায় ৭৫ বছর আগে বাংলাদেশের বারুইপুর থেকে নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ভাগ্যের অন্বেষণে বেরিয়ে পড়েন। এবং হাঁটাপথে বিহারে এসে গিধোড় রাজ এস্টেটের সেরেস্তায় চাকরি পান।

তীক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন নরনারায়ণ পরিবর্তীকালে প্রভূত উন্নতি করেছিলেন। দৈবাৎ কোন একটি বিশেষ কাজের জন্যে কুমার বাহাদুরের দৃষ্টিতে তিনি পড়েন। উন্নত ভাগ্যের সূত্রপাত এখানেই।

মৃত্যুর সময় নরনারায়ণ কয়েক লক্ষ টাকা রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর একমাত্র পুত্র রায়নারায়ণ অর্থের অঙ্ক এক কপর্দক বাড়াতে পারেননি। বরং মদের স্রোতে সমস্ত অর্থ বইয়ে দিয়েছিলেন বছর কুড়িকের মধ্যেই। মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকু পর্যন্ত তাঁকে হারাতে হয়েছিল।

কিন্তু জ্যেষ্ঠপুত্র রাজনারায়ণ ছিলেন নরনারায়ণের মতই সংযত চরিত্রের। তিনি শোচনীয় পারিবারিক অবস্থা দেখে, অতি অল্প বয়সেই অর্থের সাধনায় ব্যাপৃত হলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী বিমুখ করেননি রাজনারায়ণকে। টিম্বারের ব্যবসায় লক্ষ লক্ষ টাকা তিনি উপার্জন করেছেন। অবশ্য শেষ জীবনে তিনি কাঠের ব্যবসা তুলে দিয়েছিলেন। বিরাট জমিদারী কিনেছিলেন—নিজেই সমস্ত দেখাশুনা করতেন। আজ যদিও রাজনারায়ণ নেই, তবে 'রাজনারায়ণ লজ' আছে।

আমাদের ফেলে আসা গল্পের খেই আবার এখান থেকে ধরতে হবে।

ঢং ঢং শব্দে কোথায় ছটা বাজল।

রাজনারায়ণ লজের সকাল হয় একটু বেলায়।

তাই এখন বেশির ভাগ লোকই যে যার বিছানায়।

শুধু একতলার বাগানের দিকের ঘরে আলো জ্বলছে। মাঝারি সাইজের ঘরখানি। একটি টেবিলের সামনাসামনি দুটি চেয়ারে দুজন বসে। একজন প্রৌঢ়, অন্যজন যুবক।

এখানে এঁদের পরিচয় দেওয়াটা অনাবশ্যক হবে না।

প্রৌঢ় ব্যক্তিটি হলেন মৃত গৃহকর্তা রাজনারায়ণবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামনারায়ণ চ্যাটার্জি। যুবকটি জয়ন্ত চৌধুরী—রামনারায়ণবাবুর শ্যালক।

সোনার সিগারেট-কেশ থেকে একটা সিগারেট বার করে বললেন রামনারায়ণ যা বলছিলাম, দাদা ভুগছিলেন ঠিকই, তবে হঠাৎ এভাবে মারা যাবেন ভাবতে পারিনি।

—বয়স হয়েছিল মারা গেছেন, এতে আর আক্ষেপ করবার কী আছে!

—আক্ষেপ ঠিক করছি না। আমার কি মনে হয় জান?

জয়ন্ত চৌধুরী বললেন, বলুন?

—আমার ধারণা দাদা···

—থামলেন কেন, বলুন?

এবার সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলেন রামনারায়ণ। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, আমার ধারণা দাদা সহজভাবে মারা যাননি।

—অর্থাৎ ?

—তুমি নিশ্চয়ই শুনে থাকবে দাদা মুঙ্গেরের বাড়িতে মারা যাননি। তিনি মারা গিয়েছিলেন এখান থেকে মাইল কুড়িক দূরে, পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা তাঁর জমিদারি লাকাড়কোলায়।

—হ্যাঁ, আমি একথা শুনেছি।

সিগারেটে একটা দীর্ঘটান দিয়ে রামনারায়ণ বললেন, তাঁর মৃতদেহ যখন এখানে বয়ে আনা হয় তখন আমি প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পেরেছিলাম, তাঁকে --

—তাঁকে ?

—আমি ডাক্তার জয়ন্ত। আমার অনুমান করতে কষ্ট হয়নি, তাঁকে খুন করা হয়েছে।

—খুন! জয়ন্ত চৌধুরী দ্রুত কণ্ঠে বললেন, আস্তে কথা বলুন। দেওয়ালেরও কান আছে।

চাপা গলায় রামনারায়ণ বললেন, প্রশ্ন উঠতে পারে আমি একথা পুলিসকে কেন জানালাম না! সঙ্গত প্রশ্ন। আমি বলেছিলাম আমার ভাইপো ইন্দ্রকে আমার সন্দেহের কথা।

—তারপর ?

—কিন্তু আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক ডাঃ রায় করনারি থ্রম্বোসিস বলে মত প্রকাশ করলেন। ইন্দ্রও আর কোন উচ্চবাচ্য করল না। মৃতদেহ সৎকার হয়ে গেল।

এই প্রসঙ্গটাকে ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গিতে জয়ন্ত চৌধুরী বললেন, যা হবার তা অবশ্য হয়ে গেছে। এখন আর ও বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী। আমায় হঠাৎ তার করে ডেকে পাঠালেন কেন তাই বলুন।

—তোমায় ডেকেছি—এসময়ে আমি তোমার পরামর্শ চাই জয়ন্ত।

—পরামর্শ ?

—হ্যাঁ। কাল দাদার উইল পড়া হবে। উইলে যদি আমার ওই বিষয়ে কোন উল্লেখ না থাকে, তাহলে আমার অবস্থাটা কতখানি শোচনীয় হয়ে উঠবে, তা তুমি অনুমান করতে পার ?

—তবে আপনার যে বোকামি হয়েছে একথা আমি বলব। এভাবে জড়িয়ে পড়বার কোন মানে হয় না।

—একটা রঙীন স্বপ্ন আমাকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল জয়ন্ত। তবে····

রামনারায়ণের কথা শেষ হবার আগেই দরজায় করাঘাত হল।

তিনি বললেন, কে ?

—আমি সুপর্ণ।

—এস, এস—।

দরজার একটা পাল্লা সরিয়ে সুপর্ণ ঘরের মধ্যে এল।

সুঠাম সুশ্রী চেহারা সুপর্ণর। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল।

—আমায় ডেকেছেন ?

রামনারায়ণ বললেন, তোমাকে এখুনি একবার জামালপুর যেতে হবে।

জামালপুর ?

আপার ইণ্ডিয়ায় কলকাতা থেকে একটি মেয়ে আসছে, তাকে নিয়ে আসতে হবে। সাড়ে আটটায় গাড়ি বোধহয়।

ইতস্তত করে সুপর্ণ বলল, কিন্তু আমি তো মহিলাটিকে চিনি না কি ভাবে -

—গেলে ঠিকই চিনতে পারবে। দেখবে কোন বাঙালী মেয়ে স্টেশনে অসহায় ভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে কিনা, তাহলেই—হেসে কথাটা শেষ না করেই চুপ করলেন রামনারায়ণ।

সুপর্ণ ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

জয়ন্ত চৌধুরী প্রশ্ন করলেন, কে আসছে ?

—দেবনারায়ণের মেয়ে।

—অর্থাৎ আপনার দাদার বড় ছেলে দেবনারায়ণবাবুর মেয়ে! তিনি বিয়ে করেছিলেন না কি ?

—হ্যাঁ, বিয়ে সে করেছিল।

—কই আমি তো শুনিনি। আমি জানতাম তিনি অল্প বয়সে গৃহত্যাগ করার পরই কোন অ্যাক্সিডেণ্টে মারা গিয়েছিলেন।

নিরুত্তাপ গলায় রামনারায়ণ বললেন, সাধারণ লোকে তাই জানে বটে। আসল ব্যাপারটা দাদা আমাদের চেপে রাখতে বাধ্য করেছিলেন।

এখন বলতে বাধা আছে ? প্রচুর আগ্রহ নিয়ে জয়ন্ত চৌধুরী প্রশ্ন করলেন।

—না এখন আর আপত্তি কিসের। বেশ শোন -

সন্ধ্যা তখনো ঘন হয়নি।

নিজের ঘরে কোচে বসে আজকের দৈনিকখানায় চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন রাজনারায়ণ। সারাদিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন খবর-কাগজটা পড়ে উঠতে পারেন না। তাই সন্ধ্যা বেলাটাই হল উপযুক্ত সময়।

অবশ্য এ সময় তিনি শুধু খবর-কাগজই পড়েন না, চিঠিপত্রগুলো দেখে নেন। বিশেষ প্রয়োজনীয় কোন চিঠি থাকলে তার উত্তরটা লিখে রাখেন এই সময়।

এই অবকাশটুকু যদিও তিনি খুব কম দিনই হাতে পেয়েছেন। আগে,

স্নেহপ্রভা বেঁচে থাকাকালীন এ সময়ে কিছু করবার উপায় ছিল না। স্নেহপ্রভা কাজের মানুষটিকে সম্পূর্ণ নিজের করে পেতে চাইতেন তখন।

বলতেন, কাজ আর কাজ। সারাদিন এত কাজ করেও তোমার কাজের সাধ বুঝি মেটে না বাপু। এখন রাখ দিকী কাগজপত্তর—

রাজনারায়ণ হাসতেন। জোরে হেসে উঠতেন তিনি। স্ত্রীর কথায় কেমন একটা মাদকতা অনুভব করতেন। তিনিও বলতেন, কাজ না করলে পেট চলবে কি করে? বাবা তো রাস্তায় দাঁড় করিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর যাহোক —

—জানি গো জানি। তুমি যে একজন কর্মীপুরুষ তা আমার খুব ভালভাবে জানা আছে।

এখনো যেন কথাগুলো কানে বাজতে থাকে রাজনারায়ণের।

স্ত্রীকে তিনি ধরে রাখতে পারেন নি। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় আক্ষেপ।

তাই খবর-কাগজ থেকে মুখ তুলে এখনো বারে বারে তাকান স্নেহপ্রভার বড় অয়েল-পেণ্টিংটার দিকে!

এক সময় খবর-কাগজ পড়া শেষ করলেন রাজনারায়ণ। চিঠিগুলো টেনে নিলেন।

সামনের টিপয়ের উপর একটা ট্রেতে রাখা ছিল সেগুলো। আজকের ডাকে পাঁচখানা চিঠি এসেছে। তার মধ্যে তিনখানাই আবেদন-পত্র। অভাবের তাড়নায় পড়া বন্ধ করে দিতে হচ্ছে বলে. তিনটি ছাত্র তাঁর কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করেছে। এ রকম আবেদন-পত্র প্রায়ই পেয়ে থাকেন তিনি। সাহায্যও করেন।

চতুর্থ খানখানা হাতে তুলে নিলেন এবার তিনি। খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠিখানা বার করে চোখের সামনে তুলে ধরতেই তাঁর ভ্রূ-কুঁচকে উঠল।

চিঠিখানায় লেখা ছিল—

মাননীয় চাটুজ্যেমশাই,

বেশ কিছুদিন চিন্তার পর মনঃস্থির করিয়া আপনাকে পত্র দিতেছি। আপনার নিকট আমি বহুভাবে উপকৃত। সে ঋণ পরিশোধ করিবার সাধ্য আমার নাই। অন্যভাবে আপনার কাজে লাগিতে চাই।

উপস্থিত আপনার বংশ মর্যাদায় হানি ঘটিতেছে, এ রকম একটি ঘটনা আমার দৃষ্টি গোচব হওয়ায়, এই পত্রের অবতারণা।

আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র দীর্ঘদিন আমারই বোর্ডিং হাউসে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেছে। ধীর শান্ত ও সংযত চরিত্রের যুবক বলিয়া আমি তাহাকে জানিতাম কিন্তু সম্প্রতি তাহার চরিত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিতেছি।

আমার বোর্ডিং হাউসের নিকটেই জনৈক গন্ধবণিক পরিবার একটি গৃহে বাস করেন। তাঁহাদেরই একটি কন্যার সহিত দেবনারায়ণের বিশেষ ঘনিষ্টতা হইয়াছে শুনিতেছি।

এই ব্যাপারটি আপনার মর্যাদার সহিত জড়িত থাকায়, ঘটনাটি আপনার কর্ণগোচর করা বাঞ্ছনীয় মনে করিলাম।

নমস্কার গ্রহণ করিবেন।
বিনীত
শ্রীবিনোদলাল চক্রবর্তী।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রাজনারায়ণ।

সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে দেবনারায়ণ শেষ পর্যন্ত……। একী বিদেশী শিক্ষার ফল! কিন্তু তাঁর রক্ত কী এক বিন্দুও নেই দেবনারায়ণের দেহে!

বোর্ডিং হাউসটি গড়ে তোলবার সময় বিনোদকে কিছু অর্থ সাহায্য করেছিলেন তিনি। বিনোদ তাঁকে এবিষয়ে সচেতন করে দিয়ে ভালই করেছে। রাজনারায়ণ কোচ থেকে উঠে দরজার গোড়ায় এগিয়ে গেলেন।

দরজার বাইরে মুখ বাড়িয়ে আহবান করলেন একটি ভৃত্যকে।

আহবানের সঙ্গে সঙ্গে তার খাস পরিচারক জাগোয়া এসে দাঁড়াল।

—সরকার মশাইকে এখুনি খবর দাও।

জাগোয়া ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলে, রাজনারায়ণ স্নেহপ্রভার অয়েল-পেন্টিংটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। মৃদু গলায় বললেন, শুনেছ তোমার গুণধর ছেলের কীর্তি! প্রেম করছেন তিনি।

—আমায় ডেকেছেন বড়বাবু?

রাজনারায়ণ মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, সরকার শ্রীনাথ পাল এসেছেন।

জমিদারী চালাতে গেলে যে ধরনের পক্বকেশ বৃদ্ধ সরকারের প্রয়োজন হয়—শ্রীনাথ কিন্তু সে শ্রেণীর নয়। তাঁর বয়স ২৮।২৯-র মধ্যেই।

—হ্যাঁ। দেবুকে একটা তার করে দিন। সে যেন তার পেয়েই চলে আসে এখানে।

—যে আজ্ঞে।

দিন তিনেকের মধ্যেই দেবনারায়ণ কলকাতা থেকে মুঙ্গেরে এলেন।

বাড়িতে পা দেবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই রাজনারায়ণ ডেকে পাঠালেন তাঁকে।

পিতা পুত্রে সাক্ষাৎ হল।

দেবনারায়ণও হঠাৎ এইভাবে তার করে ডেকে পাঠাবার কারণটার সম্বন্ধে সবিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। রাজনারায়ণ মুখে কিছু না বলে বিনোদলাল চক্রবর্তীর চিঠিটা এগিয়ে দিলেন।

চিঠি পড়েই বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে গেলেন দেবনারায়ণ। একটা অদ্ভুত ভয় তাঁকে বিপর্যস্ত করে তুলল। রাজনারায়ণের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান ছিল।

রাজনারায়ণ গম্ভীর গলায় বললেন, এ সম্বন্ধে তোমার কিছু বলবার আছে?

দেবনারায়ণ মনের মধ্যে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করলেও মুখে কিছু বলতে পারলেন না।

—চুপ করে থাকলে পরিস্থিতি সরল হবে না।

—আপনি কি জানতে চাইছেন?

—চিঠিতে যা লেখা আছে তা সত্যি?

দেবনারায়ণ নীরব রইলেন।

—চুপ করে যাওয়াটা নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

দেবনারায়ণ ধরা গলায় বললেন, আমি অন্যায় কিছু করিনি।

—ন্যায় অন্যায়ের বিচারক তুমি নও! চিৎকার করে উঠলেন রাজনারায়ণ। —এই ভাবে বংশের মুখে কালি লেপে দিতে তোমার বুক এতটুকু কাঁপল না!

—আমি বংশ-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিনি।

—থাম। রাস্তার চৌমাথায় দাঁড়িয়ে গুষ্ঠির সকলকে গালিগালাজ করলেই শুধু বংশের অমর্যাদা করা হয়—? একটা বেজাতের মেয়ে—না-না, তা হবে না। তুমি যদি মনে করে থাক, আমি ওই মেয়েকে বৌ করে আনব তাহলে তুমি আজো আমায় চিনতে পারনি।

রাজনারায়ণের সারা শরীর থর থর করে কাঁপছে।

এবার দেবনারায়ণের কণ্ঠে দৃঢ়তা প্রকাশ পেল। তিনি বললেন, আপনি প্রাচীনপন্থী আপনার সঙ্গে আমি এ সম্বন্ধে আর আলোচনা করতে চাই না।

—আমার মুখের ওপর এত বড় কথা বলতে তোমার আটকাল না? হ্যাঁ, আমি প্রাচীনপন্থী—এর জন্যে আমার এতটুকু লজ্জা নেই। তবে তুমি যদি আধুনিকতা দেখাতে গিয়ে ওই মেয়েটিকে বিয়ে কর, তাহলে আমার শেষ কথা শুনে রাখ, তোমার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক আমার এখানেই শেষ হল।

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন দেবনারায়ণ। তারপর দ্রুতপদে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

রাজনারায়ণ ছুটে গেলেন স্নেহপ্রভার অয়েল-পেণ্টিংটার দিকে। বললেন ভেজা গলায়, দেখলে, দেখলে প্রভা তোমার ছেলের কাণ্ডটা।

সেদিন বিকেলের ট্রেনেই দেবনারায়ণ কলকাতায় ফিরে গেলেন।

রাজনারায়ণের সঙ্গে কোন রকমের কথা তাঁর হল না আর।

এই ঘটনার এক মাস পরে আবার একটা চিঠি পেলেন রাজনারায়ণ।

এটিও লিখেছেন বিনোদলাল চক্রবর্তী।

তিনি সসংকোচে জানিয়েছেন, দেবনারায়ণ গন্ধবণিক পরিবারের সেই মেয়েটিকে ব্রাহ্ম মতে বিয়ে করেছেন।

শান্ত ও সংযত ভাবেই সমস্ত ব্যাপারটাকে গ্রহণ করলেন রাজনারায়ণ। এতটুকু রাগ প্রকাশ পেল না তাঁর ব্যবহারে। শুধু তিনি একটা চিঠি লিখে দেবনারায়ণকে জানিয়ে দিলেন, এরপর থেকে ইন্দ্রনারায়ণকেই তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র বলে গণ্য করবেন।

॥ দুই ॥

রামনারায়ণ নিজের কাহিনী শেষ করলেন।

জয়ন্ত চৌধুরী বললেন, দেবনারায়ণবাবু বোধহয় তারপর আর এ বাড়িতে আসেন নি?

—না।

—দেবনারায়ণবাবুর মেয়ে ছিল একথা আপনি আগে জানতেন?

—না। এখন শুনছি। তবে বিয়ে যখন করেছিল তখন মেয়ে থাকা খুবই স্বাভাবিক।

কথাটা শুনে অর্থ-পূর্ণ ভঙ্গিতে হাসলেন জয়ন্ত চৌধুরী।

বিরাট সরিসৃপের মত আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেস জামালপুর স্টেশনে প্রবেশ করল।

ছিমছাম পরিষ্কার স্টেশনটি।

গাড়ি থেকে নেমে এল চম্পা।

প্ল্যাটফর্মে পা দিয়েই ও চারিদিকে নিজের দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। চম্পা অবশ্য আশা করেনি কেউ তাকে নিতে আসবে, তবু—। খুব অল্প সংখ্যক যাত্রীই এখানে নেমেছে। বলতে গেলে ট্রেনটা খালি হয়ে গিয়েছিল ভাগলপুরেই।

চম্পা একটা কুলি ডেকে সুটকেশ আর বেডিংটা তুলতে বলল।

কুলি এখানকার চলতি হিন্দীতে জানতে চাইল, ও কোথায় যাবে।

চম্পা বাংলাতেই উত্তর দিল, মুঙ্গের। যাবার কি ব্যবস্থা আছে?

জামালপুর রেলওয়ে টাউন।

এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন বাঙ্গালী। কাজেই এখানকার অবাঙ্গালীদের বাংলা বুঝতে খুব অসুবিধা হয় না।

কুলি বলল, ট্যাক্সি, বাস, রিক্সা সবই আছে। যাওয়ার কোন অসুবিধা নেই।

—তাহলে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডেই চল।

—আপনি কলকাতা থেকে আসছেন?

চমকে মুখ ফেরাল চম্পা।

একটি সুদর্শন যুবক তাকেই প্রশ্ন করছে!

ও বিস্মিত কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ।

দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করল যুবকটি, আপনি বোধহয় মুঙ্গেরের রাজনারায়ণবাবুর বাড়ি যাবেন?

চম্পা ঘাড় নাড়ল।

—আসুন। আমি আপনাকে নিতে এসেছি।

—আপনি—?

—আমি সুপর্ণ ব্যানার্জি। রাজনারায়ণবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলাম।

আসুন, বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছে।

স্টেশনের বাইরে এল ওরা। সুপর্ণর নির্দেশমত কুলি গাড়ির কেরিয়ারে সুটকেশ আর বেডিংটা রাখল।

ছুটে চলেছে গাড়িখানা!

চম্পা পিছনের সিটে হেলান দিয়ে বসে কত কী ভাবছে। এতক্ষণ কাটল যাহোক ভাবে, এবার কী রকম পরিবেশে গিয়ে পড়বে কে জানে!

সুপর্ণ ড্রাইভারের পাসে বসে আছে। ওর দৃষ্টি বাইরের দিকে নিবদ্ধ। ওর মুখ দেখতে পাচ্ছে না চম্পা।

দুপাশের মনোরম দৃশ্যাবলীর মধ্যে দিয়ে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে গাড়িখানা।

গাড়ি থেকে নামবার পর সুপর্ণই চম্পাকে সঙ্গে করে বাড়ির মধ্যে নিয়ে চলল। প্রথমে করিডোর। তারপর কয়েকটি ঘর পার হয়ে এল ওরা।

কিন্তু ড্রইংরুমে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেল চম্পা। ঘরের চতুর্দিকে বড় বড় অয়েল-পেণ্টিং টাঙ্গান।

ও একটি ছবির দিকে তাকিয়ে রইল। তাকিয়ে থাকারই কথা, কারণ ছবিটা ওরই বাবার। এ-বাড়িতে এ-ছবি এল কী ভাবে!

চম্পা খুব ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়েছে। তবে তাঁর ছবি তো রয়েছে ওর কাছে! সে ছবির সঙ্গে এই অয়েল-পেণ্টিংএর এতটুকু কোথাও প্রভেদ নেই।

চম্পার ভাব দেখে সুপর্ণও দাঁড়িয়ে পড়েছে।

এই সময় ঘরে এলেন ইন্দ্রনারায়ণ। লম্বায় ছ'ফুটের উপর হবেন ভদ্রলোক। গায়ের রং কালো। চওড়া চোয়াল। রুক্ষ মুখের ভাব। মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে।

—কি দেখছ? বাবার অয়েল-পেণ্টিং?

ইন্দ্রনারায়ণের দিকে মুখ ফেরাল চম্পা!

তিনি আবার বললেন, অবাক হয়ে ভাবছ, এ ছবিখানা এখানে এল কী করে! তুমি তোমার নিজের বাড়িতে এসেছ মা।

— নিজের বাড়িতে!

—হুঁ। আমি তোমার কাকা। কিন্তু এখন আর কথা নয়, তুমি ক্লান্ত, তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন। এস—

ইন্দ্রনারায়ণ চম্পাকে নিয়ে চলে গেলে, সুপর্ণ নিজের ঘরের উদ্দেশে রওয়ানা হল। দোতলার দক্ষিণ দিকের একটা ঘর ওর জন্যে নির্দিষ্ট আছে।

ঘরে ঢুকে পাখাটা চালিয়ে দিয়ে ও একটা চেয়ারে বসে পড়ল। সুপর্ণ অবশ্য আর এখানকার বেশিদিনের অতিথি নয়। ও চলে যাবে। রাজনারায়ণ-

বাবুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ওর এখানকার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ও শুধু অপেক্ষায় এ্যাটর্নির নির্দেশের। উইল পড়া অবধি এখানে ওকে অপেক্ষা করতে হবে।

—সুপর্ণবাবু ?

মিত্রানী ঘরে এল।

ইন্দ্রনারায়ণের একমাত্র মেয়ে। এখানকার ডায়মণ্ড জুবিলি কলেজের থার্ড ইয়ারের ছাত্রী।

—বলুন ?

—মেয়েটি কে বলুন তো ? দেখলাম বাবা ঘটা করে তাকে খাওয়াচ্ছেন।

—কোন্ মেয়েটি ?

—কেন, আপনি বুঝতে পারছেন না ? যাকে স্টেশন থেকে নিয়ে এলেন, আমি তার কথা বলছি।

—আপনার জেঠতুতো বোন।

—আমার জেঠতুতো বোন !

—তাই তো শুনলাম।

মিত্রানী টেনে টেনে বলল, কই আগে তো শুনিনি আমার কোন জেঠতুতো বোন আছে। আমি তো জানি, আমিই বংশের একমাত্র মেয়ে।

সুপর্ণ কিছু বলল না। জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল।

মিত্রানী আবার বলল, সুপর্ণবাবু, আমার এই বোনটি হঠাৎ উদয় হলেন কোথা থেকে !

—কলকাতা থেকে এসেছেন।

—কিন্তু ও যে সত্যি আমার জ্যাঠামশাইয়ের মেয়ে তার প্রমাণ কি ?

সুপর্ণ অল্প একটু হাসল।

—প্রমাণ ! এ বিষয় আপনার বাবাই আপনাকে ভালভাবে বুঝিয়ে বলতে পারবেন।

খাওয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে চম্পাকে নিয়ে দোতলায় এলেন ইন্দ্রনারায়ণ।

একটি সুসজ্জিত কক্ষ দেখিয়ে বললেন, এই ঘরে তুমি থাকবে।

চম্পা ঘরের চতুর্দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

বেশ বড় ঘরখানা। মেঝেতে কার্পেট পাতা। মেহগনি কাঠের খাটটা রয়েছে একপাশে। উত্তর দিকে দেওয়াল ঘেঁসে বড় বড় তিনটে জানলা। একটা টেবিল, গোটা দুই চেয়ারও রয়েছে। ওয়ার্ড-রোবটার পাশেই ড্রেসিং টেবিল। অন্যধারে সাইড-বোর্ডের ওপর রেডিও।

এরকম সুসজ্জিত ঘরে জীবনে কোনদিন একঘণ্টা সময়ও সে থাকেনি। অথচ এখন ওরই থাকবার জন্যে নির্দিষ্ট হয়েছে এই ঘর।

ইন্দ্রনারায়ণ বললেন আবার, তুমি যে আমাদের কত আদরের তা আমি বলে বোঝাতে পারব না চম্পা।

—কিন্তু কাকাবাবু—চম্পা বলল, এতদিনের মধ্যে তো আপনারা আমার কোন খোঁজখবরই করেননি ?

—করিনি। তোমার ঠিকানা আমাদের জানা ছিল না মা। বাবা আমাদের নিরস্ত করে রেখেছিলেন এবিষয়ে।

—কেন ? আমার অপরাধ ?

ইন্দ্রনারায়ণ ধীরে ধীরে বললেন অপরাধ কারুর নয়। এ একটা জেদের কথা। বাবার সঙ্গে দাদার কোন একটা বিষয় নিয়ে মতান্তর হয়। দাদা তখন অবিবাহিত ছিলেন।

—তারপর ?

—আত্মমর্যাদাজ্ঞান এবাড়িতে সকলেরই একটু বেশি মাত্রায় সজাগ। দাদা মতান্তরের জের টেনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর ফিরলেন না। বাবা শেষের দিকে বহু চেষ্টা করেছিলেন তাঁকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে কিন্তু দাদা ফিরে আসেননি। কলকাতায় তিনি বিয়ে করেছিলেন, তারপর তোমার জন্ম হল। বাবা সমস্ত খবরই রাখতেন।

ইন্দ্রনারায়ণ থামলেন। চম্পা কোন কথাই বলতে পারল না।

—দাদা অভিমান করে চলে গেছেন চম্পা। কিন্তু তুমি রয়েছ। বাবা নিশ্চয়ই ……কি জানি, কাল উইল পড়ার পরই জানা যাবে কেন তিনি তাঁর মৃত্যুর পর তোমায় এখানে ডাকিয়েছেন।

চম্পা কাকার কথা শুনছিল। ও স্বপ্নেও কোনদিন কল্পনা করেনি, এই রকম বিরাট পরিবারে ওর জন্ম হয়েছে। তাই কী মা মাঝে মাঝে বলতেন, তোর কী এত কষ্ট পাবার কথা ! সবই তোর ভাগ্য।

চম্পার চোখে জল এসে গেল।

ইন্দ্রনারায়ণ আবার বললেন, রাতভোর ট্রেনের ধকল গেছে। তুমি মা এখন বিশ্রাম কর।

কথা কটা বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

চম্পা নানা কথা ভাবতে ভাবতে জানলার দিকে এগিয়ে গেল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল ও, নিচে বাগান দেখা যাচ্ছে।

—ভেতরে আসতে পারি ?

ফিরে দাঁড়াল চম্পা।

—আমার নাম মিত্রানী।

মিত্রানী অনুমতির অপেক্ষা না করেই ঘরের মধ্যে এল।

—আমি চম্পা।

—জানি। সময় বুঝেই এখানে উপস্থিত হয়েছ !

—আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—চেহারা দেখে তো তোমায় অবুঝ বলে মনে হচ্ছে না। কতদূর পড়াশুনা করেছ ? না, ওপথ মোটেই মাড়াওনি ?

বিরক্তি চেপে চম্পা উত্তর দিল, আমার জীবনটা রাজপ্রাসাদের মধ্যে কাটেনি। বেঁচে থাকার জন্যে আমায় কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে। তবু ওরই মধ্যে ম্যাট্রিক পাসটা করে নিয়েছি।

—কথায় তো বেশ ওজন আছে দেখছি। তবে.......

—ক্ষমা করবেন, এখন আমি ক্লান্ত। বিশ্রাম করতে চাই! পরে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা হবে।

তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড চম্পার দিকে তাকিয়ে রইল মিত্রানী, তারপর দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চম্পাও কম অবাক হল না। ও শুনেছিল মিত্রানী ওর খুড়তুতো বোন। ইন্দ্রনারায়ণের মেয়ে। কিন্তু তার একী ব্যবহার!

॥ তিন ॥

নৈশ আহার শেষ করে নিজের ঘরে ফিরে এল চম্পা।

রাত খুব বেশি হয়নি। বোধহয় সাড়ে নটা।

সারাদিনের মধ্যে একে একে বাড়ির সকলের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে ওর। দাদু রামনারায়ণকে ওর বেশ ভাল লেগেছে। হাসিখুশি মানুষটি। দাদু হিসেবে যতটা বুড়ো তাঁর হওয়া উচিত, ততটা বুড়ো তিনি হননি। কাকা ইন্দ্রনারায়ণের চেয়ে বড়জোর বছর পাঁচেকের বড় হবেন। তবে তাঁর শালা জয়ন্ত চৌধুরীকে চম্পার ভাল লাগেনি। তাঁর চোখের দৃষ্টিটাই যে শুধু কেমন তাই নয়, কথাবার্তা বলার ধরনটাও অদ্ভুত!

তবে সেদিক থেকে সুপর্ণ চমৎকার লোক। বচনভঙ্গী থেকে আরম্ভ করে চলার ভঙ্গিটুকু পর্যন্ত প্রকৃত ভদ্রলোকের মত। মিত্রানীর স্বভাব অদ্ভুত লেগেছে চম্পার। কাকা ইন্দ্রনারায়ণ ও কাকিমা চারুলতাদেবীর মেয়ে বলে মনেই হয় না তাকে। আরেকজন আছেন এবাড়িতে। তিনি হলেন রঞ্জন মুখার্জি। রাজনারায়ণের এক বন্ধুপুত্র। বন্ধু মারা যাওয়ার পর, যাকে তিনি তিন বছর থেকে মানুষ করেছেন। সে প্রায় বত্রিশ বছর আগেকার কথা। মনে হল ভদ্রলোক যেন একটু লাজুক প্রকৃতির।

অবশ্য এস্টেটের ম্যানেজার শ্রীনাথবাবু আছেন। আজ বছর পঁচিশেকের ওপর তিনি এখানে কাজ করছেন। ঘিয়ে ভাজা চেহারা। চোখমুখে একটা সচকিত-ভাব। কথাবার্তায় সব সময় বিনয় ঝরে পড়ছে। বড় বড় জমিদারী চালাতে বুঝি বা এই রকম লোকেরই প্রয়োজন হয়।

চম্পা একটা হাই তুলল।

কলকাতায় একটা চিঠি লিখলে ভাল হয়, কিন্তু আজ আর নয়। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। দরজাটা বন্ধ করে, আলো নিভিয়ে এবার শুয়ে পড়লেই হয়। চম্পা দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

এই সময় ম্যানেজার শ্রীনাথবাবুকে আসতে দেখা গেল। তাঁর পিছনে এ্যাটর্নি মহীতোষ মিত্রও রয়েছেন। চম্পা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল।

মিঃ মিত্র এগিয়ে এসে বললেন, এইমাত্র এসে পেঁছিলাম। আমার মক্কেল মৃত রাজনারায়ণবাবুর নির্দেশক্রমে আজ রাত্রেই একটা মুখবন্ধ খাম আপনাকে দেবার কথা আছে আমার।

—খাম ?

—হ্যাঁ, এই নিন।

তিনি একটা পুরু খাম ওর দিকে এগিয়ে দিলেন।

চম্পা খামটা হাতে নিয়ে বলল, এতে কি আছে ?

—আমিও জানি না। চশমাটা চোখ থেকে খুলতে খুলতে মিঃ মিত্র বললেন, তবে উইল পড়ার আগে অর্থাৎ কাল সকালে খামের মধ্যেকার সমস্ত কিছু আপনাকে দেখে নিতে হবে।

এরপর তাঁরা দুজন বিদায় নিলেন।

খামটা হাতে করে ঘরের মাঝখানে এল চম্পা। বড় সাইজের বাদামী রং-এর পুরু খাম। খামের ওপর টানা অক্ষরে ওরই নাম লেখা। কি আছে এতে ?

খুলি খুলি করেও কিন্তু খামটা খুলল না চম্পা। এ্যাটর্নি বলে গেলেন সকালে পড়তে। কাজেই কাল সকালে খুলে দেখলেই হবে। ও দরজাটা বন্ধ করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

খামটা রেখে দিল বালিশের তলায়।

বিছানায় শুয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল চম্পা। যদিও দুপুরে ও ঘুমিয়েছিল, তবু নিজের ক্লান্ত ভাবটা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল জানে না চম্পা—হঠাৎ ঝন ঝন শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ওর। ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসল। ঘরের বড় আলোটা নেভান ছিল, জ্বলছিল একটা বেডরুম ল্যাম্প। তার হাল্কা আলোয় কিছু ঠাহর করতে পারল না ও। এতজোরে কিসের শব্দ হল ! মনে হল যেন কাচ ভাঙ্গার শব্দ।

চম্পা বিছানা থেকে নেমে বড় আলোটা গিয়ে জ্বালালো। আলোর বন্যায় ভেসে গেল ঘরখানা। ও সবিস্ময়ে দেখল, মেঝের ওপর কাচের টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে ছত্রাকারে। এত কাচ এল কোথা থেকে ?

বৃষ্টি হওয়ার দরুন জানলার কাচের শার্শিগুলো বন্ধ করে রেখেছিল চম্পা। শার্শির কাচ ভেঙ্গেছে না কী ! ও জানলাগুলোর দিকে তাকাল। মাঝের জানলাটার পাল্লার কিছু কাচ আধ-ভাঙ্গা অবস্থায় আটকে রয়েছে।

এরকম হল কি করে ? ও ভেবে কূল পেল না।

কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল চম্পার। ও তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এল। টানা বিরাট বারান্দাটা শূন্যতায় খাঁ খাঁ করছে।

থমথমে নিস্তব্ধ রাত্রি।

চম্পা দেওয়ালে টাঙ্গানো ঘড়িটার দিকে তাকাল, পৌনে একটা। ও

এগিয়ে চলল। কোন্ ঘরে কে থাকে ওর জানা নেই। এই সময় কাকা বা কাকিমাকে কাছে পেলে ও হাতে চাঁদ পায়।

একটা ঘরের সামনে এসে থামল চম্পা। দরজার ফাঁক দিয়ে অল্প একটু আলো বারান্দায় এসে পড়েছে। ও আর কালবিলম্ব না করে দরজায় করাঘাত করল। ঘরে যেই থাক, অন্তত তাকে এই ঘটনার কথা বলতে পারবে ও। ভয় ভাবটা এতে কেটে যাবে খানিকটা।

দরজা খুলে গেল। স্লিপিং পাজামা আর হাত কাটা গেঞ্জি পরা অবস্থায় ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুপর্ণ। সামনে চম্পাকে দেখে একটু লজ্জিত হল। নিজের গেঞ্জি পরা অবস্থার জন্যেই অবশ্য।

অসংলগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল সুপর্ণ, কী, কি হয়েছে ?

অজান্তেই এক স্নিগ্ধতা নেমে এসেছিল চম্পার মনে। কাঁচা সোনার রং-এর সুপর্ণের দেহটা গেঞ্জি ফেটে যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে।

চম্পা ওর কণ্ঠস্বরে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, আমার ঘরের বাগানের দিকের জানলার কাচ হঠাৎ ভেঙে যাওয়ায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে হয়—

—বলেন কী, জানলার কাচ ভেঙ্গে গেছে !

—তাইতো দেখছি। কার্পেটের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে টুকরোগুলো।

—কী আশ্চর্য !

—দেখুন—চম্পা বলল, আমার বেশ ভয় ভয় করছে।

সুপর্ণ চিন্তিত কণ্ঠে বলল, স্বাভাবিক। চলুন তো, দেখি—।

ওরা দুজন চম্পার ঘরে এল।

জানলাটা পরীক্ষা করে সুপর্ণ বলল, কেউ কিছু ছুঁড়ে মেরে কাচটা ভেঙ্গেছে। অবাক কাণ্ড !

—কোন গুরুতর ব্যাপারের আশঙ্কা করেছেন নাকি ?

—আশঙ্কা—না, না। গুরুতর আর কী। তবে—

—তবে—চম্পা প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে তাকাল।

—এই ঘটনার কথা কালকে কারুর কাছে প্রকাশ না করলেই ভাল করবেন।

—বেশ।

সুপর্ণ কাচের টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিয়ে জানলা গলিয়ে ফেলে দিয়ে, এগিয়ে গেল সুইচ বোর্ডের দিকে।

—রাত্রে আপনার একলা থাকাটা ঠিক নয়। আমি একটা ঝিকে ডেকে দিচ্ছি। সে আপনার কাছে শোবে।

সুইচ-বোর্ডের একটা বোতামে চাপ দিয়ে আবার সুপর্ণ বলল, প্রয়োজন হলে এই বোতামটা টিপে আপনি মেড-সারভেন্টকে ডাকতে পারেন।

মিনিট ছয়েকের মধ্যেই এ দেশীয়া একটি যুবতী দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। রং তার কালো হলেও মুখ চোখ বেশ ভালই বলা চলে।

সুপর্ণ তাকে দেখেই বলল, রাধা, তুমি আজ রাত্রে এই ঘরে শোবে।

রাধা নীরবে ঘাড় নাড়ল।

—আমি চলি মিস চ্যাটার্জি। ঝি রইল।

সুপর্ণ ঘরের বাইরে এল।

চম্পাও দরজার দিকে এল এগিয়ে।

জয়ন্ত চৌধুরী এই সময় সেখানে উদয় হলেন। দুজনকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, একী সুপর্ণবাবু! আপনি এত রাত্রে এখানে? প্রশ্নটা করার ভঙ্গিতে এমন একটা কিছু ছিল, যাতে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল চম্পা। থতমত খেল সুপর্ণ। কিন্তু পর মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, নিশ্চয়ই কোন প্রয়োজন ছিল মিঃ চৌধুরী। কিন্তু আপনি এই অসময়ে এখানে। কি ব্যাপার বলুন তো?

—ইমিডিয়েট নিচের ঘরটাতে আমি আছি। বার বার ওপরতলাতে ধুপধাপ শব্দ পাওয়াতে দেখতে এসেছিলাম কী ব্যাপার।

সুপর্ণ আর কোন কথা না বলে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। চম্পা ফিরে এল ঘরের মধ্যে।

জয়ন্ত চৌধুরী বিমূঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক সেকেন্ড তারপর তিনি সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

চম্পার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসল রাধা। বলল, দিদিজী, আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি একছুটে নিজের বিছানাটা নিয়ে আসি।

—বেশ তো, যাও।

এ বাড়িতে ঝি চাকররা পরিষ্কার বাংলা বলে। রাধা বিছানা আনতে চলে যাওয়ার পর চম্পা বিছানায় এসে বসল। মনের আনাচে কানাচে নানাকথা উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল।

একী!—বালিশের ওপর একটা নীল রংএর ভাজ করা কাগজ রাখা রয়েছে কেন? ও কাগজটা তুলে নিল। গোটা গোটা অক্ষরে কয়েক লাইন লেখা তাতে। চম্পা রুদ্ধ নিশ্বাসে পড়ে ফেলল লাইন কটা—

যতদূর দেখা যায়
থৈ থৈ জল শুধু।
ঘোলা জল, নোনা জল
ছলছল, বেনো জল।

এই মাথামুণ্ডহীন কবিতা পড়ে ও অবাক হয়ে গেল। করা

এ আবার কী কাণ্ড! কিন্তু কাগজটা ওর বিছানার ওপর এল কী ন—তবে আর এ কাগজটা রেখে যাওয়ার উদ্দেশ্যই বা কী! একটা কাগজ

চম্পা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল তখনই কী কেউ গেছে!

তা কী করে সম্ভব! সুপর্ণর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ও বেশি কথা হয়নি! আছে বলতে হবে।

ব্যানার্জি?

তবে ?

তবে কী সুপর্ণই কবিতা লেখা কাগজটা কোন এক সময় ওর বিছানার ওপর রেখে গেছে ! না না, তা কখনই সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয়, সে কথা নিজেও জানে না চম্পা। তবে ও নিশ্চিত সুপর্ণর দ্বারা একাজ হয়নি।

আরেকবার ও কবিতা পড়ল—দুর্বোধ্য, হেঁয়ালি !

এই সময় পায়ের শব্দ পাওয়া গেল।

রাধা বিছানা নিয়ে ঘরে এল। চম্পার মুখের ভাব দেখে প্রশ্ন করল কি হয়েছে দিদিজী ? ভয় পেয়েছেন ?

—কিছু না।

চম্পা ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ল।

॥ চার ॥

অনেকক্ষণ ঘুম ভেঙেছে চম্পার।

রাধা ওকে এই মাত্র চা এনে দিল, চা খেয়ে ও নেমে এল নিচে। ড্রইংরুমে কাউকে দেখা গেল না। এখনো বোধহয় ঘুম থেকে কেউ ওঠেননি।

চম্পা লঘুপদে বাগানে চলে এল।

বিরাট বাগানটা। একধারে ফুলের, অন্যধারে ফলের বাগান।

কালকে রাত্রের ঘটনাটা ভাবতে ভাবতে চম্পা ফলের বাগানের মধ্যে এসে পড়েছিল। সারি সারি আমগাছ। কত রকমের আম। যার বেশির ভাগ নামই কোনদিন শোনেনি ও।

—সুপ্রভাত।

চমকে মুখ ফেরাল চম্পা। করজোড়ে রঞ্জন মুখার্জি দাঁড়িয়ে।

ওকে মুখ ফেরাতে দেখে, মৃদু হেসে রঞ্জন বললেন, লাজুক হিসেবে আমার একটা সুনাম বা দুর্নাম আছে, তবে আমি ঠিক লাজুক নই। লাজুক সেজে থাকি মাত্র।

একথার চম্পা কী উত্তর দেবে ! তাই চুপ করে রইল।

—মরনিং-ওয়াক করা বুঝি আপনার হ্যাবিট ?

—না। কলকাতায় মরনিং-ওয়াক করার তেমন সুযোগ-সুবিধা আমার না।

দিচ্ছ া-সত্যি। আপনাকে উদরঅন্ত যা পরিশ্রম করতে হত—

সুইচ-চম্পা বলল, আপনি কি করে জানলেন একথা ?

হলে এই বোজা জানব না !

মিনিট ছয়োর কথাটা বুঝতে পারছি না মিঃ মুখার্জি।

দাঁড়াল। রং তারক না চিনলেও, আমি আপনাকে অনেক দিন থেকেই চিনি।

সুপর্ণ তাকে দো অনেক দিন থেকে চেনেন !

হাসলেন রঞ্জন মুখার্জি। বললেন, তা চিনি বৈকি। বেশ, উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। কিছুদিন আগে আপনি লাউডান কোর্টের অলোক রায়চৌধুরীর মেয়েকে পড়াতেন?

বিস্মিত কণ্ঠে চম্পা বলল, পড়াতাম।

—ওখানকার টিউশানিটা আমার জন্যেই আপনার হয়েছিল।

—আপনার জন্যে?

—অলোকবাবু আমার বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম আপনাকে টিউশানিটা দেবার জন্যে।

—কেন? কেন আপনি আমার অজান্তেই এইভাবে আমার উপকার করেছিলেন?

হাল্কা গলায় রঞ্জন মুখার্জি বললেন, 'কেন'র উত্তরটা যথা সময়েই পাবেন। চম্পা রীতিমত চিন্তিত হয়ে উঠল। একি গোলকধাঁধা। লোকটির কথায় যে রকম আত্মপ্রত্যয় ভাব ফুটে উঠেছে, তাতে মনে হয় ও সত্যি কথাই বলছে। কিন্তু—নিজেকে কেমন একটু অসহায় বোধ করতে লাগল চম্পা।

এই সময় দেখা গেল সুপর্ণ ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

এক অপূর্ব আবেশে সারা মনটা ভরে উঠল ওর। ও যেন কূল পেল।

রঞ্জন মুখার্জি একটা সিগারেট ধরালেন। সুপর্ণ কাছে আসতেই ওর দিকে প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, চলবে নাকি?

—আমি সিগারেট খাই না আপনি তা জানেন মিঃ মুখার্জি।

সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিলেন রঞ্জন। উগ্রগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে।

চম্পা মুখে আঁচল চাপা দিল।

—ক্ষমা করবেন—আপনার অসুবিধা ঘটালাম। সিগারেটের মিক্সচারটা একটু স্ট্রং। আচ্ছা, চলি মিস্ চ্যাটার্জি। এক সঙ্গে যখন রইলাম, দেখা তখন হবেই।

বড় বড় পা ফেলে চলে গেলেন তিনি।

চম্পা বলল, ভদ্রলোককে আমার অদ্ভুত লাগল।

—আমি বছর চারেক ধরে ভদ্রলোককে দেখছি, কিন্তু এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। তারপর কাল রাত্রে আর কোন গোলমাল হয়নি তো?

বিরাট একটা আমগাছের গুঁড়িকে কেন্দ্র করে সিমেণ্টের প্ল্যাটফর্ম করা ছিল। চম্পা তার একধারে বসে বলল, গোলমাল অবশ্য কিছু হয়নি—তবে কে আমার বিছানার ওপর মাথা-মুণ্ডহীন কবিতা লেখা একটা কাগজ রেখে গেছে।

—কবিতা লেখা কাগজ!

চম্পা এবার একে একে সমস্ত কিছু বলল।

সুপর্ণ সমস্ত শুনে বলল, পত্রলেখকের বেশ কবিত্ব আছে বলতে হবে।

—আমাকে এ ধরনের কবিতা কে উপহার দিল মিঃ ব্যানার্জি?

সুপর্ণ চিন্তিত কণ্ঠে বলল, আমার মনে হয়, অবশ্য অনুমান মাত্র—

—কি, বলুন ?

—কেউ হয়ত আপনার এখানে উপস্থিতিটা পছন্দ করছে না।

—আমি তো কারুর ক্ষতি করছি না।

—হয়ত এখানে আপনার উপস্থিতিতে অনেকের বাড়াভাতের ওপর ছাই পড়ছে।

—আপনি দাঁড়িয়ে কেন ? বসুন।

সুপর্ণ দূরত্ব বজায় রেখে বসল।

—ভাল কথা, আপনার কোন জিনিস হারায়নি তো ?

—কই, তা তো জানি না।

—আপনি বরং ঘরে গিয়ে দেখে আসুন। আমার মনে হচ্ছে আপনার বোধহয় কিছু হারিয়েছে।

চম্পা দ্রুত নিজের ঘরের উদ্দেশে রওয়ানা হল।

সবই ঠিক আছে।

ঘরে গিয়ে দেখল চম্পা। কিছুই হারায়নি।

কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় হঠাৎ ওর মনে পড়ল—তাইতো, টেবিলের ওপর কাল ও নিজের পরিচয়পত্রটা রেখেছিল—যেখানা মহীতোষ মিত্র কলকাতায় ওকে দিয়েছিলেন।

কই, সেখানা টেবিলের ওপর নেই তো!

কোথায় গেল! পরিচয়পত্র দরকার হয়নি বলেই, চম্পা ওখানা ইন্দ্রনারায়ণের হাতে দেয়নি। টেবিলের ওপর ফেলে রেখেছিল।

কে নিয়ে গেল ওখানা ? যে ওকে অদ্ভুত কবিতাটা প্রেজেন্ট করেছে, সেই কি ? কি লাভ হবে তার এতে ?

ভাবতে ভাবতে চম্পা আবার বাগানে ফিরে এল।

কিন্তু সুপর্ণের কাছে যাওয়া গেল না আর। মিত্রানী হাত পা নেড়ে তাকে তখন কি সব বলছে। মনটা কেমন খিঁচড়ে গেল চম্পার।

কেন, সুপর্ণের সঙ্গে মিত্রানী কথা বলছে বলেই কি। দুদিন আগে সুপর্ণকে ও চিনত না, অথচ—কেন এমন হয়!

নিজের ঘরে ফিরে যাওয়ার পথে সিঁড়ির মুখে মহীতোষ মিত্রর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল চম্পার।

উনি বললেন, কাল রাত্রে আপনাকে যে এনভালপটা দিয়ে এসেছি, নিশ্চয়ই তা আপনি খুলে দেখেছেন ?

ভুলেই গিয়েছিল চম্পা। তাই তো—সে খামখানা এখনো বালিশের তলায় চাপা পড়ে রয়েছে।

ও তাড়াতাড়ি বলল, একদম ভুলে গিয়েছিলাম। এখন গিয়েই দেখে নিচ্ছি।

—আজ সন্ধ্যা ছটার পর উইল পড়া হবে। আপনি ড্রইংরুমে উপস্থিত থাকবেন।

চম্পা ঘাড় নেড়ে ওপরে উঠে গেল। নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বালিশের তলা থেকে খামটা টেনে বার করল। বেশ একটু উত্তেজনাও বোধ করেছে ও।

খামের মুখটা ছিঁড়ে ফেলতেই বেরিয়ে এল দুটো পাতলা পিনআপ করা কাগজ। একখানা চিঠি। ওকেই লেখা চিঠি।

চম্পা পড়তে আরম্ভ করল চিঠিখানা।

প্রিয় চম্পা,

এই চিঠিখানা যখন তুমি পাবে, তখন আমি পৃথিবীতে থাকব না। কাজেই লজ্জা সঙ্কোচের আমি ঊর্ধ্বে। তোমার বাবা দেবনারায়ণের প্রতি আমি অবিচার করেছিলাম কিনা, সে বিচারের প্রশ্ন এখন ওঠে না। তবে আমি একজন সংস্কার-বদ্ধ প্রাচীনপন্থী বাপ হওয়ায় ছেলের উগ্র আধুনিকতাকে সমর্থন করিতে পারিনি। তোমার মাকে বিয়ে করার প্রশ্নে তাই আমি মত দিতে পারিনি। দেবনারায়ণ আমাকে ছেড়ে চলে গেল। মতান্তর যে এভাবে ব্যবধানের সৃষ্টি করবে তা আমি ভাবিনি। আমার মনে হয়েছে আমি কি ভুল করলাম। অভাব অনটনের মধ্যে দেবনারায়ণ নিজের সংসার চালিয়েছে। ওরই মধ্যে তোমার জন্ম হয়েছে। আমি তার ধৈর্যের প্রশংসা না করে থাকতে পারিনি। হঠাৎ খবর পেলাম তোমার বাবা মারা গেছেন। এ ঘটনা যে আমার বুকে কতবড় ক্ষতের সৃষ্টি করল তা নিশ্চয়ই তোমায় বলে বোঝাতে হবে না। তবে আমি তোমায় চোখে চোখে রেখেছিলাম। তোমার মা মারা যাবার পর তোমার অজ্ঞান্তেই আমি তোমার কাজের ব্যবস্থা বার বার করে দিয়েছি। কাছে তোমাকে আনিনি—তোমার সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে কেন জানি না সঙ্কোচ হয়েছে। আমি স্বীকার করছি—দুনিয়ার লোকের সামনে বুক ফুলিয়ে যা বলবার সাহস আমার নেই, চুপি চুপি তাই আমি স্বীকার করছি। ভুল আমি করেছিলাম। দুটো জীবনকে আমি নষ্ট করেছি। হত্যা করেছি আমি তাদের।

সেই পাপের আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি—তুমি আমায় একটা সুযোগ দেবে। আমার উইলের উল্লেখ তুমি হাসি মুখে মেনে নেবে—এই আমার শেষ প্রার্থনা।

আরেকটা কথা। আমার একান্ত ইচ্ছে সুপর্ণকে তুমি

বিয়ে করবে। ছেলেটিকে আমি দীর্ঘ দিন ধরে জানি। সৎ এবং উদার। সে তোমার উপযুক্ত স্বামী হবে, এ সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আশীর্বাদক
শ্রীরাজনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।
১৪।৬।৫৯।
মুঙ্গের।

চিঠিখানা আবার পড়ল চম্পা।

লিখেছেন দাদু। ওরই দাদু।

চিঠির প্রতিটি ছত্রে তাঁর কত অসহায়তা প্রকাশ পেয়েছে। চম্পার চোখ ছলছলিয়ে উঠল—দাদু নিজের ভুলটা, বাবার প্রতি অবিচারের কথাটা মর্মে মর্মে অনুভব করে গেছেন।

চম্পা রাখবে, দাদুর কথা রাখবে। তাঁর পরলোকগত আত্মাকে ও কষ্ট দেবে না। কিন্তু··চিঠির শেষ কটা ছত্র?

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল ও। অবশ্য অস্বীকার করে লাভ নেই। সুপর্ণ যেন ওর চিন্তার খোরাক হয়ে উঠেছে। যৌবনে পা দেবার পর থেকে নানা বিচিত্র পরিবেশের মধ্য দিয়ে ওর জীবন এগিয়ে এসেছে। নানা স্তরের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করবার অবকাশ হয়েছে। কিন্তু সুপর্ণর মত একজনও ওর চোখে পড়েনি আজ অবধি।

মনটা অদ্ভুত হালকা হয়ে এল চম্পার। প্রথমবার—এই প্রথমবার অভূতপূর্ব আনন্দে ওর সারা মন রসাপ্লুত হয়ে উঠল।

চম্পা চিঠিখানা খামের মধ্যে পুরে বালিশের তলায় রেখে দিল।

এখন আর কিছু করবার নেই। তাইতো, আনন্দবাবুকে এখনো চিঠিই লেখা হয়নি। অত্যন্ত অন্যায় কাজ হয়ে গেছে। সুটকেশ থেকে প্যাডটা বার করে আনন্দবাবুকে চিঠি লিখতে বসল।

সমস্তই পরিষ্কার করে লিখল চম্পা। এ বাড়ির সঙ্গে নিজের সম্পর্কটা থেকে, এ বাড়ির লোকেরা ওর সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করছে—সমস্ত কিছু। চিঠিটা একটু বড় হয়ে গেল। তা হোক।

প্যাডের মধ্যেই কয়েকটা খাম রাখা ছিল। তার থেকে একটা নিয়ে ঠিকানা লিখে, চিঠিটা খামের মধ্যে ভরে মুখ বন্ধ করে দিল। তারপর উঠে গিয়ে চম্পা সুইচবোর্ডের একটা বোতাম টিপল।

মিনিট খানেকের মধ্যেই রাধা ঘরে এল।

—আমায় ডাকছেন দিদিজী?

—তুমি চিঠি ডাকে দিতে পার?

রাধা ঘাড় নাড়ল।

—এ চিঠিটা তাহলে ডাকবাক্সে ফেলে এস।

রাধা চিঠিটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

চম্পা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আমবাগানটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে বাঁধান প্ল্যাটফর্মের উপর বসে আছে মিত্রানী। কি সব বলছে। সুপর্ণ সামনে দাঁড়িয়ে।

চম্পার মন ছায়াচ্ছন্ন হয়ে উঠল।

সুপর্ণ এ বাড়িতে অনেকদিন আছে। মিত্রানীর সঙ্গে তার পরিচয়ও নিশ্চয়ই দীর্ঘদিনের। হয়ত না, ওকথা ভাববে না চম্পা।

ও সরে এল জানলার কাছ থেকে।

॥ পাঁচ ॥

কাটায় কাঁটায় ছটা।

সন্ধ্যা ছটা।

ড্রইংরুমে একত্রিত হয়েছেন সকলে।

রামনারায়ণ, ইন্দ্রনারায়ণ, রঞ্জন মুখার্জি, মিত্রানী, জয়ন্ত চৌধুরী, শ্রীনাথ পাল, সুপর্ণ ও চম্পা। সকলে ছড়িয়ে বসেছেন। শুধু শ্রীনাথবাবু দাঁড়িয়ে। কর্তাদের সামনে বসতে তাঁর বাধো বাধো ঠেকছে।

ইন্দ্রনারায়ণ তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, শ্রীনাথবাবু দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।

আজ্ঞে

—সঙ্কোচের কোন কারণ নেই। বসুন।

শ্রীনাথ পাল বসলেন।

মহীতোষ মিত্র ঘরে প্রবেশ করিলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। সকলকে এক নজর দেখে নিয়ে বললেন, আপনারা সকলে উপস্থিত রয়েছেন। এইবার আমি আমার মৃত মক্কেল শ্রীরাজনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের উইল পড়ব।

ঘরে পরিপূর্ণ নীরবতা বিরাজ করছে।

মিঃ মিত্র নিজের ফোলিও ব্যাগটার মধ্যে থেকে একটা শীল করা খাম বার করলেন। তারপর খামের মুখ কেটে উইলটা বার করতে তাঁর বিলম্ব হল না। সকলের দিকে তাকিয়ে নিয়ে তিনি পড়তে আরম্ভ করলেন—

আমি শ্রীরাজনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ৺শ্রীরামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র। সম্পূর্ণ সজ্ঞানে এবং স্বইচ্ছায় নিজের সোপার্জিত সম্পত্তি উইল করিতেছি। মুঙ্গের জেলায় আমার বিস্তৃত জমিদারী, মুঙ্গের শহরে আমার ছয়খানি বাড়ি, ব্যাঙ্কের নগদ দশ লক্ষ টাকা ও পঞ্চাশ হাজার টাকার গহনা এই উইলের আওতায় পড়িবে।

আমার সমুদয় সম্পত্তির অর্ধেকের মধ্যে, আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এক লক্ষ টাকা, বেকাপুরের বাড়িখানা ও বিন্দাদেরার দেড়শো

বিঘা জমি পাইবে। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কেল্লার বাড়িখানা, ১৫ হাজার টাকার গহনা ও মির্জাচৌকির একশো বিঘা জমি পাইবে। আমার পৌত্রী, ইন্দ্রনারায়ণের কন্যা শ্রীমতী মিত্রানী চট্টোপাধ্যায়কে দশ হাজার টাকার গহনা দেওয়া হইল। আমার বন্ধুপুত্র শ্রীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে টিকাপুরের পঞ্চাশ বিঘা জমি ও বড়বাজারের বাড়িখানা দেওয়া হইল। আমার ব্যক্তিগত সেক্রেটারি শ্রীসুপর্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ও তোপখানা বাজারের বাড়িখানা পাইবে। ম্যানেজার শ্রীশ্রীনাথ পাল বিশ হাজার টাকা পাইবেন। তিন লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা বিহারের দুস্থ ছাত্র সমিতিকে দেওয়া হইল।

বাকি অর্ধেক সম্পত্তি, পাঁচ লক্ষ টাকা, তিনশো বিঘে জমি, পঁচিশ হাজার টাকার গহনা ও কলেজ রোডের বাড়িখানা আমার মৃত জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীদেবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী চম্পা চট্টোপাধ্যায়কে দেওয়া হইল।

যদি কোন কারণে এই সম্পত্তি চম্পা চট্টোপাধ্যায় লইতে অস্বীকার করে, বা সম্পত্তির অধিকারিণী হইবার পর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে অথবা কোন আইন ভঙ্গ করে—তাহা হইলে তাহার সমস্ত সম্পত্তি কলিকাতার রায়নারায়ণ ট্রাস্টের হস্তে যাইবে। এই নিয়মটি অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

আইন ঘটিত সমস্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি মেসার্স মিত্র এ্যাণ্ড রে এ্যাটর্নি অফিসের দ্বারাই হইবে। ইহাই আমার নির্দেশ।

ভবদীয়
শ্রীরাজনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
রাজনারায়ণ লজ
৬।১।৫৯ মুঙ্গের

উইল পড়া শেষ করলেন মহীতোষ মিত্র। কারুর মুখে কথা নেই। কিন্তু অনেকের মুখেই অসন্তোষের ভাব ফুটে উঠেছে।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে চম্পা। দাদু যে ওকে এইভাবে বিরাট ধনী করে যাবেন, এ ওর স্বপ্নের অতীত ছিল। বার বার এখন মাকে মনে পড়ছে চম্পার। গোটা কতক টাকার জন্যে কত কঠিন পরিশ্রম তিনি করতেন। ওর চোখ ঝাপসা হয়ে গেল।

ইন্দ্রনারায়ণই প্রথমে কথা বললেন, আমাদের বসত বাড়ি, এই রাজনারায়ণ লজ সম্বন্ধে তো উইলে কিছু উল্লেখ নেই?

—এই উইলে অবশ্য উল্লেখ নেই। মিঃ মিত্র বললেন, তবে মারা যাবার মাসখানেক আগে আমাকে এই বাড়ি সম্বন্ধে এক নির্দেশ পত্র পাঠিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমি সেখানা রেজেস্ট্রি করতে পাঠিয়েছি। এখনো সেখানা

়াতে না পাওয়ায় সঙ্গে আনা সম্ভব হয়নি।

—কি নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন?

—এখন যারা এ বাড়িতে আছেন ভবিষ্যতেও থাকতে পারবেন। বাড়িখানা বিক্রি করা চলবে না এবং সংস্কারের ব্যবস্থা সকলকে মিলে করতে হবে।

রামনারায়ণ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সকলেই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। একে একে সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

চম্পাও নিজের ঘরে ফিরে গেল।

রের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দ্রুত পায়চারি করছেন রামনারায়ণ। াঁর মুখ অসম্ভব গম্ভীর দেখাচ্ছে।

জয়ন্ত চৌধুরী নির্বাক ভাবে একপাশে দাঁড়িয়ে।

—তুমি ভাবতে পার জয়ন্ত—এক সময় বললেন রামনারায়ণ, আমার কী শাচনীয় অবস্থা হল! দাদার ওপর ভরসা করেই আমি ছিলাম।

—কী আর করবেন! এখন যে বাড়িখানা পেয়েছেন, সেখানা বিক্রি করে কছু·

—কিছু লাভ হবে না। এ তোমাদের কলকাতা নয়। বাড়িখানার দাম ়খানে খুব জোর হাজার কুড়িক। এই অল্প টাকায় আমার কি হবে ভাই?

—জমিটা রয়েছে, তা থেকেও কিছু পেতে পারেন। তাছাড়া পনেরো াজার টাকার গয়না, ওটাও আপনাকে হেল্‌প করবে।

—সবই যদি আমি দিয়ে দেব তাহলে বাকি জীবনটা আমার কাটবে কী াবে!

জয়ন্ত চৌধুরী বললেন, আপনার দাদা আপনাকে চমৎকারভাবে ঠকিয়ে গছেন দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু—

রামনারায়ণ কাতর কণ্ঠে বললেন, উইলের দোহাই দিয়ে আমি তাকে ়তদিন আটকে রেখেছিলাম কিন্তু আর তো পারব না। তুমি যা হয় একটা পথ আমায় দেখাও।

—পথ! পথ একটা বেরুবেই। কিন্তু আমি ভাবছি ওই মেয়েটির কথা। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে যার এতটা কাল কাটল, সে··· ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন য়ন্ত চৌধুরী।

রামনারায়ণ সোনার সিগারেটকেশ থেকে একটা সিগারেট বার করে বললেন, ় আইডিয়া। জয়ন্ত, তুমি বিয়ে করবে?

—বিয়ে! আপনার নাতনিকে?

—মন্দ কি! তুমিও ধনবতী বৌ পাবে আর আমিও ভরাডুবির হাত থেকে বেঁচে যাব। কি বল?

এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন জয়ন্ত চৌধুরী। তারপর বললেন, আমার াপত্তি নেই। চেষ্টা করে দেখুন।

সিগারেটটায় অগ্নি সংযোগ করলেন রামনারায়ণ।

ড্রইংরুম থেকে বেশ কিছুক্ষণ আগে নিজের ঘরে ফিরে এসেছে চম্পা। একটা অজানা শিহরণ ওকে ক্ষণে ক্ষণে উতলা করে তুলছে। জীবনের উনিশটা বছর অসম্ভব অনটনের মধ্যে ওর দিন কেটেছে, অথচ চম্পার আজ এত টাকা! দাদু ওকে টাকার বাঁধনে বেঁধে গেছেন।

কিন্তু সুপর্ণ—দাদু ওকে কী কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছেন। চম্পা কী ভাবে —কী ভাবে ও মেয়েমানুষ হয়ে সুপর্ণর কাছে মুখ ফুটে ওকথা বলবে। দাদু কী পারতেন না এ বিষয়ে কাকাকে লিখে যেতে।

সুপর্ণ এখন কী করছে কে জানে!

চম্পা দ্বিধাজড়িত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এল।

সুপর্ণর ঘরে আলো জ্বলছে। পর্দার ফাঁক দিয়ে আলোর কিছুটা বারান্দায় এসে পড়েছে। চম্পা এগিয়ে গেল। এখন কেমন সুপর্ণর প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করে ও।

একটা সুটকেশ ডালা খোলা অবস্থায় টেবিলের উপর রাখা রয়েছে। সুপর্ণ জামা-কাপড় গুছিয়ে রাখছে তার মধ্যে।

দরজার গোড়ায় মৃদু শব্দ হতেই ও মুখ ফিরিয়ে দেখল চম্পা পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ব্যস্ত হয়ে উঠল সুপর্ণ, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? আসুন—আসুন—

চম্পা ঘরের মধ্যে এল।

—সুটকেশ গুছোচ্ছেন? কোথাও যাবেন নাকি?

—হ্যাঁ।

—কবে ফিরবেন।

—আর ফিরব না। আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

চম্পা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, চলে যাচ্ছেন! কেন? এ বাড়ির উপর আপনারও অধিকার রয়েছে।

—তা আছে। তবে এখানে বসে থেকে কি হবে বলুন? যে টাকাগুলো পাব, কলকাতায় গিয়ে তা দিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করলে বরং—

—জীবনে টাকাটাই সব নয় বোধহয়?

—কিন্তু বেঁচে থাকতে গেলে টাকার প্রয়োজন তো আছে।

—আপনার যাওয়া হবে না।

—কিন্তু—

—কোন কিন্তু নয়।—অনভ্যস্ত অস্থিরতা প্রকাশ পেল চম্পার কণ্ঠে—আপনি যাবেন না।

বিস্মিত কণ্ঠে সুপর্ণ উত্তর দিল, এখানে থেকে আর আমার লাভ কি?

—লাভ! আমাকে এই ভাবে ফেলে চলে যাবেন? এ বাড়ির লোকেরা

আমাকে হয়ত বিষ নজরে দেখতে আরম্ভ করেছে। আপনি চলে গেলে কতটা অসহায় বোধ করব তা কি ভেবে দেখেছেন?

একী হল আজ চম্পার! নিজের রাশ এখন ও কী নিজেই টেনে রাখতে পারছে না! কয়েক সেকেণ্ড অবাক হয়ে চম্পার দিকে তাকিয়ে রইল সুপর্ণ। ও যেন কিছু অনুমান করে নেয়।

—আমাকেই বা বিশ্বাস করছেন কেন? আমিও তো—

—ছোটবেলা থেকে অনেক ঘাটের জল খেয়ে আমায় বড় হতে হয়েছে। মানুষ দেখলে আমি চিনতে পারি। বলুন আপনি যাবেন না?

সুপর্ণ এবার মনস্থির করে ফেলে।

—তার আগে একটা কথার পরিষ্কার উত্তর দেবেন?

—বলুন!

—আপনি রাজনারায়ণবাবুর কোন চিঠি পেয়েছেন?

—পেয়েছি। আপনি জানলেন কি ভাবে?

—আমিও পেয়েছি একখানা।

এবার অবাক হবার পালা চম্পার।

—আপনি—আপনিও পেয়েছেন! কি লেখা আছে তাতে?

—তাতে লেখা আছে—পরিষ্কার গলায় সুপর্ণ বলল, রাজনারায়ণবাবু আমাকে স্নেহ করতেন। তিনি আমায় অনেক কিছু লেখার পর শেষে লিখেছেন—

—কি লিখেছেন তিনি?

—এমন একটা কথা লিখেছেন, যা নাকি তিনি আপনাকেও লিখে জানিয়েছেন। কিন্তু সে কথা বলার সাহস আমার নেই। তাই আমি চলে যাচ্ছিলাম।

চম্পা মাথা নত করল। মৃদুকণ্ঠে বলল, পুরুষ মানুষ হয়ে আপনার এত সাহসের অভাব?

সুপর্ণ এগিয়ে গেল ওর কাছে। নরম গলায় ডাকল, চম্পা—

—আপনাদের বোধহয় ডিস্টার্ব করলাম।

চমকে দুজনে দরজার দিকে ফিরে দাঁড়াল। মিত্রানী দাঁড়িয়ে সেখানে।

আবার বলল মিত্রানী, বাবা পাঠালেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কাল থেকে কী হবে জানবার জন্যে।

—খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা! সুপর্ণর গলায় বিস্ময়ের সুর।

—হ্যাঁ। কাল থেকে সেপারেট ব্যবস্থা করে নিতে হবে। আপনি আমাদের দিকে খাওয়া-দাওয়া করবেন কিনা বাবা জানতে চেয়েছেন।

এবার পরিষ্কার হল কথাটা সুপর্ণর কাছে। রাজনারায়ণবাবুর আমলে সমস্ত সংসারের খরচ তিনিই বহন করতেন। তিনি মারা যাওয়ার পর, এই প্রায় মাস দুয়েক ধরে সুপর্ণই ওর কাছে থাকা তাঁর টাকা দিয়ে সংসার

চালিয়েছে। আজ উইল পড়ার পর অবশ্য এ প্রশ্ন আর ওঠে না। কাজেই—

—আমি··· আমার···

চম্পার দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠল। এখন ওর কিসের ভয়! মিত্রানীর সেদিনের কথাগুলো আজও ওর কানে বাজছে।

ওই উদ্ধত মেয়েটির উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই যেন চম্পা বলে উঠল, সুপর্ণবাবু আমার বিষয় সম্পত্তি ম্যানেজমেণ্টের ভার নিয়েছেন। ওঁর সব ব্যবস্থা আমার তরফেই হবে।

মিত্রানী সুপর্ণর দিকে বড় বড় চোখ করে তাকাল, তারপর শ্লেষের সঙ্গে বলল, আপনি কর্মী পুরুষ। আপনার নতুন চাকরি হওয়ায় আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

কথা-কটা বলে ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুপর্ণ বলল, কী হল এটা!

নিজেকে ভীষণ হাল্কা মনে হচ্ছে চম্পার। ও মৃদু হাসল।

॥ ছয় ॥

সুপর্ণর ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে ঢোকার মুখেই চম্পা দেখল রামনারায়ণ একটা চেয়ারে বসে রয়েছেন।

ওকে দেখেই বললেন, তোমার জন্যে কিছুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি ভাই।

চম্পা মৃদু গলায় বলল, কিছু বলবেন?

অল্প একটু হাসলেন রামনারায়ণ। —তোমাকে কিছু বলার কী শেষ আছে। তুমি হলে গিয়ে আমার রসের লোক। তবে এখন কোন ঠাট্টার কথা নয়—একটা সিরিয়াস কথা বলতে এসেছি।

—বলুন?

—এত দিন তুমি আমাদের চোখের আড়ালে ছিলে, কাজেই তোমার সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। এখন তোমার ভালমন্দ সম্বন্ধে আমাদের একটা দায়িত্ব রয়েছে।

—আপনারা ছাড়া আমার আর কে আছে?

গলাটা ঝেড়ে নিয়ে রামনারায়ণ বললেন, খাঁটি কথা। তোমার অর্থের দিকের সুচারু ব্যবস্থা দাদা করে গেছেন। কিন্তু অর্থই সব নয়। ওই সঙ্গে চাই তোমার অভিভাবক।

—অভিভাবক!

—হ্যাঁ। মানুষের মৃত্যুর কথা বলা যায় না। আমি বা ইন্দ্র কিন্তু চিরকালই তোমার মাথার ওপর থাকব না, তখন—

চম্পা বিস্মিত কণ্ঠে বলল, আপনি কি বলতে চাইছেন দাদু?

—আমি তোমার বিয়ের কথা বলছি ভাই।

—বিয়ে! কিন্তু—

—আমার কাছে লজ্জা কি ভাই? পাত্র নির্বাচন করার দায়িত্ব না হয় আমিই নিলাম।

—কিন্তু আমি বলছিলাম—চম্পা নম্র গলায় বলল, আমার বিয়ের ব্যবস্থা তিনিই করে গেছেন।

—কে? দাদা!

—হ্যাঁ।

—কি রকম?

চম্পা রাজনারায়ণের চিঠিখানা এনে দিল।

গম্ভীর মুখে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চিঠিখানা পড়লেন রামনারায়ণ। তারপর চম্পাকে কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সিঁড়ির মুখেই তাঁর সঙ্গে ইন্দ্রনারায়ণের দেখা হল।

ইন্দ্র প্রশ্ন করলেন, কি হল, ছোটকাকা?

তিক্তস্বরে রামনারায়ণ বললেন, মেয়েটার কাছে পদে পদে অপমানিত হবার সমস্ত ব্যবস্থাই দাদা পাকা করে গেছেন।

—অর্থাৎ—

—তোমাকে তো কাল বললামই—তাছাড়া এটা আমাদের কর্তব্যও চম্পার একটা বিয়ের ব্যবস্থা করা। এখন গিয়ে শুনলাম দাদা নিজেই সুপর্ণর সঙ্গে ওর বিয়ে ঠিক করে গেছেন।

—সুপর্ণর সঙ্গে? আকাশ থেকে পড়লেন ইন্দ্রনারায়ণ।

—তবে আর বলছি কি!

রামনারায়ণ নিচে নেমে গেলেন।

হপ্তা খানেক কেটে গেছে।

বাড়ির সকলেই জানতে পেরেছেন চম্পা ও সুপর্ণর বিয়ের কথাটা। রাজনারায়ণ নিজেই যে এই বিয়ে ঠিক করে গেছেন একথাও কারুর অজানা নেই।

চম্পা নিজেই এখন নিজের গার্জেন। সঙ্কোচ ও পরিহার করেছে। প্রয়োজন হলে সকলের সামনেই সুপর্ণর সঙ্গে কথা বলে।

সন্ধ্যা তখন হয় হয়।

চম্পা ও সুপর্ণর সঙ্গে কথা হচ্ছে চম্পার ঘরে।

সুপর্ণ বলল, এখানে তোমার অসুবিধাটা কিসের আমি বুঝতে পারছি না?

—অসুবিধা কিছুর নয়। কলেজ রোডের বাড়িতে গিয়েই যদি থাকি, তাতেই বা কী এল-গেল বল না।

—কিন্তু তুমি ওখানে থাকবে কি করে? একলা থাকবে নাকি? এখন নিশ্চয়ই শুধু তুমি আর আমি এক বাড়িতে থাকতে পারি না?

চম্পা হেসে ফেলল। —তা তো পারিই না। তুমি বাপু ভীষণ অধৈর্য

লোক। যাব বলে কী, এখুনি যাব নাকি!

রাধা এল ঘরে।

বলল, দিদিজী, কলকাতা থেকে আপনার সঙ্গে কে দেখা করতে এসেছে।

কলকাতা থেকে!

চম্পা রাধার সঙ্গে নিচে নেমে এল।

ড্রইং-রুমে একটা কৌচে জড়সড় হয়ে বসে আছেন মামা। বেশ কয়েক বছর পরে দেখা হলেও তাঁকে চিনতে কষ্ট হল না চম্পার। তাঁকে দেখেই ওর মন বিরক্তিতে ভরে উঠল। টাকার গন্ধে এসেছেন নিশ্চয়ই। স্বাভাবিক।

—এই যে মা, খবর পেয়েই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

ভ্রু-কুঁচকে চম্পা বলল, কেন এলেন? আমি তো আপনার অপেক্ষায় ছিলাম না।

মামা কালীচরণ আকাশ থেকে পড়লেন।—সে কী কথা মা জননী! তুমি হলে আমার একমাত্র সহোদরা বোনের একমাত্র·· ·····

—থামুন। কোথায় ছিল আপনার দরদ সেদিন, যেদিন আমি অসহায় ভাবে আপনার সাহায্যপ্রার্থী ছিলাম?

আমতা আমতা করে কালীচরণ বললেন, অভাব অনটনের মধ্যে আমার দিন চলে। আবার একটা নতুন দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে এল মনে করে, সেদিন আমি তোমায় কটু কথা বলেছিলাম মা। তবে—

এরপর তিনি বিস্তারিত ভাবে চম্পাকে শোনালেন, বিশ বছরের নানা অভাব অভিযোগের ইতিহাস।

চম্পা অধৈর্য কণ্ঠে বলল, আমায় এত কথা শুনিয়ে লাভ কী! এখন আপনি কী বলতে এসেছেন তাই বলুন।

—বলতে খুবই সঙ্কোচ হচ্ছে মা। কী বলে গিয়ে—

—বলতে যখন এসেছেন তখন আর সঙ্কোচ করে লাভ কী!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ এই বলি। বড় মেয়েটার বিয়ে যাহোক করে দিয়েছি। এখন ভাবনা তার পরেরটিকে নিয়ে। তাকে যে পার করতে পারব সে ভরসা আমার নেই। এখন ···

চম্পা নির্বিকার গলায় বলল, তার বিয়ের ব্যবস্থা করুন। যদি কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় আমি করব।

—সে তো জানিই। সেই ভরসায় তো তোমার কাছে আসা। সাহায্যই যদি করতে চাও তাহলে আমার কৃষ্ণাকে নিজের কাছেই রাখ না।

—কৃষ্ণা, মানে····

—আমি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। বাইরে বারান্দায় সে অপেক্ষা করছে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় চম্পা।

—পাকাপোক্ত ব্যবস্থা সব করেই এসেছেন দেখছি। বেশ, সে আমার কাছেই থাকবে। তবে আপনার থাকা চলবে না। ভবিষ্যতে আপনি আমার

কাছে আসবেন না—একথা যদি দিতে পারেন -

বিনয়ে ভেঙ্গে পড়লেন কালীচরণ। বললেন, তাই হবে মা। তুমি কৃষ্ণাকে নিজের কাছে রাখবে। তাকে পরিবৃপ্ত করবে—এছাড়া আমার আর কোন অনুরোধ নেই।

রাধাকে নির্দেশ দিল চম্পা কৃষ্ণাকে ডেকে আনবার জন্যে।

কৃষ্ণা ঘরে এল। নাম কৃষ্ণা হলেও গায়ের রঙে গৌরী। চোখমুখের একটা শ্রী আছে। বয়স বছর সতেরো হবে।

চম্পার খারাপ লাগল না কৃষ্ণাকে।

ও উঠে গিয়ে তার হাত ধরে একটা কোচে তাকে বসাল।

কয়েকদিন পার হয়েছে আরো।

কৃষ্ণা চমৎকার ভাবে মানিয়ে নিয়েছে চম্পার সঙ্গে।

শুধু সুপর্ণকে দেখলে সে কেমন যেন হয়ে যায়। লজ্জায় মুখ তুলতে পারে না।

আজ একটা গার্ডেন পার্টির আয়োজন করেছেন ইন্দ্রনারায়ণ।

একঘেয়ে জীবনযাত্রার ওপর কিছু বৈচিত্র্য আনাই হল এই পার্টির উদ্দেশ্য। খাওয়া-দাওয়ার খরচ অবশ্য সমস্তই ইন্দ্রনারায়ণের। তবে পার্টির ব্যবস্থা হয়েছে চম্পার কলেজ রোডের বাড়িতে। কারণ এই বাড়িখানা শহরের কোলাহল থেকে বাইরে এবং বাগান ও পুকুর আছে।

ব্রেকফাস্ট সেরেই সকলে কলেজ রোডের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। যতোম মিত্রও আছেন সঙ্গেই। আইনঘটিত সমস্ত গোলমাল মিটে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁর নড়বার উপায় নেই।

বাড়িটা এতদিন তালা বন্ধই ছিল। কাল ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়েছে মাত্র। খাওয়া-দাওয়ার এলাহি ব্যবস্থা হচ্ছে। দুজন ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে চারুলতাদেবী স্বয়ং সমস্ত আয়োজনে ব্যস্ত রয়েছেন।

চম্পা একবার তাঁকে বলেছিল, কাকিমা, আমি বরং আপনার সঙ্গে রান্নাঘরেই থাকি। কাজের সাহায্য হবে।

হেসে চারুলতা বলেছিলেন, না মা। তোমাকে আর রান্নাঘরে বন্দী থাকতে হবে না। তাছাড়া উনুনের তাত দেখছ তো ?

—আপনার তাতে কষ্ট হচ্ছে না - আমারই বুঝি অত কষ্ট হবে ?

পাগল মেয়ে। আমি হলুম বুড়ো-হাবড়া মানুষ। আগুনের তাত সওয়া। তুমি কেন মিথ্যে কষ্ট করবে মা। যাও গল্পসল্প করগে যাও।

অগত্যা পুকুরের ধারে গিয়ে বসল চম্পা। কৃষ্ণাকে ডেকে নিল।

সুপর্ণ আগে থেকেই ছিল ওখানে। কৃষ্ণা দূরত্ব বজায় রেখে বসেছে। ওর আর তার পরনে একই ধরনের শাড়ি। কাল বাজারে গিয়েছিল চম্পা। বহু কেনা-কাটা করেছে। এই শাড়ি দুটোও কিনেছে কাল।

একথা-সেকথার পর চম্পা ও সুপর্ণের আলোচনার মোড় নিল, হঠাৎ ইন্দ্রনারায়ণ এই পার্টির আয়োজন করলেন কেন?

একসময় কৃষ্ণা উঠে গেছে ওরা খেয়াল করেনি।

হঠাৎ সুপর্ণ রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি একটু বস। আমি মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আসছি।

—কোথায় যাবে?

—একজনকে গোটাকতক কথা বলে আসছি।

—আমি আর বসব না। আমি বরং কাকার সঙ্গে গিয়ে গল্প করি। ওরা দুজনেই ঘাসের ওপর থেকে উঠে পড়ল।

॥ সাত ॥

প্রথমে ব্যাপারটা ধরা পড়েনি।

ধরা পড়ল খাবার সময়।

অনেকেই লক্ষ্য করলেন, সকলেই খাওয়ার টেবিলে উপস্থিত—শুধু কৃষ্ণা সেখানে নেই।

এ নিয়ে মাথা ঘামাবার অবশ্য কিছু ছিল না। হয়ত হঠাৎ শরীর খারাপ হয়ে পড়ায় সে খেতে আসেনি।

তবু চিন্তিত হল চম্পা। শরীর খারাপ হয়েছে অথচ কৃষ্ণা ওকে কিছু জানাল না। এরকম অবিশ্বাস্য ব্যাপার তো ঘটতে পারে না।

খাওয়া-দাওয়ার পর কিন্তু ঘটনাটা সত্যিই জটিল হয়ে উঠল।

সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কৃষ্ণাকে পাওয়া গেল না।

কোথায় গেল কৃষ্ণা?

সে এখানকার কিছুতেই পরিচিত নয়। বাইরের কারুর সঙ্গে তার ব্যক্তিগত পরিচয় নেই। কাজেই বাড়ির বাইরে যে সে কোথাও যেতে পারে, এরকম সম্ভাবনাকে প্রশ্রয় দেবার মত কোন জোরাল যুক্তিও নেই।

তবু বাড়ির চতুর্দিকে অনুসন্ধান করা হল।

ফলাফলে কোন তারতম্য ঘটল না। সারাদিনের মধ্যে কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না কৃষ্ণার। সকলে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

রামনারায়ণ বললেন, আমার মনে হয় আর কাল বিলম্ব না করে পুলিশে খবর দেওয়াই ভাল।

—ছোটকাকার সঙ্গে আমি একমত। ইন্দ্রনারায়ণ সমর্থন জানালেন।

পুলিশে খবর দেওয়া হল।

পুলিশের পক্ষ থেকে আবার নতুন করে খোঁজাখুঁজির পালা আরম্ভ হল কোন হদিসই পাওয়া গেল না তার সেদিন। তবে শেষ পর্যন্ত তার সন্ধান পাওয়া গেল পরের দিন বেলা দশটার পর।

কলেজ রোড সোজা কলেজ পেরিয়ে, পাঁচ নম্বর গুমটি পার হয়ে অর্থাৎ রেল লাইন টপকে নির্জন, প্রায় জঙ্গলের কাছাকাছি একটা ঝোপের মধ্যে কৃষ্ণাকে পাওয়া গেল।

মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে দেহটা।

প্রাণ নেই।

মারা গেছে অনেক আগেই। সারা শরীরে হিম কাঠিনতা।

জনৈক গ্রাম্য লোক ওই পথ দিয়ে আসছিল শহরে। তারই চোখে পড়ে মৃতদেহটা প্রথমে। সেই বুদ্ধিমানের মত পুলিশে খবর দেয়।

মৃতদেহ বয়ে আনা হল থানায়। রামনারায়ণদের সকলেই সনাক্ত করলেন কৃষ্ণাকে।

চম্পা ভয়ে ভাবনায় একেবারে মিইয়ে পড়েছে। ওর অনুরোধেই ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, আপনারা অনুমতি করলে আমরা মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে সৎকারের ব্যবস্থা করতে পারি।

—তাতো সম্ভব নয়।—ডেপুটি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট কুলদীপ মেহরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আমি দুঃখিত। আমরা অনুমান করছি এটা একটা মার্ডার। ডেড-বডি পোস্টমর্টেমে পাঠাতে হবে।

—মার্ডার!! কথাটা এক সঙ্গে অনেকেই উচ্চারণ করলেন।

—বডি যে ভাবে পড়েছিল এবং চতুর্দিকের যা সিচুয়েশান তাতে আমাদের ওই কথাই মনে হচ্ছে। মিঃ মেহরাই কথাটা বললেন।

জয়ন্ত চৌধুরী প্রশ্ন করলেন, শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে, ওতেই কী—

—বলতে পারছি না। পোস্টমর্টেমের পরই সমস্ত বুঝতে পারা যাবে। এখন আপনারা আসুন। আমি সময় মত খবর দেব।

সকলের মনেই এক প্রশ্ন, কৃষ্ণা খুন হয়েছে।

কে এই কাজ করল? কিসের স্বার্থে?

চম্পা ভাবতে ভাবতে প্রায় পাগল হয়ে উঠল। কী উত্তর ও দেবে কালীচরণকে। চম্পাকে সান্ত্বনা দেবার মত ভাষা সুপর্ণ খুঁজে পায় না।

বিরাট রাজনারায়ণ লজ উৎকণ্ঠায় থমথম করছে।

পরের দিন সন্ধ্যার পর কুলদীপ মেহরা এলেন।

ড্রইং-রুমে ডাকালেন সকলকে।

তারপর বললেন, আমাদের অনুমানই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কৃষ্ণাদেবী অবশ্য ঠিক কী ভাবে মারা গেছেন, এখনো বুঝতে পারা যায়নি। তবে তিনি যে খুন হয়েছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর দেহে বিষ বা ওই ধরনের কিছু না পাওয়া গেলেও, তাঁকে যে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে ডাক্তাররা প্রায় একমত।

কারুর মুখে কথা নেই। সকলেই নির্বাক।

মেহরা আবার বললেন, আমরা এবার এই হত্যার তদন্ত আরম্ভ করব আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা চাই।

রামনারায়ণ বললেন, আমার মনে হয় সকলেই এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন। আমি শুধু ভাবছি মেয়েটা এভাবে মারা পড়ল কেন?

—তারই অনুসন্ধান করতে হবে মিঃ চ্যাটার্জি। ভাল কথা, এটা কি আপনাদের মধ্যে কারুর—দেখুন তো?

মিঃ মেহরা একটা কাফলিঙ্ক তুলে ধরলেন।

সোনার কাফলিঙ্ক। একদিকে ব্লু-মিনের ওপর সোনালি অক্ষরে 'এস' লেখা রয়েছে।

—এটা পাওয়া গেছে মৃতদেহের কাছেই। আমরা এটাকে বড় রকম সূত্র বলে মনে করছি।

চম্পার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠল। কারণ—

ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, আমাদের চুপ করে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। ওটি সম্বন্ধে যদি কারুর কিছু জানা থাকে, তাহলে পরিষ্কার করে বলে ফেলাই ভাল।

রঞ্জন মুখার্জি এবার বললেন, আমি সত্যের খাতিরে বলতে বাধ্য হচ্ছি, ওই কাফলিঙ্কখানা আমি সুপর্ণবাবুকে ব্যবহার করতে দেখেছি। তাছাড়া 'এস' অক্ষরটিও তাঁরই নামের প্রথম অক্ষর।

—সুপর্ণবাবু! তিনি কে?

ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, দাদার প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিল।

কুলদীপ্ মেহরা বললেন, কার নাম সুপর্ণবাবু? আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

কিন্তু সুপর্ণকে পাওয়া গেল না ঘরে।

এমনকি সারা বাড়ি খুঁজেও পাওয়া গেল না।

মিঃ মেহরা থানায় ফেরার আগে বলে গেলেন, সুপর্ণবাবু ফিরে এলে তাঁকে যেন থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু দুদিনের মধ্যেও সুপর্ণকে রাজনারায়ণ লজে ফিরতে দেখা গেল না।

চম্পা ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠল।

তৃতীয় দিন পুলিস এসে সুপর্ণর ঘর সার্চ করল।

সন্দেহজনক কিছু পাওয়া না গেলেও জামাকাপড়, টুথব্রাস ইত্যাদি রোজকার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি ঘরে দেখা গেল না।

সমস্ত দেখে শুনে ইন্সপেক্টার লালচাঁদ বললেন, পাখী উড়ে গেছে।

জয়ন্ত চৌধুরী প্রশ্ন করলেন, অর্থাৎ?

—আমরা সন্দেহ করেছি বুঝতে পেরেই ভদ্রলোক সরে পড়েছেন। এখন তাঁকে হাতে পাওয়া বেশ কষ্টকর হবে।

না, না একথা বিশ্বাস হয় না চম্পার। সুপর্ণ একাজ করতে পারে না।

কেন ও কৃষ্ণাকে··· ওর স্বার্থ কি ?

তবে—

সুপর্ণ গেল কোথায় ? কেন গেল ?

সারাটা দিন ছটফট করে কাটল চম্পার।

মিত্রানী দূরে থেকে ওকে বার কতক দেখে গেছে। তার চোখে আর ঈর্ষাকাতর ভাব নেই বরং পরিবর্তে কিছুটা অনুকম্পাই ঝরে পড়ছে।

কী করবে চম্পা। কৃষ্ণা মারা যাওয়াতেই ও আধমরা হয়ে পড়েছিল, আবার সুপর্ণ—যার ওপর ও সম্পূর্ণ নির্ভর করে আছে—

পুলিশের হাত থেকে বাঁচাতে হবে সুপর্ণকে কিন্তু ওই ঝোপের মধ্যে মৃতদেহের কাছে ওর কাফলিঙ্কটা গেল কী ভাবে।

কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

চম্পা ঘর থেকে বেরিয়ে রাজনারায়ণবাবুর অফিস ঘরে এল। টেবিলের ওপর রাখা টেলিফোনের কাছে গেল ও। এই ঘরে টেলিফোন আছে আগেই শুনেছিল সুপর্ণর মুখে।

চম্পা রিসিভারটা তুলে নিয়ে এক্সচেঞ্জকে অনুরোধ করল, টাউন থানার সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে দিতে। কিন্তু কানেক্সান পাবার আগেই রিসিভারটা নামিয়ে রাখল ও।

ফোনে আর কতটুকু কথা হবে। কুলদীপ মেহরার সঙ্গে সরাসরি দেখা করবে চম্পা।

ও কাউকে কিছু না জানিয়ে, রাজনারায়ণ লজ থেকে বেরিয়ে এসে, একটা রিক্সায় চেপে বসল। টাউন থানায় যাবার নির্দেশ দিল চালককে। থানায় এসে একজন কনস্টেবলের কাছে জানতে চাইল মিঃ মেহরা আছেন কিনা। সৌভাগ্যক্রমে তিনি অফিসেই ছিলেন। সংবাদ পেয়ে স্বয়ং এসে ওকে নিয়ে গেলেন নিজের অফিস ঘরে। এই ধনবতী মহিলাটির পরিচয় কুলদীপ মেহরার অজানা ছিল না। তিনি মহীতোষ মিত্রের মুখ থেকে সবিস্তারে শুনেছিলেন সমস্ত কথা।

—বসুন। বসুন মিস চ্যাটার্জি।

চেয়ারে বসতে বসতে চম্পা বলল, সুপর্ণবাবুর কোন সন্ধান পাওয়া গেছে ?

—না, তবে খোঁজাখুঁজি হচ্ছে।

—তাঁর কাফলিঙ্কটা ওখানে পাওয়া গেছে বলেই যে তিনি হত্যাকারী, এ ধারনা আপনারা করছেন কেন ?

মৃদু গলায় মেহরা বললেন, করতাম না, যদি না তিনি পালিয়ে যেতেন।

—কিন্তু আমি আপনাদের ধারনার উপর বিশ্বাস রাখতে পারছি না।

—আমি আপনার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছি। আর এও বুঝতে পারছি আপনি আমাদের ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না। এক্ষেত্রে—

—এক্ষেত্রে কি বলুন ? চম্পা বলল।

—আপনি প্রয়োজন বোধ করলে প্রাইভেট এনকোয়ারি করাতে পারেন।

—প্রাইভেট এনকোয়ারি ?

কুলদীপ মেহরা গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, সুপর্ণবাবুর জন্যে আপনার উদ্বেগ কতখানি, তা আমার অজানা নেই। তাই বলছি পুলিশের লোক হয়েও বলছি, আমাদের হাতে কেসটা একটু ঢিলেতালেই এগুবে। তার চেয়ে—

—কিন্তু আমি তো—

—সে জন্যে চিন্তা করবেন না। আমি একজন বেসরকারি গোয়েন্দার সন্ধান দিচ্ছি। উপযুক্ত লোক। নিশ্চয়ই নাম শুনে থাকবেন বাসব ব্যানার্জি ?

এ নাম শুনেছে চম্পা। খবর-কাগজের দৌলতে তাঁর তীক্ষ্ন প্রতিভার কথা ওর অজানা নয়। কুলদীপ মেহরার কাছ থেকে বাসবের ঠিকানাটা ও নিয়ে নিল। ঠিকানার সঙ্গে ফোন নম্বরও দিলেন তিনি।

বাড়ি ফিরেই ট্রাঙ্ক-কল বুক করল চম্পা।

ধোঁয়ার কুণ্ডলী রিং-এর আকারে উপরের দিকে উঠে চলেছে।

সন্ধ্যা নেমেছে অনেক আগেই।

বাসব একাগ্র মনে সিগারেটের ধোঁয়ায় রিং রচনায় ব্যাপৃত রয়েছে। শৈবাল বসে আছে ঠিক ওরই সামনে আরেকটা কোচে। কারুর মুখে কথা নেই। শৈবাল একটা পত্রিকা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

এই সময় দেওয়াল ঘড়িটায় সশব্দে সাতটা বাজল।

বাসব সিগারেটের টুকরোটা অ্যাসট্রেতে ফেলতে ফেলতে বলল, কি এত মন দিয়ে পড়ছ ডাক্তার ?

শৈবাল পত্রিকাটা একপাশে সরিয়ে রেখে বলল, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর চমৎকার একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে—দেখছিলাম পড়ে।

পড়ে কি দেখলে ?—লেখক কি বলতে চেয়েছেন উপস্থিত বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই গোলমেলে ?

—তা গোলমেলে বইকী। পৃথিবীর চারিদিকে এখন কী হয় কী হয় ভাব।

বাসব কোচ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, শেষ পর্যন্ত যে কী হবে তা আমি জানি।

সাগ্রহে শৈবাল প্রশ্ন করল কি হবে ?

বাসব হোয়াটনটের দিকে এগিয়ে গেল। হোয়াটনটের ওপরে সিগারেটের কৌটটা রাখা ছিল। তার থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে অগ্নিসংযোগ করল ও। তারপর দীর্ঘ একটা সুখটান দিয়ে বলল, কিছুই হবে না। পৃথিবীর দুধারের দুই শক্তিমান দেশ বড় বড় বুলি কপচে বাজার গরম করে রাখবে। এই ভাব চলবে, তুমি দেখে নিও।

শৈবাল আর কিছু বলল না।

আবার নীরবতা নেমে এল ঘরের মধ্যে।

কথা যেন ওদের হারিয়ে গেছে।

একটানা দিনের পর দিন কত গল্প করা যেতে পারে। বেশ কিছু দিন বেকার বসে আছে বাসব। হাতে কোন কাজ নেই, কাজেই শৈবালের সঙ্গে কথার জালবোনা ছাড়া আর উপায় কী।

এক সময় আবার বাসবই নীরবতা ভঙ্গ করল, ডাক্তার

মৃদু হেসে শৈবাল বলল, অনুমান করে নিতে কষ্ট হচ্ছে না, তোমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়তে আর খুব দেরি নেই।

—স্বাভাবিক। কতদিন ধরে সম্পূর্ণ বেকার বসে আছি বল তো। কিন্তু আমি ভাবছি—

—কি ভাবছ?

—ভাবছি, দেশের অসাধু লোকেরা কি সব সাধু হয়ে গেল? অবশ্য এ তবেই সুলক্ষণ। কিন্তু এই সুলক্ষণের ধাক্কায় আমাদের মত অধম জনেদের যে আর পেট চলে না।

শৈবাল কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলা আর হল না। টেলিফোন বেজে উঠল এই সময়। ট্রাঙ্ক-সিগন্যাল—!

বাসব রিসিভারটা তুলে নিল—হ্যালো—

অপারেটারের গলা পাওয়া গেল, ট্রাঙ্ককল প্লিজ—মুঙ্গের হিয়ার—

॥ আট ॥

কালের ট্রেনেই মুঙ্গের এসেছে বাসব।

সঙ্গে শৈবাল আছে। ওরা অবশ্য রাজনারায়ণ লজে নামেনি। নেমেছে শৈবালের শ্বশুরালয়ে।

এই বেসরকারি তদন্তের অনুমতি পুলিশের কাছে নিয়ে রেখেছে চম্পা। কাজেই ওদিক থেকে কোন অসুবিধা নেই।

বাসব রাজনারায়ণ লজের প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচিত হল। ওর আগমনে তাঁদের মনোভাবটা ঠিক বুঝতে পারা গেল না।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে বাসব শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে থানায় গেল। কুলদীপ মেহরা অফিসেই ছিলেন। ওদের দেখে তিনি প্রায় আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন।

মৃদু হেসে বাসব বলল, প্রায় দু'বছর পরে দেখা, কি বলেন মিঃ মেহরা?

—ভাগ্যিস আপনার ঠিকানাটা আমার কাছে ছিল, তাই আপনাকে আবার টেনে আনতে পারলাম।

—আমি তো ভেবেছিলাম, আপনার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

—তিন বছর করে এক এক জায়গায় আমাদের পোস্টিং। এখনো আছি

মুঙ্গেরে এক বছর।

এরপর কাজের কথা আরম্ভ হল।

কথা প্রসঙ্গে মিঃ মেহরা বললেন, এই মার্ডারের মধ্যে একটা জিনিস অত্যন্ত পরিষ্কার। হত্যাকারী অন্য কোথাও হত্যা করে বডিটা বয়ে এনে ওই ঝোপের মধ্যে ফেলে এসেছিল।

—আপনি এই সিদ্ধান্ত করছেন কেন? বাসব প্রশ্ন করল।

—কারণ, যেখানে লোক চলাচল রয়েছে, এ রকম একটা জায়গায় খুন করা বেশ রিস্কি। শুধু আমি বুঝতে পারছি না, বডিটা ওখানে বয়ে নিয়ে যাবার অর্থ কি?

—পোস্টমর্টমের রিপোর্ট রেডি নাকি? আমি একবার দেখতে চাই

রিপোর্টখানা আনালেন মিঃ মেহরা।

বাসব মনোযোগ দিয়ে পড়ল। প্রথমে বাঁদিকের কাঁধের ওপর শক্ত কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। কারণ কাঁধের হাড় এক জায়গায় ভেঙ্গে গেছে তারপর শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু গলায় আঙ্গুল বা অন্য কোন চাপের দাগ নেই। সার্জন আরো জানিয়েছেন, মৃত্যু হয়েছে সকাল সাড়ে নটা থেকে এগারোটার মধ্যে।

বাসব অন্যমনস্ক ভাবে রিপোর্টখানা নামিয়ে রাখলেন।

—কি দেখলেন?

—এখন মতামত প্রকাশ করাটা ঠিক হবে না। আচ্ছা, আমরা এখন উঠলাম মিঃ মেহরা। আবার দেখা হবে।

টাউন থানার বাইরে এসে ওরা একটা রিক্সা করে সোজা চলে এল রাজনারায়ণ লজে। সকলেই তখন যে যার ঘরে।

খবর পেয়েই চম্পা নিচে নেমে এল।

বাসব বলল, আপনাকে এ সময় বিরক্ত করলাম, কিছু মনে করবেন না।

—মনে আর কী করব। এই বিপদে আপনি আমায় সাহায্য করবেন বলেই তো আপনাকে ডেকে আনলাম মিঃ ব্যানার্জি।

বাসব এসেই মোটামুটি ঘটনাটা শুনেছিল।

ও পরিষ্কার গলায় বলল, বিপদটা কোন্ দিক থেকে? আপনার মামাতো বোন নিহত হয়েছেন বলে, না সুপর্ণবাবুকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে?

চম্পা নত মুখে বলল, দুটো ব্যাপারই আমাকে সমান ভাবিয়ে তুলেছে।

—এবার গোটাকতক প্রশ্ন আপনাকে আমি করব। তার সঠিক উত্তর দেবেন, এই আমার অনুরোধ।

—বলুন?

—দুর্ঘটনার দিন শেষ আপনি কৃষ্ণাদেবীকে কখন দেখেন?

—নটা আন্দাজ সময়। আমি সুপর্ণবাবু আর কৃষ্ণা কলেজ রোডের বাড়ির পুকুরের পাড়ে বসেছিলাম। কৃষ্ণা এক সময় উঠে গেল। তারপর

আর তাকে জীবিত অবস্থায় দেখিনি।

—কৃষ্ণাদেবী উঠে যাবার কতক্ষণ পরে আপনারা ওখান থেকে উঠেছিলেন ?

—কিছুক্ষণের মধ্যেই। সুপর্ণবাবুর কী একটা কাজ ছিল। উনি উঠলেন—আমিও উঠে পড়লাম।

—আচ্ছা মিস্ চ্যাটার্জি, কতক্ষণ পরে আবার আপনার সুপর্ণবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?

—যতদূর মনে পড়ছে ঘণ্টা দেড়েক পরে।

—সুপর্ণবাবুর পরনে কি জামাকাপড় ছিল মনে আছে ?

বিস্মিত কণ্ঠে চম্পা বলল, সাদা ট্রাউজার আর ব্লু-ফ্লাইং সার্ট।

—আপনি এ বাড়িতে প্রথম দিন পা দেওয়ার পর থেকে সুপর্ণবাবু অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত, যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, অনুগ্রহ করে আমায় বলুন ?

চম্পা একে একে সমস্ত কিছু বলে গেল। কোন কথা বাদ দিল না। এখন লজ্জা করার সময় নয়।

বাসব সমস্ত শুনে বলল, আপনি কবিতা লেখা যে কাগজটা পেয়েছেন, সেটা আমায় এনে দিন।

চম্পা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাসব প্রশ্ন করল, ডাক্তার, কি বুঝলে ?

শৈবাল বলল, বিশেষ কিছু বুঝিনি। তবে হঠাৎ এতগুলো টাকা পেলে মানুষ যে রকম প্রাউডি হয়ে ওঠে ; ভদ্রমহিলার তেমন কোন কমপ্লেক্স আসেনি বলেই মনে হচ্ছে।

—আরেকটা জিনিস কথাবার্তায় ; হাবেভাবে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে ভদ্রমহিলা সুপর্ণবাবুকে দারুণ ভাবে ভালবেসে ফেলেছেন।

চম্পা চিঠিখানা হাতে করে ফিরে এল। বাসব ওর হাত থেকে সেখানা নিয়ে বলল, ধন্যবাদ মিস্ চ্যাটার্জি। এখন আমরা চলি আবার আসব।

রাজনারায়ণ লজ থেকে বেরিয়ে বাসব ও শৈবাল একটা রিক্সা ডাকল। রিক্সাওয়ালার সঙ্গে কথা কয়ে জানা গেল, সে জানে সম্প্রতি কোথায় একজন বাঙ্গালী মহিলা খুন হয়েছেন।

না জানার কথা নয়। মুঙ্গের ছোট শহর। এই খুনের ব্যাপার নিয়ে চারিধারে প্রচুর হৈ চৈ পড়ে গেছে।

বাসব রিক্সায় উঠে বসেছে—শৈবাল উঠতে যাচ্ছে এমন সময় তার নজরে পড়ল, রাজনারায়ণ লজের দোতলার একটা জানলার ওপর। কে যেন তাদের নিরীক্ষণ করছিল, এবার জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল।

শৈবাল তাড়াতাড়ি রিক্সায় উঠে বসে বলল, ওহে—

—দোতলার একটা জানলা দিয়ে আমাদের কেউ লক্ষ্য করছিল এই তো। তা আমি জানি ডাক্তার।

—কিন্তু আমরা কি খুব দর্শনীয় ?

—দর্শনীয় না হলেও ভীতিকর হতে পারি। আমি এও জানি, যখন আমরা ড্রইং-রুমে বসে চম্পাদেবীর সঙ্গে কথা বলছিলাম তখনও ওই অদৃশ্য-দর্শকটি আমাদের দর্শন করে ধন্য হয়েছিলেন।

—বল কি ?

বাসব মৃদু হাসল শুধু।

রিক্সা তখন দ্রুত বেগে এগিয়ে চলেছে।

মিনিট কুড়িক লাগল প্রায় নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাতে।

লোকালয় থেকে দূরে নির্জন এক পরিবেশ। এঁকে-বেঁকে পিচঢালা পথটা চলে গেছে চোখের আড়ালে। পথের দু'পাশে ঝোপের সমারোহ। দূরে কুচকুচে কালো রং-এর পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে।

রিক্সা যেখানে থেমেছিল, তার হাত দশেক দূরেই একজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে। ওরা এগিয়ে গেল সেদিকে।

কনস্টেবলটি বাসবের নাম শুনেই সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল। বুঝতে পারা গেল কুলদীপ আগে থেকেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন।

বাসব তাকে প্রশ্ন করল, এই ঝোপের মধ্যেই কি মৃতদেহ পড়েছিল ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ ?

ঝোপটি বেশ বড় এবং ঘন। খুব ছোট ছোট কতগুলো শালগাছের উপর নাম না-জানা লতা ছেয়ে ঝোপের সৃষ্টি করেছে। ভেতরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রায়। তবে ঝোপের ভেতরের আয়তনটা ছোট নয়। জনচারেক লোক বেশ আরামে বসতে পারে।

বাসব শরীরটাকে ঝুঁকিয়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

স্যাঁতস্যাঁতে মাটির ওপরে শুকনো ও আধশুকনো পাতা ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র। ও পকেট থেকে পেন্সিল টর্চটা বার করে বোতাম টিপল। আলোকিত হয়ে উঠল জায়গাটা।

বাসব তীক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে চতুর্দিক দেখতে লাগল। কিন্তু পাতার সমারোহ ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। ও ঝোপ থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, ডাক্তার, তোমার ছাতাটা দাও তো ? শৈবালের হাতে ছাতা ছিল। সে তাড়াতাড়ি সেখানা বাড়িয়ে দিল।

বাসব ছাতাটা দিয়ে ঝোপের মধ্যকার পাতাগুলো সরাতে লাগল। হঠাৎ ওর দৃষ্টি পড়ল—পাতা সরে গিয়ে এক জায়গায় বেশ কিছুটা জমি বেরিয়ে পড়েছিল, সেখানে হলদে হলদে কী কতকগুলো পড়ে রয়েছে।

বাসব সযত্নে সেগুলি কুড়িয়ে নিল।

পদার্থগুলি আর কিছুই নয়, পাতলা ছিলাছিলে মোমের টুকরো।

এখানে এগুলো এল কী ভাবে !

বাসব ভ্রূকুঁচকে চিন্তা করল।

টুকরোগুলো সংখ্যায় সাতটার বেশি নয়। একটু বাঁকা ধরনের। কোনটা

এক আবার কোনটা আধ স্কোয়ার ইঞ্চির সেগুলো।

টুকরোগুলো হাতে নিয়ে ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল বাসব।

শৈবাল তখন একটা পাথরের চাঙ্গড়ের উপর ঝুঁকে কী দেখছে।

—ওখানে কি এত দেখছ?

শৈবাল মুখ না তুলেই বলল, দেখে যাও এসে। মনে হচ্ছে, পদার্থটা আমাদের কোন কাজে কাজে লাগতে পারে।

বাসব এগিয়ে গিয়ে দেখল, একটা চওড়া পাথরের ওপর একটুখানি খৈনি বা দোক্তা পাতার মিহি অংশ পড়ে আছে।

তাই তো। এ জিনিসটা এখানে পড়ে কেন? বাসব পকেট হাতড়ে একটা কাগজের টুকরো বার করে সন্তর্পণে মিহি পদার্থটা তুলে নিয়ে, মুড়ে পকেটে রেখে দিল।

—চল ডাক্তার, ফেরা যাক। এখানকার কাজ শেষ হয়েছে।

সন্ধ্যার পর।

বাসব শৈবালকে নিয়ে আবার রাজনারায়ণ লজে এল।

ড্রইংরুমে প্রবেশ করেই চাকরকে দিয়ে খবর পাঠাল বাসব ইন্দ্রনারায়ণের কাছে।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই এলেন তিনি।

বাসব মৃদু গলায় বলল, আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম মিঃ চ্যাটার্জি।

শান্ত কণ্ঠে ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, না না। বিরক্ত আর কী?

—গোটাকতক প্রশ্ন ছিল আপনাকে জিজ্ঞেস করবার।

—বলুন?

—এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আপনার ধারনা কি?

—আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। আমাদের বাড়িতে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে, তা আমার কল্পনার অতীত ছিল।

—সুপর্ণবাবুই কৃষ্ণাদেবীকে হত্যা করেছেন বলে আপনি মনে করেন?

ইন্দ্রনারায়ণের হাতে সিগারেট-কেস ছিল। তার থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরালেন তিনি।

তারপর বললেন, পুলিশের তাই ধারনা।

—আমি আপনার ধারনার কথা জিজ্ঞেস করছি।

—আমার! দেখুন, সে যদি সত্যি দোষ না করবে তাহলে এই ভাবে গা ঢাকা দিয়েই বা বেড়াবে কেন?

বাসব নিজের কেস থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরাল।

—আপনি সুপর্ণবাবুকে তো অনেকদিন থেকে চেনেন, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলুন—?

সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, বাবার মুখ থেকে শুনেছি, ওর বাবা-মা অল্প বয়সে মারা যাওয়ায় ও কাকার সংসারে খুবই

কষ্টে মানুষ হয়েছে; তবে কোনরকমে ও বি-এ পাস করেছিল। চাকরির সন্ধানে যখন ঘোরা-ফেরা করছিল তখন বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় কী ভাবে। তিনিই ওকে এখানে নিয়ে আসেন।

হুঁ। আচ্ছা মিঃ চ্যাটার্জি, আপনি হঠাৎ গার্ডেন পার্টির আয়োজন করেছিলেন কেন?

—এমনি। একঘেয়েমি ভাবটার ওপর বৈচিত্র আনবার জন্যে।

—সেদিন কোনরকম সন্দেহজনক কিছু আপনার চোখে পড়েছিল?

—সন্দেহজনক?

—এই ধরুন, কারুর কথাবার্তা বা চলা-ফেরার কোনরকম ব্যতিক্রম আপনি দেখেছিলেন কি?

একটু ভেবে ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, একটা জিনিস আমার চোখে পড়েছিল। কলেজ রোডের বাড়ির দোতলার বারান্দায় আমি দাঁড়িয়েছিলাম, হঠাৎ দেখলাম বাগানের বাঁশ ঝাড়ের কাছে সুপর্ণর সঙ্গে রঞ্জনের কথা হচ্ছে।

—এতে সন্দেহের কি থাকতে পারে?

—পারে। ওদের মধ্যে সম্পর্কটা আদায়-কাঁচকলায় বলেই আমরা জানি। কাজেই সে সময় যে রকম ঘনিষ্ঠ ভাবে ওদের মধ্যে কথা হচ্ছিল, তাতে—

—ও। তখন কটা হবে?

—তখন বেলা সাড়ে নটা কি পৌনে দশটা হবে।

—আচ্ছা, আপনাদের কোন মোটরকার আছে?

এই ধরনের প্রশ্নে একটু আশ্চর্য হলেন ইন্দ্রনারায়ণ। তারপর বললেন, আছে।

—গাড়িখানা কার ভাগে পড়েছে মিঃ চ্যাটার্জি?

—কারুর ভাগে নয়। এই বাড়ির আর প্রত্যেকটা অস্থাবর জিনিসের মত গাড়িখানাও এজমালি অবস্থাতেই আছে।

—অর্থাৎ বাড়ির যে কেউ সেখানা ব্যবহার করতে পারে?

—হ্যাঁ।

বাসব সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে ফেলে দিয়ে বলল, এবার গোটা কতক ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব, কিছু নিশ্চয়ই মনে করবেন না?

ইন্দ্রনারায়ণ কোন কথা বললেন না।

—আপনি কি করেন ইন্দ্রবাবু?

এখানকার বিখ্যাত সিগারেট ফ্যাক্টরির লিগাল অ্যাড্‌ভাইসার ছিলাম কিছুদিন হল কাজ থেকে অবসর নিয়েছি।

বাসব আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, চম্পাদেবীর এই রকম উড়ে এসে জুড়ে বসার সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত?

—আপনার প্রশ্নটা আমি ঠিক ফলো করতে পারিনি?

—আমি বলছিলাম, আপনার বাবা মৃত্যুর পর এই ভাবে চম্পাদেবীকে

ডাকিয়ে বিপুল সম্পত্তি দিয়ে গেলেন। সে সম্বন্ধে—

বাসবের কথা শেষ হবার আগেই ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, দাদার প্রতি যথেষ্ট অবিচার বাবা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত যে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে চম্পাকে এই ভাবে প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন, আমি তাতে আনন্দিতই হয়েছি।

—ধন্যবাদ মিঃ চ্যাটার্জি। আপনাকে আর প্রশ্ন করব না। অনুগ্রহ করে মহীতোষবাবুকে গিয়ে পাঠিয়ে দিন। উইল সংক্রান্ত গোটাকতক প্রশ্ন তাঁকে করবার আছে।

ইন্দ্রনারায়ণ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মহীতোষ মিত্র ঘরে এলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই।

লম্বাটে ধরনের নিরেট চেহারা তাঁর। গায়ের রং কালো। বয়স পঞ্চাশের মধ্যেই। চোখে প্যাঁসনে, এ্যাটর্নিদের প্রিয় চশমা। অবশ্য আজকাল এ চশমার তেমন চলন নেই। তাই তাঁর চোখে কেমন বেমানান মনে হচ্ছে।

—নমস্কার। আমায় ডেকেছেন?

মহীতোষ মিত্র বসলেন একটা কোচে।

—নমস্কার। কিছু কথা আছে আপনার সঙ্গে। রাজনারায়ণবাবুর উইল সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

—কি জানতে চান বলুন?

বাসব বলল, চম্পাদেবীর মুখে আমি উইলের সারমর্ম শুনেছি। কিন্তু উইলের সাক্ষী কে কে সে সম্বন্ধে কিছু জানতে পারিনি।

—মৃত রাজনারায়ণবাবুর কয়েকজন বন্ধু ও আমি।

—বন্ধুরা সব কি এখানকারই লোক?

—না। কলকাতার।

—বন্ধুদের ঠিকানা দিতে নিশ্চয়ই আপনার কোন আপত্তি নেই?

—নিশ্চয়ই না। আমি লিখে পাঠিয়ে দেব আপনার কাছে। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো, কৃষ্ণাদেবীর খুনের সঙ্গে উইলের কি সম্পর্ক?

বাসব হাসল।—একটা খুনের কিনারা করা অত্যন্ত শক্ত ব্যাপার মিঃ মিত্র। কার সঙ্গে যে কার সম্পর্ক, তা কী আগে থেকে বলা যায়।

—তা অবশ্য ঠিক।

—উইলে আছে, কেউ মারা গেলে তার সম্পত্তি রায়নারায়ণ ট্রাস্টে জমা হবে। কিসের ট্রাস্ট এটি?

—রাজনারায়ণ নিজের বাবার নামে এই দাতব্য ট্রাস্ট গঠন করে গেছেন।

—ওই ট্রাস্ট থেকে কি রকম জায়গায় চ্যারিটি করা যেতে পারে?

—যেমন ধরুন, কোন আতুর আশ্রমে অথবা কোন স্কুল বা কলেজে—।

—ও। উপস্থিত কত মূলধন আছে এই ট্রাস্টের?

—হাজার তিরিশেকের মত হবে।

—মাত্র! বাসব বিস্মিত কণ্ঠে বলল, রাজনারায়ণবাবুর প্রচুর টাকা ছিল।

তিনি ইচ্ছে করলে সহজেই লাখ পাঁচেক টাকা দিয়ে ট্রাস্টটা গঠন করে যেতে পারতেন।

—তাতো পারতেনই। আসলে রাজনারায়ণবাবুর ধারনা ছিল, তিনি তাঁর বিপুল সম্পত্তি যাঁদের ভাগ করে দিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরাই রায়নারায়ণ ট্রাস্টকে বড় করে তুলবেন একদিন।

দৃষ্টিভঙ্গীটা ভাল। আচ্ছা মিঃ মিত্র, এই মার্ডারটার সম্বন্ধে আপনার কি ধারনা?

—আমার কোন ধারনাই নেই মশাই। আমি ও সম্বন্ধে প্রচুর ভেবেও কোন কূলকিনারা করতে পারিনি।

—আপনার সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ। এবার আমরা উঠব।

বাসব ও শৈবাল ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে বাগানে এল।

গেটের দিকে না গিয়ে বাড়ির পেছন দিকে বাসবকে যেতে দেখে শৈবাল বলল, ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?

—বাগান থেকে ঢিল মেরে দোতলার কাচের জানলার শার্শি ভাঙ্গা যায় কিনা দেখতে যাচ্ছি।

—অর্থাৎ —?

—তোমার স্মরণ শক্তি ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে ডাক্তার। ভুলে গেলে চম্পাদেবীর কাচের জানলা মাঝরাত্রে ভেঙ্গে যাওয়ায় তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল! একটু খোঁজ খবর নিয়ে তাই দেখতে হচ্ছে।

ওরা আরো কিছুদূর এগিয়ে গেল।

বাসব আবার বলল, ওই সেই জানলা বোধহয়! দেখছ, শার্শিটা ভাঙ্গা!

শৈবাল উপর দিকে তাকিয়ে দেখল, পরের পর ঘরের সারি সারি জানলা বন্ধ। তার মধ্যে একটি জানলার খানিকটা কাচ ভাঙ্গা।

বাসব জানলার নিচের মাটির অংশটার দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। কয়েকদিন বৃষ্টি হওয়ার দরুন জায়গাটা কাদা কাদা হয়ে রয়েছে।

—আপনারা যা ভাবছেন ঠিক তা হয়নি।

চমকে মুখ ফেরাল ওরা।

হাত কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে রঞ্জন মুখার্জি।

—আপনি —? বাসব বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

—আমি রঞ্জন মুখার্জি।

—আপনার সঙ্গে পরিচয় করবার ইচ্ছে আমার ছিল। ভালই হল। আপনি কি বলছিলেন যেন?

রঞ্জন বললেন, বাঁশের ঘায়ে জানলার কাচটা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

—তাই নাকি?

—ওই দেখুন কত বড় সাইজের একটা বাঁশ পড়ে রয়েছে ওখানে।

ওরা একই সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে দেখল, পর পর কতকগুলো স্থলপদ্ম গাছ,

আর তারই তলায় আড়াআড়ি ভাবে পড়ে আছে একটা বেশ বড় গোছের বাঁশ।

বাসব বলল, আপনি অনেক কিছুই জানেন দেখছি?

—না জেনে উপায় কী বলুন না। বলতে গেলে আমার চোখের ওপরই ঘটেছে ঘটনাটা।

—কে, কে সে? নিশ্চয়ই তার নামটা জানাতে আপনার আপত্তি নেই?

নির্বিকার কণ্ঠে রঞ্জন মুখার্জি বললেন, এ বিষয়ে আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারলাম না বলে মর্মাহত। অন্ধকার থাকায় মানুষটিকে আমি চিনতে পারিনি।

—আপনি পুলিশকে একথা জানিয়েছিলেন?

—না। পুলিশ আমার কাছে জানতে চায়নি, তাই বলিনি।

—কিন্তু এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে··

—ব্যাপারটা যে গুরুত্বপূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই। তবে কাউকে কোন কথা উপযাচক হয়ে বলা আমার স্বভাব নয়।

—তবে যে আমায় বললেন? যাক ওকথা—চম্পাদেবীর মুখে শুনলাম, আপনি নাকি তাঁর অজান্তেই কয়েকবার চাকরি যোগাড় করে দিয়েছেন।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে রঞ্জন মুখার্জি বললেন, আপনি সঠিক সংবাদ পাননি।

বাসব বলল, তা অবশ্য হতে পারে। এই হত্যারহস্যের কোন সূত্র আপনার জানা থাকলে আমাকে জানাতে পারেন।

—এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে কোন রহস্যই নেই। সুপর্ণবাবুকে খুঁজে বার করুন, তাহলেই সমস্ত গোল মিটে যাবে।

—হুঁ। আচ্ছা মিঃ মুখার্জি, দুর্ঘটনার দিন সকালবেলা কলেজ রোডের বাড়িতে আপনার সঙ্গে সুপর্ণবাবুর কোন কথা হয়েছিল?

—কই না। কে বললে আপনাকে?

বাসব শান্ত গলায় বলল, কেউ বলেনি। আমি নিজে থেকেই প্রশ্ন করছি।

এবার রঞ্জন মুখার্জির মধ্যে একটু ব্যস্ততা দেখা গেল। তিনি বললেন, আমি চলি। পরে আরেকদিন আমাদের নিশ্চয়ই কথা হবে।

বাসব আর কিছু বলার আগেই ভদ্রলোক দ্রুত সেখান থেকে চলে গেলেন।

সাড়ে সাতটা বেজে গেছে।

শৈবাল ওয়াল-ক্লকটার দিক থেকে দৃষ্টি নামিয়ে জানলার দিকে তাকাল। বাসব প্রায় ঘণ্টা দুয়েক হল পাশের ঘরের দরজা বন্ধ করে কী সব করছে। শৈবাল এতক্ষণ একটা বই নিয়ে ব্যস্ত ছিল।

আরও কুড়ি মিনিট পার হল।

বাসব দরজা খুলে বেরিয়ে এল এই সময়।

ওর সারা মুখে আনন্দ উপচে পড়ছে।

শৈবাল বলল, কি হে, আনন্দে যে একেবারে আটখানা দেখছি?

—আটখানা। আনন্দে এখন আমি হাজারখানা হতে প্রস্তুত আছি।

—হঠাৎ—

—কতকগুলো জটিল জিনিস প্রায় সরল করে এনেছি ডাক্তার।

শৈবাল মৃদু হেসে বলল, নিশ্চয়ই তুমি আমারও জটিলতা দূর করবে?

বাসবও হাসল।—নিশ্চয়ই। এই হত্যাকাণ্ডের বিষয় প্রথম থেকে আলোচনা করলে কতকগুলো গোলমেলে জিনিস আমাদের চোখে পড়বে। যেমন, কৃষ্ণাদেবীকে হত্যা করার স্বার্থ কী। হত্যাকারী এতে কী ভাবে লাভবান হয়েছে। কৃষ্ণাদেবী এবাড়ির কেউ নন, যতদূর মনে হয় কোন অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি জড়িত ছিলেন না, তবু তিনি হত হলেন কেন?

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার আরম্ভ করল—হত্যা ঝোপের মধ্যে হয়েছে, না মৃতদেহ ওখানে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পোস্টমর্টেমের রিপোর্টে বলা হয়েছে শ্বাসরুদ্ধ করে কৃষ্ণাদেবীকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর গলায় বা অন্য কোথাও কোনরকম চাপের দাগ পাওয়া যায়নি। বাঁ কাঁধের ওপর ওরকম গভীর ক্ষতচিহ্ন থাকার অর্থ কি? তাছাড়া, চম্পাদেবীর ঘরের কাচভাঙা, তাঁর পরিচয়পত্র চুরি করা ও তাঁকে ওই অদ্ভুত কবিতাটি উপহার দেবার সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের কোন সম্পর্ক আছে কিনা—? আমি সমস্ত বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি এবং এই প্রবলেমগুলির কয়েকটি এখন আর আমার কাছে প্রবলেম নয়।

—কি রকম!

বাসব সিগারেটে ঘন ঘন কয়েকবার টান দিয়ে বলল, ঝোপের মধ্য থেকে আমি কতকগুলো পাতলা কাচ করা মোমের টুকরো পেয়েছিলাম—তোমায় দেখিয়েছি। সেগুলো আমি অনুবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা করেছি। অনুবীক্ষণ যন্ত্রটা সত্যিই আমার বিশেষ বন্ধু ডাক্তার। পরীক্ষা করে দেখলাম টুকরো-গুলোর গায়ে ক্লোরিনের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

শৈবাল বলল, ক্লোরিন গ্যাস অবশ্য মোমের ফ্লাস্ক ছাড়া আর কিছুতেই রাখা যায় না।

—এখন তুমিই বলতে পারবে, ক্লোরিন গ্যাসে একটা লোকের মৃত্যু হওয়া সম্ভব কিনা?

—নিশ্চয়ই সম্ভব। ক্লোরিন গ্যাস কিছু বেশি মাত্রায় প্রয়োগ করলে রক্তের হিমো-গ্লোবিনের সঙ্গে মিশে গিয়ে ফুসফুসকে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে অকেজো করে দেয়। অথচ কিছুক্ষণ পরে বুঝতে পারা যায় না মৃত্যু হয়েছে ক্লোরিন গ্যাসে।

—তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম, হত্যাকারী প্রথমে কৃষ্ণাদেবীকে আহত করে এবং তারপর ক্লোরিন গ্যাসের সাহায্যে হত্যা করে। ঝোপের মধ্যে যে গ্যাস প্রয়োগ করা হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে তিনি ওখানে আহত হননি। কারণ তিনি এখানে নবাগতা ছিলেন, তাঁর পক্ষে ওখানে

য়াওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। জোর করে কেউ তাঁকে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি চেঁচামেচি করতেন। কাজেই ধরে নিতে হবে, তাঁকে আহত করে ওখানে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নইলে কাঁধের ক্ষতচিহ্নের কোন অর্থ হয় না। এই একটা মাত্র আবিষ্কারে অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল।

বাসব সিগারেটের টুকরোটা অ্যাসট্রেতে ফেলে দিয়ে বলল আবার, চম্পা-দেবীর কবিতা উপহার পাওয়া ইত্যাদি যে সব ঘটনা আমরা জানি, তার সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের গভীর যোগাযোগ আছে বলে আমি মনে করি। অবশ্য যোগা-যোগটা কী ধরনের তা এখন আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

—একাজ কে করতে পারে সে সম্বন্ধে কোন ধারণা হয়েছে তোমার ?

—একমাত্র ভগবান ছাড়া এসম্বন্ধে কোনরকম ধারনা করা এখন কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে হত্যাকারীর একটা দুর্বলতা আমি ধরে ফেলেছি।

—তার মানে ?

—ঝোপের সামনে, একটা পাথরের ওপর কালচে ধরনের মিহি খৈনি বা দোক্তা পাতার মত পদার্থ আমরা পেয়েছি-- ?

--হ্যাঁ—হ্যাঁ—।

—সেগুলো কি জান ?

—কি সেগুলো ?

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, কোকা।

---কোকা ! সে আবার কি ?

—কোকেন গাছের পাতা।

—কোকেন গাছের পাতা! সে তো এক মারাত্মক জিনিস! দক্ষিণ আমেরিকায় শুনেছি এই পাতা এক সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—তুমি ঠিকই শুনেছ ডাক্তার। এই পাতা চিবোলে নাকি উত্তেজনাকর নেশা হয়। এক পেরুতেই দশ লক্ষের ওপর নেশাখোর এই পাতা চিবোনোতে তাদের উপার্জনের এক চতুর্থাংশ ব্যয় করে ফেলে। বোলিভিয়ার বহুলোক নিজেদের আংশিক মাইনে হিসেবে কোকা নিয়ে থাকে।

—বল কি ! কিন্তু এই কোকার মুঙ্গেরে আগমন হল কি ভাবে ? আমার মনে হয় এই পাতা চিবোনোর নেশা ভারতবর্ষে কারুর নেই।

বাসব নির্বিকার গলায় বলল, চিবোনোর নেশা না থাকলেও কোকার থাকতে পারে তো ?

উত্তেজিত ভাবে শৈবাল বলল, তুমি বলতে চাও, আমরা যা কুড়িয়ে পেয়েছি তা কোকার সিগারেট মিক্সচার ?

—আমি তাই বলতে চাই। বৃষ্টির জলেতে সিগারেটের উপরকার কাগজটা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আমরা শুধু মিক্সচারটুকু দেখতে পাই। কাজেই ধরে নিতে হত্যাকারীর কোকা মিক্সচার স্মোক করে নিজের দুর্বল স্নায়ুকে উত্তেজিত বার অভ্যাস আছে।

—তুমি বুঝলে কি করে, এই হ্যাবিটটা হত্যাকারীরই, অন্য কারুর নয়?

—এই জন্যে, তোমার নিশ্চয়ই অনুমান করে নিতে কষ্ট হচ্ছে না, এটা একটা এক্সপেনসিভ নেশা। দক্ষিণ আমেরিকা ছাড়া, এসিয়ায় কেন সারা ইউরোপেও এক ছটাক কোকা তুমি বাজারে কিনতে পাবে না। পেরু, ব্রাজিল চিলি প্রভৃতি জায়গা থেকে অনেক টাকা খরচ করে বস্তুটিকে সংগ্রহ করতে হবে। কাজেই সাধারণ লোকের পক্ষে এ নেশা করা সম্ভব নয়। এটা নেশা এবং সেমটাইম অ্যারিস্টোক্রেসিও বটে। যে লোক এত পরিকল্পনা করে গ্যাস প্রয়োগ করে কাউকে হত্যা করতে পারে, তার পক্ষেই এ নেশা করা সাজে তাছাড়া ওই পার্টিকুলার মিক্সচার যেখানে মৃতদেহ পাওয়া গেছে সেখানেই ব পড়ে থাকবে কেন?

—তুমি বলতে চাও, হত্যাকারী মার্ডার করবার পর ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল।

—হয়ত মার্ডার হবার আগেই হত্যাকারী সিগারেটটার আদ্যশ্রাদ্ধ করছিল। অবশ্য আমার থিয়োরি ভুলও হতে পারে।

—কিন্তু কেন?

—আমার মনে হয়, সে কারুর অপেক্ষায় ছিল। বোধহয় কৃষ্ণাদেবীর আহত দেহটা যে বয়ে এনেছিল তার অপেক্ষায়। এই কথায় আরেকটা প্রশ্ন এখানে এসে পড়ে। তা হলে, হত্যাকারীর দলে কি আরেকজন লোক আছে?

শৈবাল কথার মোড় ঘোরাল।—চম্পাদেবীর পাওয়া সেই কবিতাটা সম্বন্ধে কি সত্যি কিছু করে উঠতে পারনি?

বাসব সিগারেটটায় দীর্ঘটান দিয়ে বলল, সত্যি এখনও কিছু ঠিক করে উঠতে পারিনি। পত্রলেখক কোন রসিকতা করেছেন, না সত্যি ওই আবোল-তাবোল কথাগুলোর কোন অর্থ আছে—আগে আমাকে তাই ভেবে দেখতে হবে। কবিতাটা তুমি দেখেছ?

বাসব পকেট থেকে একটা কাগজ বার করল। এই দেখ—

যতদূরে দেখা যায়
থৈ থৈ জল শুধু।
ঘোলাজল, নোনাজল,
ছলছল, বেনোজল।

—আমার মনে হয়—শৈবাল বলল, চম্পাদেবীকে কোন কারণে ভয় পাইয়ে দেওয়াই হল ওই কবিতাটার উদ্দেশ্য।

—হতে পারে। বাসব একটা হাই তুলল।—চল, ওঠা যাক। ঘরের মধ্যে আর ভাল লাগছে না।

খেতে ভাল লাগে না! কিন্তু কিছু না খেলেও নয়।

কোনরকমে রাত্রের খাওয়া শেষ করে নিজের ঘরে ফিরে এল চম্পা।

আলোটা নিভিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। কিন্তু ঘুম আসছে না চোখে। রাজ্যের চিন্তা ওকে কুরে কুরে খেয়ে চলেছে।

সময় কেটে যাচ্ছে। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছে চম্পা। ঘুম আসবার কোন লক্ষণই নেই ! ঘুম ওর সহজে হয় না আজকাল।

সশব্দে কোথায় একটা বাজল।

আর এভাবে শুয়ে থাকতে ভাল লাগছে না। তিন ঘণ্টার ওপর শুয়ে আছে। অন্ধকারটা যেন ওকে অক্টোপাশের মত আঁকড়ে ধরে আছে।

বিছানা থেকে নেমে পড়ল চম্পা।

বেডরুম ল্যাম্পটা জ্বালল গিয়ে। একটা জানলা খুলে দিল তারপর। সেদিনের সেই ঘটনার পর ওকে এই গরমেও জানলা বন্ধ করেই শুতে হয়।

নিচে অন্ধকার বাগান দেখা যাচ্ছে।

থেকে থেকে জোনাকিরা জ্বলে উঠছে ওখানে। থমথমে রাতের নীরবতায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে ঝিঁঝিঁরা ডেকে চলেছে একটানা। চম্পার মনে পড়ে, ছোটবেলায় পড়েছিল যেন কোথায়—হেথাকার তরু, হোথাকার লতা, ঝিল্লিরা সব কাঁদে—সত্যিই কি ওরা কাঁদে ? ওদের ডাকটা তাহলে ডাক নয় ? কেন কাঁদে ওরা ?

চম্পা অনামনস্ক ভাবে বাগানের দিকে তাকিয়ে রইল।

কতক্ষণ তাকিয়েছিল জানে না, হঠাৎ একটা শব্দে ওর চমক ভাঙল। ও মুখ ফিরিয়ে দেখল দরজার দিকে। কে যেন দরজায় নক করছে।

কেমন ভয় ভয় করতে লাগল চম্পার।

ঘরে কেউ নেই, ও একলা। সেই প্রথম দিন থেকে রামাই ওর সঙ্গে রাত কাটিয়েছে। কাল সে চম্পাকে জানিয়েছিল, কয়েকদিন শুতে আসতে পারবে না সে। বহুদিন পরে কোন এক আত্মীয় আসায় সে কয়েক দিনের ছুটি চায় ইত্যাদি—।

আবার মৃদু করাঘাত হল দরজায়।

চম্পা কাঁপা গলায় বলল, কে ?

চাপা কণ্ঠে উত্তর এল, আমি। দরজা খোল।

কে কার গলার আওয়াজ !

ছুটে গিয়ে চম্পা দরজা খুলে দিল।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সুপর্ণ। বারান্দার আলো এসে ওর মুখের ওপর পড়েছে। একি চেহারা হয়েছে ওর ! সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখের কোলে গাঢ় কালির রেখা। তেলহীন রুক্ষ চুলগুলো এলোমেলো।

সুপর্ণ ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, চম্পা—!

ফোঁটা ফোঁটা করে অজস্র চোখের জল গাল বেয়ে ঝরে পড়ল চম্পার।—তুমি—

সুপর্ণ সবলে জড়িয়ে ধরল চম্পাকে।

রেডিয়াম-ডায়াল যুক্ত ঘড়িটার দিকে তাকাল বাসব।

কাঁটায় কাঁটায় একটা।

রাজনারায়ণ লজের বাগানে—একটা পাকুড় গাছতলায় চুপচাপ অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও আর শৈবাল।

চাঁদ আজ উঠবে না। চারিদিকে জমাট অন্ধকার। কোথাও এতটুকু আলোর চিহ্ন নেই। অন্ধকারের মধ্যেই বাড়িটা দেখা যাচ্ছে আবছা ভাবে।

শৈবাল বলল, আর তো পারা যায় না। মশায় একেবারে ছিঁড়ে খেয়ে ফেললে।

বাসব বলল, ফলারের এত বড় সুযোগ পেলে কেউ কি ছাড়ে ডাক্তার?

শৈবাল কি একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা জানলা খুলে গেল বাড়ির। চৌকো আলোর রেখা ফুটে উঠল। কে একজন এসে দাঁড়িয়েছে জানলার সামনে।

শৈবাল চাপা গলায় বলল, চম্পাদেবী—

—এত রাত্রে ভদ্রমহিলা জানলার সামনে কেন? বাসব নিজেকেই প্রশ্ন করল।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর চম্পা সরে গেল জানলার কাছ থেকে। কিন্তু চম্পাকে আর ফিরে আসতে দেখা গেল না।

মিনিট দশেক পার হল আরো।

বাসব বলল, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই। এস বাড়ির আনাচে কানাচে একটু ঘুরে আসা যাক।

ওরা এগিয়ে চলল। অন্ধকারের মধ্যে পথ ঠাহর করে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ওরা তবু যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি খোঁজা-খুঁজি করে বাড়ির পিছন দিকে এসে দাঁড়াল। একটা আমড়া গাছ উঠানের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

তাকে অবলম্বন করেই ওরা উঠানে এসে নামল।

উঠান পার হয়ে, লম্বা টানা বারান্দাটা পেরিয়ে বাসব ও শৈবাল সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল। সিঁড়ির ওপরকার দরজাটা নিশ্চয়ই বন্ধ। এখন কোন দিকে যাবে? কিন্তু বেশিক্ষণ চিন্তা করবার অবসর পাওয়া গেল না। সিঁড়ি দিয়ে কারা যেন নেমে আসছে মনে হল।

ওরা দুজন তাড়াতাড়ি সরে এল।

দেওয়ালের গা ঘেঁসে এমন একধারে গিয়ে দাঁড়াল ওরা, যেখানে হঠাৎ কারুর নজরে পড়ার সম্ভাবনা কম।

দুজন লোক নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে। অন্ধকারে তাদের দেখা যাচ্ছে না তবে একজনের হাতে একটা সিগারেট আছে বুঝতে পাবা যাচ্ছে।

সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে তারা দাঁড়াল।

খুব চাপা গলায় কথা হচ্ছে তাদের মধ্যে। বাসব ও শৈবাল কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুই শোনা যাচ্ছে না। তবে অনুমান করতে কষ্ট হচ্ছে না। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে যে দুজন কথা কইছে, তাদের মধ্যে একজন পুরুষ ও অন্যজন নারী।

মিনিট পাঁচেক এই ভাবে কাটার পর, দুজনে আরো কয়েক পা এগিয়ে এল। এবার কিছু কথাবার্তা শুনতে পেল ওরা। পুরুষটি সিগারেটের টুকরোটা মাটিতে ফেলে দিয়ে বলল, এবার আমি চলি।

—এরকম দুঃসাহসের কোন মানে হয় না। মেয়েটি বলল, কেউ দেখে ফেললে কি কেলেঙ্কারি হত বল তো?

—কি আর হত?

—না ঠাট্টার কথা নয়।

—দিনের বেলা হাজার বার দেখা হলেও কথা বলার সুযোগ পাওয়া যায় কি? তাছাড়া—

—বেশ, এবার তুমি যাও। তবে আমায় যা বললে—ও কথাগুলো আর কাউকে বলা চলবে না কিন্তু।

—চুপচাপ থাকাটা কি ঠিক হবে? রহস্য যত পরিষ্কার হয়ে যায় ততই ভাল নয় কি?

-না। তুমি ভীষণ ভাবে জড়িয়ে পড়বে। ভয় আমার পুলিসকে নয়, ভয় আমার মেয়েটির কথা শেষ হল না।

দোতলা থেকে আওয়াজ পাওয়া গেল। পায়ের আওয়াজ সঙ্গে সঙ্গে কথোপকথন-রত যুগল মূর্তি অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যে মিলিয়ে গেল, ঠিক বুঝতে পারা গেল না।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল আরো দুজন।

একজনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। আমার ভুল হয়নি। আমি পরিষ্কার দেখেছি দুজনকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে।

-গেল কোথায় তারা?

এবার অবশ্য গলার আওয়াজ চিনতে কষ্ট হয় না বাসবের। একজন রামনারায়ণ অন্যজন জয়ন্ত চৌধুরী।

তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব হল এবার।

—কি হয়েছে জয়ন্তবাবু? বাড়িতে চোর এল নাকি? আমার মনে হল, কে দৌড়ে চলে গেল আমার ঘরের পাশ দিয়ে। বক্তা রঞ্জন মুখার্জি।

—সেই খোঁজই তো আমরা করছি।

—আমার মনে হয়—রামনারায়ণ বললেন, তুমি ভুল করছ। এত রাত্রে কারা এখানে আসবে!

—আপনি আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেন। আমি যা দেখেছি তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। জয়ন্ত চৌধুরী বললেন।

বাসব ভেবে দেখল আর লুকিয়ে থেকে লাভ নেই। এখুনি হয়ত কেউ আলোটা জেলে দিতে পারে। বাসব এগিয়ে গেল। পিছনে শৈবাল।

—দেখুন তো, আপনারা আমাদের সম্বন্ধে বলছেন কিনা ?

বাসবের কণ্ঠস্বরে সকলে অবাক হলেন। কে একজন হাত বাড়িয়ে বারান্দার আলোটা জেবলে দিল।

রঞ্জন মুখার্জি বললেন, একি, মিঃ ব্যানার্জি! আপনি এত রাত্রে এখানে ?

সকলেই বিলক্ষণ অবাক হয়েছেন বাসব ও শৈবালের অপ্রত্যাশিত উপস্থিতিতে।

—বিশেষ প্রয়োজনেই আসতে হয়েছে মিঃ মুখার্জি। জয়ন্তবাবু বোধহয় আমাদের দুজনকেই দেখে থাকবেন।

ওঁরা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

শেষে জয়ন্ত চৌধুরী বললেন, আপনি বোধহয় ঠিকই বলছেন কিন্তু আমার যেন মনে হল দুজনের মধ্যে একজন ফিমেল ছিল।

রামনারায়ণ বললেন, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আসুন আপনারা—আমার ঘরে আসুন। কফির ব্যবস্থা করা যাক।

রঞ্জন মুখার্জি বাদে আর সকলে রামনারায়ণের ঘরে এলেন।

ঘরটি বেশ বড়।

অন্যান্য প্রয়োজনীয় আসবাব ছাড়াও, ঘরে গোটা পাঁচেক কাচের আলমারি রয়েছে। আলমারিগুলোর প্রতিটা তাকে বোতল এবং জার ঠাসা। কোন ওষুধপত্র আছে বোধহয় তাতে।

রামনারায়ণ নিজেই হিটারে কফি তৈরি করতে ব্যস্ত হলেন।

বাসব জয়ন্ত চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বলল, কি হয়েছিল বলুন তো ?

—দেখছেনই তো কী দারুণ গরম চলেছে। ঘুম আসছিল না। তেতলার ছাতে গেলাম একটু হাওয়া পাওয়ার উদ্দেশে। কিন্তু ওখানে গিয়েও গরমের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল না। ছাত থেকে নেমে এসে সবে একতলার বারান্দায় পা দিয়েছি এমন সময় মনে হল দুজন লোক সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল। চোর মনে করে আমি উপরে উঠে গেলাম কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। আমি আবার নিচে এসে জামাইবাবুকে ডেকে নিয়ে গেলাম উপরে।

—তারপর ?

—এধার-ওধার খোঁজাখুঁজি করছি হঠাৎ আবার দেখলাম একজোড়া ছায়া নিচে নেমে গেল। আমার যতদূর মনে হয়েছে, দুজনের মধ্যে একজনের পরনে শাড়ি ছিল।

—থাক এখন ওকথা। তার চেয়ে এখন কাজের কথা আরম্ভ করা যাক। নিশ্চয়ই আমার গোটাকতক প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনার আপত্তি হবে না ?

—নিশ্চয়ই না। বলুন ?

—দুর্ঘটনার দিন সকালে, নটা থেকে সাড়ে দশটা অবধি আপনি কোথায় ছিলেন ?

—কলেজ রোডের বাড়িতেই ছিলাম। চিঠি লিখছিলাম কলকাতার এক বন্ধুকে।

—এইক্ষণ সময় নিল চিঠি লিখতে?

জয়ন্ত চৌধুরী হাসলেন। —এরপর হয়ত আপনি প্রশ্ন করবেন, আমি যে সত্যি চিঠি লিখছিলাম তার কোন সাক্ষী আছে কিনা।—আমি চিঠি লেখার পর কিছুটা সময় খবর কাগজ পড়েছিলাম।

বাসব বলল, আপনার কি মনে হয় সুপর্ণবাবু সত্যিই একাজ করেছেন?

—বাড়ির সকলের এই ধারনা।

—কিন্তু তাঁর এতে লাভ কী। চম্পাদেবীকে তিনি ভালবাসেন। কাজেই তাঁর আত্মীয়াকে খুন করা সম্ভব কি?

—সেটা আপনার ভেবে দেখবার কথা মিঃ ব্যানার্জি। তবে আমি এইটুকু বলতে পারি, মেয়েলি ব্যাপার নিয়ে পৃথিবীতে অহরহ কত খুন জখম হচ্ছে, কাজেই এই দুর্ঘটনায় অবাক হবার মত কিছু নেই।

—আপনি যেন মিন করছেন, সুপর্ণবাবুর সঙ্গে কৃষ্ণাদেবীরও প্রণয়ঘটিত একটা কিছু ছিল—?

—ডেফিনিটলি আমি কিছুই মিন করতে চাই না।

কফি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। রামনারায়ণ নিজেই দুকাপ কফি বাসব আর শৈবালকে এনে দিলেন। জয়ন্ত চৌধুরী উঠে গিয়ে এক কাপ নিজের জন্য নিয়ে এলেন।

কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে আলোচনা এগিয়ে চলল।

—আপনি কি করেন মিঃ চৌধুরী?

—আলীপুর কোর্টে প্র্যাকটিশ করি।

—হঠাৎ এসময় কলকাতা থেকে এখানে এসেছিলেন যে?

—এমনি। অনেকদিন জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা হয়নি তাই—

বাসব রামনারায়ণবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, বেশ ভাল হয়েছে আপনার কফি।

—বহুদিন ধরেই নিজের হাতে কফি তৈরি করে খাওয়া অভ্যাস। এখনও ভাল না হলে পরিতাপের কথা হত। রামনারায়ণ বললেন।

—আচ্ছা মিঃ চ্যাটার্জি, সেদিন আপনি সকাল নটা থেকে সাড়ে দশটা অবধি কোথায় ছিলেন?

—আমার রান্নাবান্না করার দিকে একটু ঝোঁক আছে। সে সময় আমি রান্নার জায়গায় ছোট বৌমার সঙ্গে ছিলাম।

—ছোট বৌমা অর্থাৎ ইন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী?

রামনারায়ণ ঘাড় নাড়লেন।

—যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তাহলে আপনাদের পারিবারিক ইতিহাস আমাকে কিছু বললে ভাল হয়।

—না, না আপত্তির আর কী আছে। বাবা নিজের দোষে সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলেছিলেন। তাই দাদার পড়া হল না। তিনি অল্প বয়সেই অর্থ উপার্জনে মন দিলেন। আমি অবশ্য ডাক্তারি পড়ছিলাম। আমার হাউস সার্জান থাকার সময়ই বাবা মারা গেলেন। পরবর্তী কালে দাদা নিজের অধ্যবসায় ও প্রতিভার বলে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছিলেন। কিন্তু পারিবারিক জীবন দাদার ভাল ছিল না। বৌদি অল্প বয়সেই মারা গেলেন। বড় ছেলে দেবনারায়ণ ঝগড়া করে চিরদিনের মত চলে গেল। এমন কি তাঁর মৃত্যুটাও হল—থামলেন রামনারায়ণ।

—কথাটা শেষ করুন মিঃ চ্যাটার্জি।

—অবশ্য—

—অবশ্য কী—বলুন!

—এটা আমার সন্দেহ মাত্র, তবে—

—বেশ তো, আপনি আমাকে বলুন। আমি যখন পুলিশের লোক নই—

—আমার ধারনা দাদাকে খুন করা হয়েছে।

বাসব দ্রুত কণ্ঠে বলল, খুন! এ ধারনা আপনার হল কি করে?

রামনারায়ণ একটা সিগারেট ধরালেন।

উগ্র কটু গন্ধে সারা ঘর ভরে উঠল।

—একটু কড়া ধরনের সিগারেট। এর গন্ধ আপনাদের অসুবিধা ঘটাচ্ছে বুঝতে পারছি। অবশ্য আমার মত পাঁড় ধূমপায়ীর এ সিগারেট ছাড়া অন্য কিছুতে সানায় না। কি বলছিলেন, আমার কি করে ধারনা হল দাদাকে খুন করা হয়েছে? একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের খালি চোখের দৃষ্টিই যথেষ্ট মিঃ ব্যানার্জি।

—আপনার দাদার মৃত্যু হয়েছিল কোথায়? এবাড়িতে নিশ্চয়ই?

—না। দাদা নিজের জমি তদারকে গিয়েছিলেন। ওখানেই তিনি মারা পড়েন।

—তারপর?

—তারপর ইন্দ্রকে আমার সন্দেহের কথা বললাম। কিন্তু আমাদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান বললেন, ইট ইজ নাথিং বাট করনারি থ্রমবোসিস। ইন্দ্র যখন এ সম্বন্ধে মাথা ঘামাল না, আমি আর মিথ্যে তখন ঝামেলা বাড়ানোর সার্থকতা খুঁজে পেলাম না।

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, অন্যায় করেছেন মিঃ চ্যাটার্জি, পুলিশকে এবিষয় সচেতন করা আপনার কর্তব্য ছিল। যাই হোক, আপনার দাদাকে কি ভাবে হত্যা করা হয়েছিল বলে আপনি অনুমান করেন?

—আমার বিশ্বাস ক্লোরিন তাঁর রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এতে মৃত্যু অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে হয়েছে বলে মনে হয়।

—ক্লোরিন?

—হ্যাঁ। আমি আপনাকে এত কথা বলতাম না, বলছি এই জন্যে যে কৃষ্ণারও মৃত্যু হয়েছে ঠিক ওই একই পদ্ধতিতে।

বাসব মৃদুকণ্ঠে বলল, দ্বিতীয়বার ভুলও আপনি করেছেন ওই সঙ্গে। এবারে পুলিশের কাছে এসত্য আপনার গোপন করে যাওয়া উচিত হয়নি।

—আমি নির্বিরোধ লোক। কোনরকম গোলমালে যেতে ভয় হয়।

—ওয়েল মিঃ চ্যাটার্জি, আপনার কথামত তাহলে ধরে নিতে হয়, রাজনারায়ণবাবু ও কৃষ্ণাদেবীকে একই লোক হত্যা করেছে। কে সে?

সিগারেটে বার কতক ঘন ঘন টান দিয়ে এ্যাসট্রেতে ফেলে দিলেন রামনারায়ণ। তারপর বললেন, এটা একটা স্বার্থের কথা মিঃ ব্যানার্জি। দাদার পোষ্যের অভাব ছিল না।

—আপনার কথাটা আমি ঠিক ধরতে পারলাম না।

—ক্ষমা করবেন। এ বিষয়ে আমার আর কিছু বলা সম্ভব হবে না।

বাসব কথার মোড় ঘোরাল।

—আপনি এখনো প্র্যাকটিশ করছেন বোধহয়?

—বছর দশেক হল প্র্যাকটিশ করা ছেড়ে দিয়েছি।

—কেন?

করুণ ভাবে হাসলেন রামনারায়ণ।—চিকিৎসা বিভ্রাটে স্ত্রী মারা যাবার পর, চিকিৎসা করার ওপর কেমন একটা বিতৃষ্ণা এসে গেল আমার।

—এখন তাহলে·

—এখন বাড়িতেই ওষুধপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করি। ওটা আমার নেশা বলতে পারেন।

—চম্পাদেবীর মুখে শুনলাম, আপনি তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—নিশ্চয়ই পাত্র ঠিক করা ছিল? পাত্রটি কে?

—কোন পাত্র ঠিক করা ছিল না।

বাসব ঘড়ির দিকে তাকাল—সাড়ে তিনটে বেজে গেছে।

—এবার আমরা উঠি।

—সেকী—জয়ন্ত চৌধুরী বললেন, এত রাত্রে কোথায় যাবেন। তারচেয়ে—

—না, না, আমাদের ফিরে যেতে কোনই অসুবিধা হবে না। ভাল কথা, রাজনারায়ণবাবুর মৃত্যুর সময় তাঁর কাছে কেউ ছিল কি?

—শ্রীনাথবাবু—দাদার ম্যানেজার তাঁর কাছে ছিলেন। রামনারায়ণ বললেন।

বাসব ও শৈবাল উঠে দাঁড়াল।

জয়ন্ত চৌধুরী বললেন, কিন্তু একটা প্রশ্ন এখনো প্রশ্নই থেকে যাচ্ছে মিঃ ব্যানার্জি? আপনি এতরাত্রে এবাড়িতে এসেছিলেন কেন?

মৃদু হাসল বাসব।—আগেই বলেছি তো, নিশ্চয়ই কোন বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আচ্ছা চললাম। এস ডাক্তার।

॥ নয় ॥

বেশ বেলাতে ঘুম ভাঙ্গল শৈবালের। সে তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসল।

বাসব তখন একটা চেয়ারে বসে সিগারেট টানছিল। শৈবালকে উঠে বসতে দেখে বলল, তোমার শ্বশুরমশাইকে তুমি মোটেই জামাই-আদরের সুযোগ দিচ্ছ না।

—কেন ?

—এর মধ্যে তিনি কতবার ঘুরে গেছেন তার হিসেব একমাত্র আমিই রাখি। ওই দেখ, তোমার জলখাবারের ডিসগুলো টেবিলের ওপর থরে থরে সজ্জিত।

—আর তুমি বোধহয় আমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারলে না।

সিগারেটে একটা সুখটান দিয়ে মুদিত চোখে বাসব বলল, বলাই বাহুল্য। কোনকালে সমস্ত হজম হয়ে গেছে আমার।

শৈবাল বাথরুমের উদ্দেশে রওয়ানা দিল কাল বিলম্ব না করে।

জলযোগ শেষ করে শৈবাল বাসবের পাশে এসে বসল।

বলল, যাই বল, কালকের রাত আমাদের এক বিচিত্রতম রাত গেছে।

—হুঁ। রামনারায়ণবাবুর সঙ্গে কথা বলে আমি বেশ লাভবান হয়েছি।

—আচ্ছা, সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসা সেই যুগল আগন্তুক সম্বন্ধে তোমার মত কি ?

বাসব বলল, আগে তোমার মতটা শুনি ?

—আমার মতে চম্পাদেবী আর সুপর্ণবাবুকেই আমরা দেখেছি।

—সাধারণ দৃষ্টিতে অবশ্য তোমার অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করা যায় না।

—চম্পাদেবী এত রাত অবধি জেগেছিলেন কেন ? নিশ্চয়ই কারুর অপেক্ষায় ছিলেন। অপেক্ষা সুপর্ণবাবু ছাড়া আর কার জন্যে হতে পারে ?

—বলছি তো, সাদা চোখে তাই মনে হয় বটে। তবে—এখানে যে একটা বড় রকম 'তবে' রয়েছে ডাক্তার। আর ওই তবেই হল আসল কথা।

—অর্থাৎ— ?

—আমরা তাদের সব কথা শুনতে পাইনি। তবে যা শুনেছি, তা নিশ্চয়ই তুমি ভুলে যাওনি ? ছেলেটি বলেছিল একবার, 'দিনের বেলা হাজার বার দেখা হলেও কথা বলার সুযোগ পাওয়া যায় কি' এখন তুমি চিন্তা করে দেখ, একথা সুপর্ণবাবু বলতে পারেন কি না। না, তা তিনি পারেন না। দিনের বেলা চম্পাদেবীর সঙ্গে সুপর্ণবাবুর হাজার বার দেখা হবার সম্ভাবনা কোথায় ? কারণ তাঁর এখন অজ্ঞাতবাস চলেছে।

—তাহলে কি তুমি বলতে চাও, চম্পাদেবী আর কারুর সঙ্গে—

—না। কেন, চম্পাদেবী ছাড়া কি আর কোন যুবতী ও বাড়িতে নেই?

—ইন্দ্রবাবুর মেয়ের কথা বলছ তুমি?

বাসব কিছু না বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

শৈবালের অনুমান করে নিতে কষ্ট হল না যে ও আর একটা কথাও বলবে না এ সম্বন্ধে।

কিন্তু মিনিট কয়েক পরে বাসব আবার এসে চেয়ারে বসে বলল, চম্পাদেবীর জন্যে রামনারায়ণবাবু জয়ন্ত চোধুরীকেই মনোনিত করেছিলেন।

—তাই নাকি?

—নিশ্চয়ই তাই। সেই জন্যেই নামটা করলেন না। ওরকম ধনবতী ও রূপবতী স্ত্রী আর কার কাম্য নয় বল না?

শৈবাল বলল, এতে রামনারায়ণবাবুর আর কি লাভ হবে?

বাসব প্রশ্নটা এড়িয়ে বলল, এই সিগারেটটা দেখ।

শৈবাল দেখল, ওর হাতে একটা আধপোড়া সিগারেট।

—কাল ওবাড়ি থেকে এটাকে সংগ্রহ করে এনেছি।

শৈবাল আশ্চর্য হল।

সিগারেটের টুকরোটা যে রামনারায়ণবাবুর সেই বিশ্রী গন্ধযুক্ত সিগারেট, তাতে কোন সন্দেহ নাই। আশ্চর্য হবার কারণ হল, জয়ন্ত চৌধুরী, রামনারায়ণবাবু ও তার চোখ বাঁচিয়ে বাসব টুকরোটা তুলে নিয়েছিল কখন!

—তুমি টুকরোটা তুলে নিয়েছিলে কখন?

—নিয়েছিলাম একসময় ঠিকই। শোন, এর ছাপা অংশটা পুড়ে যায়নি। এতে লেখা রয়েছে, বার্নাডি হেস য়্যাণ্ড কোং। আর্জেণ্টিনা। অর্থাৎ এতে আমরা কোকার মিক্সচারই পাব।

শৈবাল উত্তেজিত ভাবে বলল, রামনারায়ণবাবুই তাহলে

বাসব মৃদু হেসে বলল, চল, ওঠা যাক। একবার থানায় যেতে হবে।

কুলদীপ মেহরাকে পাওয়া গেল না।

ইন্সপেক্টার লালচাঁদ ছিলেন থানায়। তাঁরই সঙ্গে মিনিট দশেক কথা কয়ে বাসব থানা থেকে বেরিয়ে এল শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে।

আসবার সময় ডাঃ রায়ের ঠিকানাটা নিয়ে নিল বাসব ইন্সপেক্টারের কাছ থেকে। থানা থেকে বেশ কিছুটা দূরে ডাঃ রায়ের চেম্বার।

রিক্সা করেই ওরা চলে গেল ওখানে। ওয়েটিংরুমে প্রচুর রুগীর ভিড়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে মনে হয় ডাঃ রায়ের পসার ও হাতযশ খুবই।

বাসব একটা শ্লিপ লিখে পাঠাল ডাক্তারের কাছে।

ডাঃ রায় নিজেই বেরিয়ে এলেন চেম্বার থেকে।

সাদরে আহ্বান জানালেন ওদের, আসুন—ভিতরে আসুন—

সুইংডোর ঠেলে পথ করে দিলেন ওদের। বাসব ও শৈবাল তাঁর চেম্বারে প্রবেশ করল। ডাক্তারের চেম্বার হলেও ঘরটি সাজানোর ব্যাপারে যথেষ্ট রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

ডাঃ রায়ের চেহারাটিও শিল্পীসুলভ।

লম্বায় ছ'ফুটের কাছাকাছি হবেন ভদ্রলোক। টক টকে গায়ের রং। খাঁড়ার মত নাকের উপর কালো সেলের ফ্রেমের চশমা। চোখ দুটি যেন স্বপ্নময়, লেন্সের মধ্য দিয়েও তার আভাস পাওয়া যায়।

ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা সেক্রিটেরিয়াট টেবিল।

টেবিলের ধারে একটা চেয়ারে মহীতোষ মিত্র বসে রয়েছেন।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর তিনজনের মধ্যে কুশল প্রশ্ন বিনিময় হল। সকলে আসন গ্রহণ করার পর ডাঃ রায় বললেন বাসবের দিকে তাকিয়ে, আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি মিঃ ব্যানার্জি। আপনি আমার চেম্বারে এসেছেন এ আমার সৌভাগ্য। বলুন আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি?

—তেমন কিছু করতে হবে না—বাসব বলল, আপনি এও নিশ্চয়ই শুনেছেন কত বড় গুরুদায়িত্ব নিয়ে আমি আপনাদের শহরে এসেছি। ও সম্বন্ধেই গোটাকতক প্রশ্ন আমার ছিল ডাঃ রায়।

মহীতোষ মিত্র বললেন, আমার বোধহয় এখানে থাকাটা ঠিক হবে না। আমি বরং—বাসব দ্রুতকণ্ঠে বলল, আপনার সামনে সমস্ত কথাই হতে পারে মিঃ মিত্র। আপনি বসুন।

ডাঃ রায় বললেন, আমি এই খুন সম্বন্ধে আর কি বলতে পারি?

—এই খুন সম্বন্ধে আমি কিছু জিজ্ঞেস করব না। আপনি ওঁদের পারিবারিক চিকিৎসক, কাজেই অন্য ধরনের দু-চারটে প্রশ্ন আমার নিশ্চয়ই থাকতে পারে।

—তা পারে অবশ্য।

—রাজনারায়ণবাবু মারা যাবার পর আপনি তাঁর দেহ পরীক্ষা করেছিলেন?

—কেন, বলুন তো?

—আপনার সার্টিফিকেটের জোরেই তাঁর দেহ সৎকার হয়, তাই নয় কি?

—ঠিক আমার সার্টিফিকেটের জোরে নয়—ডাঃ রায় বললেন, আমি সার্টিফাই করার পর সিভিল সার্জন তা এপ্রুভ করেন। তখন

—একই কথা। তাঁর দেহ পরীক্ষা করার পরও আপনার মনে হয়েছিল মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে হয়েছে?

—বডি অবশ্য আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করিনি। আর পরীক্ষা করবারই বা কী ছিল! তাঁর শরীর সুস্থ ছিল না। হার্টের রুগী ছিলেন তিনি। হার্ট ফেল করে মারা যাওয়া তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। আমি রাজনারায়ণবাবুর বিশ বছর চিকিৎসা করেছি। তাঁর শরীরের আপাদমস্তক আমার নখদর্পণে ছিল।

—ধন্যবাদ ডাঃ রায়। আমার আর কোন প্রশ্ন নেই। আমরা এবার

উঠি। পরে আবার দেখা হবে।

উঠবেন কী রকম! এইতো এলেন। বসুন চা-টা····

—না, না ওসব হাঙ্গামা আর করবেন না। আপনার এখন কাজের সময়: বহু রুগী অপেক্ষা করছে দেখলাম—।

মিঃ মিত্রও উঠলেন। বললেন, চলুন। আমিও যাব।

বাইরে এলেন সকলে।

ডাঃ রায় রাস্তা অবধি এসে পেঁছে দিয়ে গেলেন তিনজনকে।

মোড়ের মাথায় এসে মিঃ মিত্র প্রশ্ন করলেন, কোন্ দিকে যাবেন?

বাসব বলল, রাজনারায়ণ লজে।

—চলুন, হেঁটেই যাওয়া যাক। কাছেই—

পথে আর কোন কথা হল না।

রাজনারায়ণ লজে পেঁছাবার পর বাসব প্রশ্ন করল, মিঃ মিত্র, ম্যানেজার শ্রীনাথবাবু লোক কেমন?

—ভাল বলেই তো শুনেছি।

—এখন বোধহয় তিনি বেকার হয়ে পড়েছেন?

—না। ইন্দ্রবাবু তাঁকে নিজের কাজে নিযুক্ত করেছেন।

—তাঁকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন?

—আপনারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান?

হ্যাঁ। দেখা হলে ভাল হয়।

মহীতোষ মিত্র একটি ভৃত্যকে ডেকে বললেন, বাবুদের হিসেব ঘরে নিয়ে যা।

একতলার বাইরের মহলে হিসেব ঘর।

বিরাট ঘরখানা।

দেওয়ালের চতুর্দিকে মাটি থেকে ছাদ অবধি কাঠের তাক। তাতে খেরো বাধান খাতা বোঝাই হয়ে রয়েছে। এককালে নিশ্চয়ই ফরাশের ব্যবস্থা ছিল। এখন টেবিল চেয়ার শোভা পাচ্ছে।

একটা টেবিলে মাথা ঝুঁকিয়ে কী সব লিখছেন শ্রীনাথ পাল।

বাসব ও শৈবাল ঘরে প্রবেশ করল।

মাথা তুললেন শ্রীনাথ পাল। মুখে তাঁর তৈলাক্ত হাসি খেলে গেল। তিনি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে দরজার দিকে ছুটে এলেন।

বাসব বলল, আপনি ব্যস্ত হবেন না শ্রীনাথবাবু। গোটাকতক প্রশ্নের উত্তর পেলেই আমি চলে যাব।

শ্রীনাথ পাল ঘাড় চুলকালেন। তারপর বললেন, তা হল গিয়ে, আপনাকে সাহায্য করতে পেলে আমি আনন্দিতই হব।

বাসব টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে বলল, আপনি এখানে কতদিন কাজ করছেন?

—তা হল গিয়ে, বছর তেইশ তো বটেই।

এই দীর্ঘদিন আপনাকে এই ঘরেই কাজ করে কাটাতে হয়েছে বোধহয় ?

—আজ্ঞে।

—কর্তা আপনাকে বেশ ভালই বাসতেন, কি বলেন ?

—তা হল গিয়ে, বাসতেন বৈকি।

বাসব শৈবালের দিকে তাকাল। 'তা হল গিয়ে' বলাটা শ্রীনাথবাবুর মুদ্রাদোষ —ওরা বুঝতে পারল।

—রাজনারায়ণবাবুর মৃত্যুর সময় আপনি তাঁর কাছে ছিলেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, আমি জানতে পেরেছি, রাজনারায়ণবাবুর স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু হয়নি। সে সম্বন্ধে আপনার মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই।

—স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু হয়নি! —আকাশ থেকে পড়লেন শ্রীনাথ পাল। তা হল গিয়ে, আপনি কি বলছেন স্যার!

—অজ্ঞ সাজবার চেষ্টা করবেন না শ্রীনাথবাবু। আমি জানি, আপনার অজানা কিছুই নেই।

—কিন্তু····

—আমার কাছে সমস্ত কিছু পরিষ্কার ভাবে বললেই ভাল করবেন। নইলে কথাটা পুলিশের কানে উঠলে—

—পুলিশ—!

—ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে গেছে বলে মনে করবেন না। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কী ভাবে সাপ বার করতে হয়, পুলিশের লোকেরা তা জানে।

ব্যাকুল ভাবে শ্রীনাথ পাল বললেন, তা হল গিয়ে, আপনি বিশ্বাস করুন, আমি এসবের মধ্যে জড়িত নেই।

সিগারেটটা নিভে গিয়েছিল। বাসব আবার তাতে অগ্নিসংযোগ করে নিয়ে বলল, আপনি জড়িত আছেন তা একবারও আমি বলিনি। শুধু ওই বিষয়ে আপনি কী জানেন তাই আমি জানতে চাই।

—বেশ। তা হল গিয়ে আমি যা জানি বলছি। তবে—

-আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আপনার ভবিষ্যতের জামিন আমিই হয়ে রইলাম। বলুন ?

হাঁস বেশ ভেঙ্গে পড়েছে রাজনারায়ণের।

বাবুরা নিজেও বুঝতে পারেন।

-নখদর্পণোজকর্ম থেকে বিশ্রাম নিতে তাঁর মন চায় না। অতি অল্প বয়স

—ধর অবধি কাজের মধ্যে দিয়েই তাঁর দিন কেটেছে। কাজেই—

শীতটাও বেশ পড়েছে এবার চেপে।

ধান কাটবার সময় হয়ে এসেছে। অন্যান্যবারের মত এবারও তিনি কাটাঁনির সময় জমিতে উপস্থিত থাকতে চান।

দেওয়ালে টাঙ্গান বড় ক্যালেণ্ডারটার দিকে তাকালেন রাজনারায়ণ। কাল ১০ই। রবিবারও বটে। কাল যাওয়া চলতে পারে। রাজনারায়ণের জমিদারী মুঙ্গেরের চতুর্দিকে ছড়ান। কোথাও ১০০ বিঘে, কোথাও শ'চারেক বিঘে আবার কোথাও ৫০ বিঘে মাত্র।

উপস্থিত তিনি যে জমিতে ধান কাটাতে যাবেন স্থির করেছেন, তার দূরত্ব মুঙ্গের শহর থেকে মাইল কুড়ির বেশি নয়। জায়গাটার নাম লাকাড়কোলা। স্থানীয় ভাষায় লাকাড় এক শ্রেণীর বাঘকে বলা হয়। কাজেই চলতি কথায় লাকাড়কোলার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, ব্যাঘ্র সঙ্কুল স্থান। কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়। নেম এর নেম সেক নয়। সত্যি সত্যিই ছোট এবং বড় দুই শ্রেণীরই বাঘের উপদ্রব আছে এই অঞ্চলে। না থাকার কথাও নয়। বাঘেদের বাস করবার উপযুক্ত স্থান এটি। বিন্ধ্যাচল রেঞ্জের একটি শাখা সরলরেখার মত চলে গেছে মাইলের পর মাইল ধরে। পাহাড়ের ঢালু অঞ্চলে গভীর অরণ্য। ভারত সরকারের বনজ সম্পদ। তরাই অঞ্চলে চাষ আবাদ হয়।

বহুদিন আগে।

মুঙ্গেরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তখন রিচার্ড গ্রীণ। তিনি শুধু আদর্শ জেলা শাসকই ছিলেন না—একজন ভাল শিকারী হিসাবেও তাঁর সুনাম ছিল।

কোন আইনঘটিত সূত্রেই রাজনারায়ণের সঙ্গে মিঃ গ্রীণের প্রথম আলাপ। এই আলাপই ক্রমে বন্ধুত্বের আকার নিল। মিঃ গ্রীণ কোথাও শিকার করতে গেলেই রাজনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

সেবার শীতটা একটু চেপে পড়েছিল।

লাকাড়কোলা অঞ্চলে অত্যন্ত বাঘের উপদ্রবের সংবাদ পেয়ে মিঃ গ্রীণ বন্দুক ঘাড়ে করে রওয়ানা হলেন। রাজনারায়ণও চললেন সঙ্গে।

পর পর দু'রাত্রি চেষ্টা করেও বিগ গেমের সন্ধান পাওয়া না গেলেও, রাজনারায়ণ মুগ্ধ হলেন এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে।

তিনি মিঃ গ্রীণকে বললেন, এখানে কিছু জমি পাওয়া গেলে কিনতাম।

হেসে মিঃ গ্রীণ বললেন, এ আর এমন বড় কথা কী। এখানকার কিছু জমি বেওয়ারিশ হওয়ায় আমরা নিলাম করব ঠিক করে রেখেছি। আপনি চান বন্দোবস্ত করে দিতে পারি।

শহরে ফিরেই জমির বন্দোবস্ত পাকাপাকি হয়ে গেল।

সেই থেকে প্রতি বৎসর তিনি ধানকাটার সময় এখানে এসে প্রায় দু'মাস করে থেকে যান। সময় কাটে তাঁর শিকার করে।

কালই যাওয়া স্থির করলেন রাজনারায়ণ।

একজন চাকর তামাক নিয়ে এসেছিল।

তাকে তিনি বললেন, সরকার মশাইকে ডেকে দে।

শ্রীনাথ পাল কিছুক্ষণের মধ্যে ঘরে প্রবেশ করেই বললেন, আমায় ডেকেছেন বড়বাবু?

—কাল সকালেই আমি লাকাড়কোলায় যেতে চাই। তুমিও আমার সঙ্গে যাবে। তৈরি থেকো।

—আজ্ঞে, তা হল গিয়ে আমি বলছিলাম আপনার শরীরটা তেমন ভাল নেই। এবার না হয়

গড়গড়ার নলটা হাতে চেপে ধরে রাজনারায়ণ বললেন, না তা হয় না শ্রীনাথ। শরীর খারাপের অজুহাতে এতদিনের অভ্যাসটা বদলান চলে না।

—অজুহাত কি বলছেন বড়বাবু! তা হল গিয়ে, আপনার শরীরটা সত্যিই তো খুবই খারাপ।

—শরীরটা যে ভেঙ্গে পড়েছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। আমি তো চলে যেতে চাই। তোমাদের বড়মার কাছে যেতে চাই। কিন্তু তা যখন হচ্ছে না তখন কাজকর্মের মধ্যে ডুবে থাকাটাই কি ঠিক নয়?

কথা কটা শেষ করেই তিনি স্নেহপ্রভার অয়েল-পেন্টিংটার দিকে তাকালেন।

এরপর অবশ্য আর কথা চলে না, তবু শ্রীনাথ বললেন, ঠাণ্ডাটা একটু বেশি পড়েছে না?

—ঠাণ্ডা পড়েছে বলে শিকার পাওয়া যাবে না এমন নিশ্চয়ই কোন কথা নেই। তুমিই তো বলছিলে, কয়েকদিন আগে আমাদের মুলতানি বয়েলটাকে নাকি বাঘে নিয়ে গেছে। তুমি তাহলে এখন এস শ্রীনাথ। ওই কথাই রইল, ভোরবেলায় রওয়ানা হয়ে পড়তে হবে।

—যে আজ্ঞে।

—ওহে শোন, রাইফেলটার সঙ্গে, আমার ডবল বারেল সর্টগানটা নিয়ে নিতে ভুলো না যেন।

শ্রীনাথ পাল দরজার কাছ বরাবর গিয়ে পড়েছিলেন। রাজনারায়ণের কথা শুনে মাথা হেলিয়ে তিনি ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

বাংলোটা কাঠের তৈরি।

বছর আটেক আগে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মিস্ত্রী লাগিয়ে বাংলোটা তৈরি করিয়েছেন রাজনারায়ণ। জঙ্গলের দেশে ইট সুলভ নয়। মুঙ্গের থেকে গাড়ি করে বয়ে আনার হাঙ্গামাও অনেক। তাই এই কাঠের বাংলোর ব্যবস্থা। ডায়নামোর সাহায্যে ইলেকট্রিকের ব্যবস্থাও আছে এখানে। খাওয়ার জলটা শুধু ঝরনা থেকে সংগ্রহ করে নিতে হয়।

লাকাড়কোলায় পৌঁছেই রাজনারায়ণ প্রথমে এক পেয়ালা কফি খেয়ে নিলেন। তারপর বললেন শ্রীনাথকে, চল, দুপুরের খাওয়ার সামগ্রী জঙ্গল

থেকেই সংগ্রহ করে আনি।

—এই এলেন। তা হল গিয়ে একটু বিশ্রাম করে গেলে বরং—

—এখন বিশ্রাম করলে শিকার ফসকে যাবে। শুনতে পাচ্ছ না, কাররারা কী রকম ডেকে চলেছে তারস্বরে।

ঘণ্টা খানেক ঘাপটি মেরে বসে থাকার পর, কাররার ঝাঁকটা ধানক্ষেতে নামার সঙ্গে সঙ্গে, প্রথম গুলিতেই একটাকে কাত করলেন রাজনারায়ণ।

বেশ ওজনদার পাখীটা। শ্রীনাথই ছাল ছাড়ালেন।

কুকারে রান্না করতে বসলেন রাজনারায়ণ নিজেই। মাংস তিনি সময় পেলে নিজেই রেঁধে থাকেন। বেশ ভালই রাঁধেন। বিশেষ পাখীর মাংস।

কুকারে মাংস ফুটছিল। মোড়ায় বসে রাজনারায়ণ গড়গড়া টানতে টানতে কুকারের দিকে তাকিয়েছিলেন।

এই সময় রামনারায়ণ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

তিনি কয়েকদিন মুঙ্গেরে ছিলেন না। গঙ্গার ওপারে কোথায় যেন গিয়েছিলেন।

তাঁকে বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছে।

রাজনারায়ণ বললেন, একী! রাম তুমি?

—মুঙ্গেরে ফিরেই দেখি আপনি এখানে চলে এসেছেন। তাই সোজা চলে এলাম।

—কিছু বলবে নাকি?

একটু ইতস্ততঃ করে রামনারায়ণ বললেন, টাকাটার বিষয় বলছিলাম।

—ও সম্বন্ধে আমি তোমায় আগেই বলেছি। যতদিন আমি উইল করিনি ততদিন স্বতন্ত্র কথা ছিল। এখন আমার পক্ষে কাউকে কিছু দেওয়া একেবারেই সম্ভব নয়।

—কিন্তু এদিকে রিসার্চ—

—আমি মুখ্যু মানুষ। ওসব বুঝি না। এতদিন পরে যখন উইল করেছি তখন মনে হয় আর বেশিদিন বাঁচব না। তারপর তোমরা টাকাটা পেলে কী করছ না করছ তা তো আর দেখতে আসছি না।

গুম হয়ে রইলেন রামনারায়ণ।

রাজনারায়ণ আবার বললেন, সারাজীবন আমি তোমাদের জন্যে সাধ্যমত করেছি কোনরকম প্রতিদানের আশা না করেই। তবু তোমরা আমাকে কতখানি শ্রদ্ধাভক্তি কর তা আমার জানা নেই। তবে আমি যে কামধেনু—ইচ্ছে মতই যা ইচ্ছে দুয়ে নেওয়া চলে, সে সম্বন্ধে তোমাদের ধারনা অত্যন্ত সজাগ, তা আমি জানি।

—এ আপনি কি বলছেন দাদা?

—অন্যায় কিছু বলিনি। এই যে তুমি এসেছ, টাকার প্রয়োজনে নয় কি? জান রাম, সত্যি কথা বলতে কী তোমাদের ওপর আমার একটা বিতৃষ্ণা জন্মে

গেছে। এক এক সময় আমার ইচ্ছে করেছে, তোমাদের সকলকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে আমার সমস্ত কিছু কোন হাসপাতালে বা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে যাই।

থামলেন রাজনারায়ণ। মন তাঁর কয়েকদিন থেকেই হাল্কা হয়ে উঠেছিল। তাই এখন রামনারায়ণের কাছে আর নিজেকে চেপে রাখতে পারছেন না।

তিনি আবার বললেন, কিন্তু তা আমি করিনি। উইলে তোমাদের প্রত্যেকেরই বরাদ্দ আছে। শুধু তোমাদের কর্তব্যবোধ কতটা তা পরীক্ষা করবার জন্যে উইলে একটা ইঙ্গিত আমি ছেড়ে রেখেছি।

রামনারায়ণ উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালেন।

—তোমরা শুনেছ মহীতোষের পরামর্শে আমি বাবার নামে একটা ট্রাস্ট গঠন করেছি। আমার মৃত্যুর পর ওই ট্রাস্টকে তোমরা কতখানি বড় করে তুলতে পার সেইটাই হল তোমাদের পরীক্ষা।

—কিন্তু ট্রাস্টবোর্ডে আপনি আমাদের কাউকেই রাখেননি।

—আমার এ্যাটর্নির ধারনা এবং আমারও তাই বিশ্বাস, তোমাদের হাতে পড়লে ট্রাস্টকে বাঁচান যাবে না। যাই হোক, এখন বিশ্রাম কর গিয়ে। খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকেলের দিকে বাড়ি ফিরে যেও।

নিরিবিলিতে আজ দাদাকে অনেক কথা বলতে এসেছিলেন রামনারায়ণ, কিন্তু তিনি প্রথম থেকেই যে ভাবে কথা আরম্ভ করলেন তাতে বিশেষ কিছু বলার ফাঁক খুঁজে পাওয়া গেল না।

তিনি বললেন, আমি আর অপেক্ষা করব না। এখুনি ফিরে যাই বরং।

রাজনারায়ণ আর কিছু বললেন না।

রামনারায়ণ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

শ্রীনাথও এলেন পিছু পিছু তাঁর। বললেন, এতবেলায় ফিরে যাবেন ছোটবাবু? তা হল গিয়ে, খেয়ে গেলে হত না?

—এরপর আবার খাওয়া—ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন রামনারায়ণ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো শুনলে শ্রীনাথ। কথাগুলো যেন পেটের মধ্যে গজগজ করছে। আগে হজম হোক, তারপর খাওয়া।

দুপুর থেকেই ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি আরম্ভ হল।

বৃষ্টির ছোঁয়ায় শীত বেড়ে উঠল চতুর্গুণ।

বিকেল তখন পাঁচটা।

চারিধার অন্ধকার ঘুট ঘুট করছে। মনে হচ্ছে যেন কত রাত হয়েছে। রাজনারায়ণ একটা হ্যারিংটন চেয়ারে বসে বই পড়ছিলেন। শিকার কাহিনী। শিকার করতে যেমন তিনি ভালবাসেন পরের শিকারের অভিজ্ঞতা পড়তেও তাঁর তেমনি ভাল লাগে।

বইখানির মধ্যে সম্পূর্ণে ডুবে গিয়েছিলেন তিনি। কিসের একটা শব্দে

তাঁর চটকা ভাঙ্গল। মুখ তুলে দেখলেন রঞ্জন মুখার্জি দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

গায়ের জামা কাপড় জলে সপসপ করছে রঞ্জনের। চুলের ফাঁক দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে চুইয়ে চুইয়ে তাঁর গাল বেয়ে। ঠক ঠক করে কাঁপছেন তিনি।

--একী রঞ্জন! তুমি কলকাতা থেকে ফিরলে কখন?

--আজ্ঞে দুপুরে।

—যাও, যাও তাড়াতাড়ি জামা কাপড় বদলে নাও। এই বৃষ্টির মধ্যে তোমার আসা উচিত হয়নি।

রঞ্জন মুখার্জি পাশের ঘরে গিয়ে কাপড় জামা বদলালেন। সঙ্গে তিনি কিছু আনেননি। শ্রীনাথবাবুর ধুতি-সার্টই তাঁকে পরতে হল। একটা কম্বল গায়ে জড়িয়ে নিয়ে আবার পাশের ঘরে এলেন।

রাজনারায়ণ প্রশ্ন করলেন, মহীতোষের সঙ্গে দেখা হয়েছিল নাকি!

—আজ্ঞে না। তিনি কলকাতায় ছিলেন না।

—চিঠিটা ফিরিয়ে নিয়ে এসেছ?

—না। চিঠিটা ওঁর অফিসেই দিয়ে এসেছি। আপনার নির্দেশও জানিয়ে এসেছি।

রাজনারায়ণ আত্মগত ভাবেই বললেন, দেবনারায়ণের মেয়ে, সেও কী তার বাপের মত চরিত্র পেয়েছে! একরোখা আর জেদি! আমার চিঠিটা সে কী ভাবে গ্রহণ করবে কে জানে! যাক, আমি তো আর দেখতে আসছি না। আমার মৃত্যুর পর মহীতোষ তাকে দেবে চিঠিখানা। ভাল কথা, রঞ্জন আমার উইলের বিষয় নিয়ে চারিধারে কী রকম কি শুনছ?

—সকলেরই ধারনা, আপনার সমস্ত সম্পত্তি আপনি অন্য কোথাও চ্যারিটি করেছেন।

—হুঁ। চম্পার সম্বন্ধে বাড়ির লোকদের কি অভিমত?

—দেবনারায়ণবাবুর যে মেয়ে আছে একথা কেউই প্রথমে বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না। আপনি সেদিন যখন সকলকে ডেকে বললেন, দেবনারায়ণবাবুর মেয়ে চম্পাদেবী হয়ত এবাড়িতে এসে থাকতে পারেন, তখন—

—তখন?

—তখন অনেকেই আপনার আড়ালে বিরূপ মন্তব্য করেছেন—আমার কানে এসেছে।

রাজনারায়ণ কী চিন্তা করতে লাগলেন।

ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পরিপূর্ণ নীরবতা বিরাজ করল।

-তারপর —রঞ্জন?

—আজ্ঞে।

—তোমার নিজের সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলবার নেই?

রঞ্জন মুখার্জি মাথা নত করে বসে রইলেন।

—আমি জানি, সুপর্ণ আসবার পর থেকে তুমি একটু মনক্ষুণ্ণ হয়েছ।

তোমার ধারনা সুপর্ণকে আমি বেশি স্নেহ করি।

—আপনার সমস্ত কাজ আমি দীর্ঘদিন ধরে করে আসছি। তবু আপনি প্রাইভেট সেক্রেটারি অ্যাপয়েন্ট করলেন—

—খুবই অভাবের মধ্যে ছিল সুপর্ণ তাতো তুমি জান। তাই ওকে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলাম। কয়েক বছর ধরে কাজ সে ভালই করছে।

আর কোন কথা হল না।

রাজনারায়ণ আবার শিকার কাহিনীতে মন বসালেন।

কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকার পর, মন্থর পায়ে রঞ্জন মুখার্জি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঢং ঢং করে নটা বাজল একসময় দেওয়াল ঘড়িটায়।

বইটা মুড়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন রাজনারায়ণ। তখনও এক-নাগাড়ে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। শ্রীনাথকে ডেকে বললেন, বেশি রাত করে লাভ নেই। রঞ্জনকে ডাক। খাওয়া-দাওয়াটা সেরেনি।

—আজ্ঞে, তা হল গিয়ে, রঞ্জনবাবু ঘণ্টা দুয়েক আগেই চলে গেছেন।

—চলে গেছে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—গেল কি ভাবে? হেঁটেই গেল নাকি?

—গরুর গাড়ি করে স্টেশনে গেলেন। বললেন, ওখান থেকে সাড়ে আটটার ট্রেনটা ধরে নেবেন।

লাকাড়কোলার মাইল পাঁচেক দূর দিয়ে লুপলাইন চলে গেছে। ওখানে একটা স্টেশন আছে দশরথপুর। আপ ও ডাউন মিলিয়ে দুবার মাত্র প্যাসেঞ্জার ট্রেনের দেড় মিনিট করে স্টপেজ আছে এখানে।

আত্মগত ভাবে রাজনারায়ণ বললেন, আমাকে না বলেই চলে গেল! আশ্চর্য!

অনেক রাত্রি হবে তখন।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল শ্রীনাথ পালের।

কিসের একটা শব্দ হল যেন!

কান খাড়া করে রইলেন তিনি। তখনও বৃষ্টি হয়ে চলেছে। আর কোন শব্দ পাওয়া গেল না। নিশ্চয়ই মনের ভুল।

শ্রীনাথ পাল লেপটা আবার ভাল করে গায়ে টেনে নিয়ে পাশ ফিরে শুলেন। সবে তন্দ্রা এসেছে—আবার একটা শব্দ পাওয়া গেল। মনে হল ছপ ছপ করে কে একজন জলে ভেজামাটির ওপর দিয়ে দৌড়ে চলে গেল। নিশ্চয়ই কোন দলহারা নেকড়ে। খাবারের সন্ধান করে বেড়াচ্ছে।

শ্রীনাথ পাল ঘুমের রাজ্যে প্রবেশ করলেন।

ঘুম ভাঙ্গল তাঁর বেশ বেলায়।

বৃষ্টি আর হচ্ছে না। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। চারিদিকে

রোদ্দুর ঝলঝল করছে।

ব্যস্ততার সঙ্গে বিছানা থেকে উঠে পড়লেন শ্রীনাথ।

কর্তা নিশ্চয়ই অনেক আগেই উঠেছেন। তিনি তাঁর সম্বন্ধে কি ভাবছেন কে জানে?

ঘরের বাইরে এসে দেখলেন তখনও রাজনারায়ণ ওঠেননি। থাক্—।

কিন্তু এত বেলা অবধি ঘুমবার তো কথা নয় তাঁর। সূর্য দেখা দেবার আগে প্রতিদিন বিছানা ছেড়ে ওঠা তাঁর অভ্যাস।

কাল সারা রাত্রি ঘুম কি তাঁর হয়নি? অসুস্থতা বোধ করেছিলেন? শেষ রাত্রির দিকে ঘুম আসায় এখনো ঘুম ভাঙেনি তাঁর—তাই কি?

চিন্তিত ভাবে কর্তার ঘরে প্রবেশ করলেন শ্রীনাথ।

রাজনারায়ণ বিছানার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছেন।

শুয়ে থাকার ভঙ্গিটা কিন্তু অস্বাভাবিক বলে মনে হল শ্রীনাথ পালের। তিনি দেহ স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন।

কনকনে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে রাজনারায়ণের শরীর। বুকের স্পন্দনের চিহ্নমাত্র নেই।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন শ্রীনাথ পাল।

তার অনুমান করতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হল না—রাজনারায়ণ অনেকক্ষণ আগেই মারা গেছেন।

॥ দশ ॥

নিজের কাহিনী শেষ করলেন শ্রীনাথ পাল।

বাসব ও শৈবাল তন্ময় হয়ে শুনছিল।

টেবিলের ওপর মোটা একটা খাতা রাখা ছিল। শ্রীনাথ ওতেই কী সব লিখছিলেন ওদের আসার আগে। বাসব রাজনারায়ণ প্রসঙ্গ আর না তুলে, খাতার দিকে তাকিয়ে বলল, বাঃ, আপনার হাতের লেখাটি তো বেশ?

শ্রীনাথবাবুর মুখে মোলায়েম একটা হাসি দেখা গেল।

সকলেই আমার হাতের লেখার প্রশংসা করে।

—আপনার লেখার অভ্যাস আছে নাকি, মানে·· এই সাহিত্য-টাহিত্য করা।

-ইয়ে ·· মানে ··

—যে ভাবে গুছিয়ে গল্পটা বললেন তাতে মনে হয় আপনি লিখতে পারেন।

সারা বুককে মথিত করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল শ্রীনাথবাবুর।

- চেষ্টা তো করেছিলাম, তা হল গিয়ে, হল আর কই। এখন পাড়ার ছেলে ছোকরারা ধরলে-টরলে কোন সভা-সমিতির জন্যে গান টান লিখে দিই।

-কিছু যদি মনে না করেন—বাসব বলল, আপনার কবিতার খাতাগুলো আমায় দেখাবেন।

একটু ইতস্ততঃ করে শ্রীনাথ বললেন, আমার কবিতার খাতা একটাই। ত হল গিয়ে শ-তিনেক পাতার বাঁধান খাতা।

—আমি অবশ্য কবিতার বিশেষ কিছু বুঝি না। তবু যদি দেখান, তাহলে…

টেবিলের ড্রয়ারটা টানলেন শ্রীনাথ পাল। তারপর তার মধ্যে হাত চালিয়ে দিলেন কবিতার খাতাটা বার করে আনবার জন্যে। একী—কোথায় খাতাটা!

খোঁজাখুঁজি করে সেখানা ড্রয়ারের মধ্যে পাওয়া গেল না।

চিন্তিত কণ্ঠে শ্রীনাথ পাল বললেন, তা হল গিয়ে, খাতাটা আমি এখানেই রেখেছিলাম, গেল কোথায়?

—ঘরের অন্য কোথাও থাকতে পারে। অন্যমনস্ক ভাবে ড্রয়ার থেকে বার করে আর কোথাও রেখে থাকতে পারেন।

ঘরের চতুর্দিকে খাতার সন্ধান করলেন শ্রীনাথবাবু। শেষে সেখানা পাওয়া গেল একটা তাকের পিছন দিকে।

—এই দেখুন, তা হল গিয়ে, খাতাটা ওখানে গেল কি করে?

শ্রীনাথ পালের কণ্ঠ থেকে উত্তেজনা ঝরে পড়ল।

বেশ মোটা, কালো লেদার বাইন্ড করা খাতাটা।

বাসব খাতাটা হাতে নিয়ে বলল, ইঁদুরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল হয়ত।

—সেকী মশাই! তা হল গিয়ে, ইঁদুর ড্রয়ার খুলে খাতাখানা ওখানে বয়ে নিয়ে যাবে? বাসব সে কথার উত্তর না দিয়ে খাতার পাতা উল্টাতে লাগল। সুন্দর ছাঁচের অক্ষরে পাতার পর পাতা কবিতা লেখা। প্রতিটি কবিতার তলায় তারিখ দেওয়া। পেজ নম্বর দেওয়া রয়েছে ওপরে।

পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় এসে থামল বাসব। পাতার নম্বর সেখানে ১৩০ অথচ পরের পাতার নম্বর ১৩৪।

বাসব বলল, এখানে গোটাকতক পাতা নেই মনে হচ্ছে।

—কই দেখি!—শ্রীনাথবাবু খাতাটা দেখে বললেন, তা হল গিয়ে, পাতা ছেঁড়া থাকবার তো কথা নয়! আমার খাতাটা নিয়ে তা হল গিয়ে কে যে এইভাবে নয়-নয় ছয়-ছয় করেছে, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

—আপনি কবিতা লিখতে পারেন, একথা বাড়ির সকলে নিশ্চয়ই জানেন?

—তা হল গিয়ে, তা জানা আছে সকলের বৈকি।

বাসব উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনাকে অনেকক্ষণ ধরে বিরক্ত করলাম শ্রীনাথবাবু। এবার আমরা চলি। এস ডাক্তার।

হতভম্ব শ্রীনাথ পালের সামনে দিয়ে ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ফেরার পথে শৈবাল বলল, তুমি তো ভানুমতীর খেল দেখালে হে?

-কেন?

—শ্রীনাথবাবু লিখতে পারেন, তা তুমি জানলে কি করে? অনেকেই

গুছিয়ে গল্প বলতে পারে, তাই বলে সবাই কিন্তু লেখক নয়।

—চম্পাদেবী যে কবিতা লেখা কাগজটা পেয়েছেন, তাতে যে হস্তাক্ষর আছে তার সঙ্গে শ্রীনাথবাবুর হাতের লেখার অদ্ভুত মিল দেখলাম। আন্দাজে তাই ঢিলটা ছুঁড়ে ছিলাম। লেগেও গেল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কবিতার খাতা থেকে পাতাগুলো ছিঁড়ল কে?

—শ্রীনাথবাবু নিজেও ছিঁড়ে থাকতে পারেন।

—তা অবশ্য পারেন। তবে মনে হচ্ছে তা তিনি ছেঁড়েননি।

শৈবাল বলল, কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না।

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, কি কথা?

—তুমি রাজনারায়ণের মৃত্যু নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন?

—ঘামাতাম না; যদি তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে ক্লোরিনের সম্পর্ক না থাকত।

চম্পাকে আর একলা শুতে হচ্ছে না। যথা নিয়মে রাধা রাত্রে আসছে শুতে। চম্পা খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরে এল সাড়ে নটার পর।

কিছুক্ষণের মধ্যে রাধাও ঘরে এল। নিজের বিছানাটা মেঝেতে পাততে পাততে সে বলল, সকালে উঠে দেখি দরজা খোলা ছিল। আপনি রাত্রে কোথাও বেরিয়েছিলেন দিদিজী?

একটু চুপ করে থেকে চম্পা বলল, হ্যাঁ। বেরিয়েছিলাম একবার।

—রাত্রে বেরুবেন না। কখন কী হয় বলা যায় না।

চম্পা অকারণেই রেগে উঠল, তোর এত কথায় কাজ কী!

আবার কী ভেবে বলল, দেখ রাধা, আমি রাত্রে বাইরে গিয়েছিলাম একথা কাউকে বলবি না, বুঝলি?

—আচ্ছা, দিদিজী।

—নে শুয়ে পড়।

চম্পা আলো নিভিয়ে দিল।

রাত্রি তখন অনেক হবে।

ঘুম ভেঙ্গে গেল রাধার।

আজ গরমটা যেন বেশি পড়েছে। ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে রাধার। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে। বিছানায় উঠে বসল সে।

জানলার কাচ ভেদ করে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরে। ঘরের অন্ধকার তাই অনেক তরল। খাটের দিকে তাকাল রাধা। কেউ নেই সেখানে। বিছানা খালি।

সে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজা খোলা। ভেজান রয়েছে শুধু।

চম্পা ঘরে নেই। মনে মনে হাসল রাধা।

বড় আলোটা জ্বেলে সে সোরাইয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কাচের গেলাসটা

তুলে নিয়ে জল ঢালল তারপর।

চম্পা তাকে অনুমতি দিয়েছে, তেষ্টা পেলে সোরাই থেকে জল ঢেলে খেতে। একটা কাচের গেলাসও আনিয়ে দিয়েছে তার জন্যে।

গেটের পাশে সাইকেলটা দাঁড় করান রয়েছে।

বাসব রাস্তার অপর প্রান্তে একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে, তাকিয়ে আছে রাজনারায়ণ লজের গেটের দিকে।

আধ ঘণ্টার ওপর ও দাঁড়িয়ে আছে এখানে। শৈবাল সঙ্গে নেই। প্রায় রোজই রাত জেগে ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে। তাই আজ ইচ্ছে করেই শৈবালের ঘুম না ভাঙ্গিয়ে রাত্রের অভিযান শুরু করেছে বাসব।

চাঁদের আলোয় বিরাট রাজনারায়ণ লজের ওপর একটা রুপালী আস্তরণ পড়েছে। প্রথমে ও ঠিক করেছিল বাগানের পাঁচিল টপকে ভেতরে প্রবেশ করবে। কিন্তু কী মনে হওয়ায় একবার গেটের দিকে আসতেই ও লক্ষ্য করল, বিরাট গেটটা আধখোলা অবস্থায় রয়েছে। আর একটা সাইকেল দাঁড় করান রয়েছে তার একটু এধারে।

বাসব আগেই খবর পেয়েছিল, রাত্রে কোন কালেই গেটে দারোয়ান থাকেনি। কিছুদিন আগে অবধি দুটো কুকুরকে ছেড়ে দেওয়া হত বাগানে। কিন্তু তারা মরে যাওয়ার পর আর কোন নতুন ব্যবস্থা হয়নি।

এই সময় দুজন লোক গেটের সামনে এসে দাঁড়াল।

'মরনিং গ্লোরি'র লতায় ছাওয়া গেটের কাছটা প্রায় অন্ধকার। আগন্তুকদের ভাল করে দেখা যাচ্ছে না।

মিনিট কয়েক ওখানে দাঁড়িয়ে ওদের কথা হল। তারপর একজন বাড়ির দিকে চলে গেলে, দ্বিতীয়জন সাইকেলটার কাছে এসে দাঁড়াল। সাইকেলটা হাতে নিয়ে দু'পা এগিয়ে তাতে চড়বার উপক্রম করতেই আগন্তুক যেন বুঝতে পারল কী একটা অঘটন ঘটেছে। সে নিচু হয়ে সাইকেলের পিছনের চাকাটা পরীক্ষা করল।

বাসব আগেই পিছনের চাকাটা সেফটিপিন দিয়ে পাংচার করে রেখেছিল। কিন্তু এখানে আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। যা দেখবার সে দেখেছে।

আগন্তুক সাইকেলের শোচনীয় অবস্থার কথা বিবেচনা করে আর তাতে চড়ল না। হ্যান্ডেলটা ধরে শুধু সাইকেলটাকে টেনে নিয়ে চলল। আগন্তুক এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাসব দ্রুত পায়ে রাস্তার এ প্রান্ত দিয়ে তাকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেল। খুব বেশি দূরে এগিয়ে যেতে হল না ওকে।

রাস্তা কিছু দূরে সোজা যাবার পর যেখানে বাঁক নিয়েছে—সেই বাঁকের মুখ থেকে খানদশেক বাড়ির পরের যে লাল রংএর একতলা বাড়িখানা দেখা গেল তার সামনে এসে থামল ও।

অত্যন্ত দ্রুত আসার জন্যে হাঁপাচ্ছিল বাসব। পকেট থেকে রুমাল বার

করে মুখটা মুছে নিল। একটা থামের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল তারপর।

অত্যন্ত সতর্ক ভাবে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে চলেছে চম্পা।

প্রতি পদক্ষেপেই ওর বুক ভয়ে দুরু দুরু করছে। যদি কেউ দেখে ফেলে। এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিল ও, সে প্রশ্ন কি তার মনে জাগবে না?

সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়াল চম্পা।

এবার শুধু বারান্দাটুকু পার হলেই ওর ঘর।

দ্রুত পদে এগিয়ে চলল চম্পা—কিন্তু ঘরে ঢোকবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ঝনঝন করে কাচ ভাঙ্গার শব্দ ওকে বিভ্রান্ত করে তুলল।

শব্দটা এল ওরই ঘর থেকে!

সজোরে দরজাটা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল ও।

এ কী

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল চম্পা।

মিনিট কয়েক পার হয়েছে বোধহয়।

বাসব থামের আড়াল থেকে দেখতে পেল, আগন্তুক সাইকেলটা টানতে টানতে এসে পৌঁছাল। পকেট থেকে চাবি বার করে, সাইকেলটা একপাশে দাঁড় করিয়ে, সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

বড় সাইজের একটা তালা ঝুলছে দরজায়।

আগন্তুক চাবি দিয়ে তালা খোলার উপক্রম করল—

বাসব থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বলল, একটু অন্ধকার মনে হচ্ছে যেন, দাঁড়ান, আমি দেশলাইটা জ্বালি।

আগন্তুক ঘুরে দাঁড়াল। তার হাত থেকে চাবিটা পড়ে গেল।

সে অসংলগ্ন কণ্ঠে বলল, একী! মিঃ ব্যানার্জি, আপনি এসময় এখানে?

চাবিটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে বাসব বলল, আমার গতিবিধির কি নিয়মসম্মত পথ আছে ডাঃ রায়?

ডাঃ রায় এবার নিজেকে সংযত করে নিয়েছেন।

বললেন, কলে গিয়েছিলাম। এই ফিরছি।

—ব্যাগ না নিয়েই কাল গিয়েছিলেন! স্টেথিস্কোপটাও তো দেখতে পাচ্ছি না?

ডাঃ রায় কি বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই আবার বাসব বলল, মিথ্যের জাল বুনে লাভ নেই ডাঃ রায়। আমি জানি আপনি কোথায় গিয়েছিলেন, কার সঙ্গে কথা বলেছিলেন—আমিও রাজনারায়ণ লজেই ছিলাম।

ভীত সন্ত্রস্ত চোখে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন ডাঃ রায়।

বাসব তালাটা খুলে বলল, আসুন ভিতরে যাওয়া যাক।

চৌকাঠের কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চম্পা।

রাধার দেহটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে একধারে। কাচের গেলাসটা ভেঙ্গে গেছে। টুকরোগুলো ছড়িয়ে পড়েছে চারিধারে। গেলাসের কাছে কিছুটা জায়গা জলে জলময়।

একী কাণ্ড!

নিজের আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়ে চম্পা ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

দৌড়াতে দৌড়াতে বারান্দা পার হয়ে, ইন্দ্রনারায়ণের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে দরজায় করাঘাত করল বার কতক।

ইন্দ্রনারায়ণ দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এত রাত্রে চম্পাকে দেখে তিনি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে মা?

—কাকাবাবু, আমার ঘরে······কথাটা শেষ করতে পারল না চম্পা।

—কি হয়েছে তোমার ঘরে?

—রাধা—রাধা কী রকম ভাবে পড়ে রয়েছে। অজ্ঞান হয়ে গেছে বোধহয়।

—সেকী! চল, চল দেখি—।

দুজনে দ্রুত পায়ে চম্পার ঘরে এলেন।

রাধার দেহটা ঠিক সেই ভাবেই পড়ে রয়েছে।

—তাইতো, একী কাণ্ড!

ইন্দ্রনারায়ণ ঝুঁকে রাধার পালস্‌টা দেখলেন।

তারপর গম্ভীর ভাবে বললেন, পালস্ পাওয়া যাচ্ছে না।

—কি বলছেন কাকাবাবু?

—বোধহয় মেয়েটা মারা গেছে।

—মারা গেছে!

—তুমি এ ঘরে আর কিছু ছোঁয়াছোঁয়ি কর না। আমি পুলিশে খবর দিচ্ছি।

—পুলিশ? কেন? চম্পা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

ইন্দ্রনারায়ণ চিন্তাযুক্ত গলায় বললেন, ও যদি সত্যি মারা গিয়ে থাকে—মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয় বলেই আমার মনে হচ্ছে।

তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

খবরটা রাষ্ট্র হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

সকলেই প্রচুর উৎকণ্ঠা নিয়ে চম্পার ঘরের সামনেকার বারান্দায় এসে জড়ো হলেন।

রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে আসছে।

পূর্বদিকের আকাশে লাল ছোপ ধরতে আরম্ভ করেছে।

খবর পেয়েই পুলিশ এসে পড়ল।

ইন্সপেক্টার লালচাঁদ দেহটি পরীক্ষা করলেন। দেহে প্রাণ নেই।

বেশ কিছুক্ষণ আগেই মারা গেছে রাধা।

ইন্সপেক্টার সকলকেই কিছু কিছু প্রশ্ন করলেন। কেউই এ ব্যাপারে কোন আলোকপাত করতে পারলেন না।

সাতটার সময় বাসবকে সঙ্গে নিয়ে কুলদীপ মেহরা এলেন।

চম্পার ঘরে তখনও মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। বাসব মৃতদেহের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে দেহটা পরীক্ষা করল ও।

মিঃ মেহরা প্রশ্ন করলেন, কিসে মারা গেছে বলে আপনার মনে হয়?

--পটাসিয়াম সাইনাইডে।

—কি করে বুঝলেন?

বাসব বলল, মৃতদেহের পজিশন দেখুন। সোরাইয়ের কাছেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। ভাঙ্গা কাচের গেলাস। চারিদিকে জল ছড়িয়ে পড়েছে। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, সোরাই থেকে জল গড়িয়ে খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে। নইলে মৃতদেহ ওই ভাবে পড়ে থাকত না। সায়নাইড ছাড়া এত দ্রুত মৃত্যু আর কিসে হতে পারে বলুন?

—তাহলে গেলাসে আগে থাকতেই সায়নাইড মেশানো ছিল।

—সোরাইয়ের জলেও মেশানো থাকতে পারে। জলটা আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

—আপনি হয়ত ঠিকই বলছেন।

কুলদীপ মেহরা ব্যবস্থা করে মৃতদেহ পোস্টমর্টেমে পাঠালেন।

ভাঙ্গা কাচের টুকরোগুলো ও সোরাইটা সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করতে পাঠানো হল।

বাসব ঘরের চারিদিক ঘুরে ফিরে দেখছিল।

সোরাইটা রাখা ছিল একটা ছোট টুলের ওপর। সোরাইটা নিয়ে যাওয়ার পর টুলটা খালি পড়েছিল। বাসব এগিয়ে গিয়ে টুলটা পরীক্ষা করল। বহুদিন ধরে সোরাইটা তার ওপর থাকায় খানিকটা কাঠ খেয়ে গিয়ে গোল দাগ হয়ে গেছে। হঠাৎ ওর চোখে পড়ল ইঞ্চি ছয়েক লম্বা সুতো টুলের একপাশে আটকে রয়েছে।

কালো সিল্ক থ্রেড।

কী মনে হওয়ায় বাসব সুতোটা তুলে নিয়ে নিজের পকেটে রাখল। ঘরের চারিদিকটা আরেকবার ভাল করে দেখে নিয়ে ও বারান্দায় বেরিয়ে এল।

কুলদীপ মেহরা তখন সেখানে সকলের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

চম্পা এক পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর মুখ বিবর্ণ।

বাসব এগিয়ে গিয়ে বলল, মিস্ চ্যাটার্জি, আপনার ঘরের দরজা কি দিনেরবেলা খোলাই থাকে?

—হ্যাঁ।

—কাল দিনেরবেলা সমস্তক্ষণ আপনি ঘরেই ছিলেন?

—শুধু একবার খেতে গিয়েছিলাম। তাছাড়া অন্যান্য সময় ঘরেই

ছিলাম আমি।

—সন্ধ্যার সময় ?

—সন্ধ্যার সময় নিচে ড্রইংরুমে গিয়ে কাকাবাবুর সঙ্গে গল্প করেছিলাম।

—কটা থেকে কটা অবধি আপনি নিচে ছিলেন ?

একটু চিন্তা করে চম্পা বলল, নিচে ছিলাম বোধহয়, সাতটা থেকে সাড়েনটা অবধি।

—রাধা আপনার সঙ্গেই রাত কাটাত, তাই না ?

—হ্যাঁ।

—ব্যাপারটা কি হয়েছিল বলুন তো—মানে আপনি কি ভাবে দুর্ঘটনার সম্বন্ধে সচেতন হলেন ?

—আমি⋯ ⋯চম্পা ইতস্ততঃ করতে লাগল।

—বলুন। এখন প্রতিটি কথাই আমাদের কাছে মূল্যবান।

—আমি বাথরুমে গিয়েছিলাম। হঠাৎ কাচ ভাঙ্গার শব্দে, বেরিয়ে এসে দেখি রাধা সোরাইয়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে।

আর কোন প্রশ্ন করল না বাসব।

মিঃ মেহরার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি বোধহয় এখানে অপেক্ষা করবেন ?

—একটু অপেক্ষা করতে হবে। সকলের কাছ থেকে জবানবন্দীটা এখনো নেওয়া হয়নি।

—আমি এখন চলি। সন্ধ্যার পর থানায় আসছি।

নিচে নেমে এল বাসব।

সিঁড়ির মুখেই রামনারায়ণবাবু দাঁড়িয়েছিলেন। উনিও বোধহয় ওপর থেকে নেমে এসেছেন এই মাত্র!

ওকে দেখে রামনারায়ণবাবু বললেন, এসব কি হচ্ছে মশাই আমাদের বাড়িতে ? বাসব কিছু না বলে একটা সিগারেট ধরাল।

—আমি ভেবেছিলাম, আপনি যখন এসে পড়েছেন তখন সমস্ত কিছুর সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু এখন দেখছি⋯⋯

কথা শেষ করলেন না রামনারায়ণ। তাঁর কথায় শ্লেষের আভাস পাওয়া গেল।

—কিন্তু এখন দেখছেন পরিস্থিতিটা আরো গোলমেলে হয়ে উঠল ?—মৃদু হেসে বাসব তাঁরই কথাটা শেষ করল।

—কেন, আমি কি কিছু অন্যায় বলছি ?

—না। তবে পরিস্থিতি আর বেশিদিন গোলমেলে থাকবে না।

ব্যগ্রতায় ভেঙ্গে পড়লেন রামনারায়ণ, আপনি জানেন কে এই সব কাজ করছে ? কি নাম তার ?

—ব্যস্ত হবেন না মিঃ চ্যাটার্জি। আপনাকে তার নাম জানাবার আগে,

আপনার কাছে যে আমার আরো একটা প্রশ্ন রয়েছে।

—আমার কাছে !! আবার কি প্রশ্ন ?

—প্রশ্নের কী আর শেষ আছে।

—বলুন।

বাসব থেমে থেমে বলল, ক্লোরিন গ্যাসের ফ্লাস্ক দুটো কবে খোয়া গেছে, তার সঠিক তারিখটা জানতে চাই।

—এ ···এসব আপনি কি বলছেন ?

—কেন, আপনার তো বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয় ?

—ক্লোরিনের ফ্লাস্ক···মানে···

—অবুঝ হবার চেষ্টা করে লাভ নেই মিঃ চ্যাটার্জি।

—কিন্তু·

সিগারেটে একটা দীর্ঘটান দিয়ে বাসব বলল, কাল রাত্রে ডাঃ রায়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে চুপসে গেলেন রামনারায়ণ। কে যেন ব্লটিং পেপার দিয়ে তাঁর মুখের সমস্ত রক্ত শুষে নিল।

-ডাঃ রায় ! কি ···কি বলেছেন তিনি ?

—যা তিনি জানেন।

এবার সম্পূর্ণ ভেঙে পড়লেন রামনারায়ণ। বললেন, আমায় বাঁচান বাসববাবু।

—বাঁচবার চাবিকাঠি আপনারই হাতে।

রামনারায়ণ কিছু বলার অবকাশ পেলেন না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন এই সময় জয়ন্ত চৌধুরী আর মহীতোষ মিত্র।

জয়ন্ত চৌধুরী বললেন, জামাইবাবু, আপনি এখানে ? ওপরে যান। মিঃ মেহরা আপনার খোঁজখবর করছেন।

রামনারায়ণ ওপরে চলে গেলেন।

বাসব বলল, পোস্ট অফিসে যাব ভাবছি। একটা রিক্সা করে নিলেই যাওয়া যাবে কি বলেন ? আমার আবার পথটা জানা নেই।

জয়ন্ত চৌধুরী কিছু বললেন না।

মহীতোষ মিত্র বললেন, চলুন, আমি আপনাকে পথ দেখাচ্ছি। আমাকে ওধারেই যেতে হবে।

রাজনারায়ণ লজ থেকে বেরিয়ে দুজনে একটা রিক্সা ভাড়া করলেন।

বাসব বলল, এই সমস্ত গোলমালে আপনার কাজের খুব ক্ষতি হচ্ছে নিশ্চয়ই ?

—হচ্ছে বৈকি। রোজই কলকাতা থেকে চিঠি আসছে। এখানে আমি যত ডিটেন হচ্ছি—মক্কেলদের কাজ পেণ্ডিং থেকে যাচ্ছে তত বেশি।

—আমার মনে হয় দু-একদিনের মধ্যেই এখানকার গোলমাল মিটে যাবে।

—আপনি হত্যাকারীর সন্ধান পেয়েছেন ?

বাসব হাসল।

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, আচ্ছা মিঃ মিত্র, ধরুন, যারা রাজনারায়ণবাবুর উইলে টাকা পেয়েছেন, তাঁরা যদি আবার নিজেরা উইল করে মারা যান, তাহলে সে উইল ভ্যালিড হবে কি না ?

একটু ভেবে নিয়ে মিঃ মিত্র বললেন, নিশ্চয়ই হবে। এ পয়েণ্টটা তো আমার বা রাজনারায়ণবাবুর, কারুরই মাথায় আসেনি মিঃ ব্যানার্জি।

—অথচ পয়েণ্টটা কত স্বাভাবিক।—বাসব বলল, আপনি আমায় ফলো করছেন নিশ্চয়ই? উইলে আছে, যদি কেউ মারা যায়, উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করে বা গুরুতর বেআইনী কাজ করে তার সম্পত্তি রায়নারায়ণ ট্রাস্টে যাবে।

—হ্যাঁ। ঠিক তাই।

—সাপোজ X নিজের সম্পত্তি Z-র নামে উইল করে, উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করতে লাগল। তখন X-কে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে কি ?

—তা যাবে। তবে Z সম্পত্তির মালিক হয়ে যাবে।

বাসব সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করতে করতে বলল, উইলের মধ্যে আইনের ফাঁক রয়েছে ওখানেই। আমাদের এখানে ভুলে গেলে চলবে না, X Z-রই মনোনিত ব্যক্তি।

—তাহলে উপায় ?

—আমাদের এখন দৃষ্টি রাখতে হবে এরকম সুযোগ কেউ নিচ্ছে কী না। —বাসব সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল, হ্যাভ ইট—

—নো থ্যাংকস। —মহীতোষ মিত্র বললেন, যে উইল পাল্টাবে, সে যদি আমার সাহায্য না নিয়ে অন্য ভাবে····

—তা কী করে সম্ভব। রাজনারায়ণবাবুর উইলে আছে, আইনঘটিত সমস্ত ব্যাপারে আপনাদের কোম্পানির সাহায্য নিতে হবে।

—তাও তো বটে। আপনি হঠাৎ পোস্ট অফিসে চলেছেন ?

—পোস্টমাস্টারের কাছে যেতে হবে একবার। কিছু কাজ আছে। আপনি কোথায় যাচ্ছেন মিঃ মিত্র ?

—চশমার দোকানে যাব। দেখুন না, কাল রাত্রে চশমাটা বিছানায় খুলে রেখেছিলাম, বালিশের চাপে একটা লেন্স ফেটে গেছে।

চশমাটা পকেট থেকে বার করে দেখালেন তিনি।

পোস্ট অফিস প্রায় এসে পড়েছিল। বাসব বলল, সুপর্ণবাবুর সম্পত্তি এখন নিশ্চয়ই রায়নারায়ণ ট্রাস্টে যাবে ?

—উইলের সর্ত অনুসারে তাই যাবে।

রিক্সা থামল। সামনেই পোস্ট অফিসের লাল বাড়িটা।

বাসব নেমে পড়ল রিক্সা থেকে। মিঃ মিত্রও নামলেন।

মহীতোষ বললেন, আপনি নিজের কাজ সেরে আসুন। আমি বরং ততক্ষণে আমার কোন চিঠি-পত্র আছে কিনা দেখে নিই।

বাসব পোস্টমাস্টারের উদ্দেশে রওয়ানা হল।

ওকে খুব বেশি দূর যেতে হল না, দেখা গেল ইন্সপেক্টার লালচাঁদ দ্রুত পায়ে ওর দিকেই আসছেন।

—কি হল ?

ইন্সপেক্টার বললেন, আপনার কথামত পোস্টমাস্টারের কাছে গিয়েছিলাম।

—তারপর ?

—তিনি খাতাপত্তর ঘেঁটে বললেন, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আজ পর্যন্ত কোন পার্শেল মুঙ্গের পোস্ট অফিসে আসেনি।

—হুঁ। তাহলে ?

—এখন আপনিই বলুন কি করা যায় ?

বাসব চিন্তিত ভাবে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল। লালচাঁদ ওকে অনুসরণ করলেন। মহীতোষ মিত্র একধারে দাঁড়িয়ে চিঠি পড়ছিলেন।

ওদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, এই দেখুন আবার এক তাগাদা এসেছে। ট্রাস্ট কমিটির মিটিং না গেলেই নয়।

লালচাঁদ বললেন, আপনি অবশ্য যেতে পারেন। পরে সমস্ত গোলমাল মিটে গেলে, আইনঘটিত ব্যাপারটা মিটিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

বাসব বলল, এ পরামর্শ মন্দ নয়। আপনি দু-একদিনের মধ্যেই চলে যেতে পারেন। —রায়নারায়ণ ট্রাস্টের মিটিং বোধহয় ?

—হ্যাঁ। আমি আবার তার চেয়ারম্যান।

এই সময় দেখা গেল পোস্ট অফিসের গেট পেরিয়ে রঞ্জন মুখার্জি হন হন করে এগিয়ে আসছেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল এদিকে।

কেমন যেন থতমত খেলেন তিনি।

উপযাচক ভাবেই আমতা আমতা করে বললেন, এই ডাকটা দেখতে এসেছি। কোন চিঠি আছে কিনা আমার নামে—

বলতে বলতে তিনি অন্যধারে অদৃশ্য হলেন।

লালচাঁদ আর বাসবের মধ্যে একবার দৃষ্টি বিনিময় হল।

॥ এগারো ॥

সিগারেটের স্তূপের সামনে বসে রয়েছে বাসব।

কপালে ওর গভীর চিন্তার রেখা। শৈবাল ঘরে প্রবেশ করল।

বসতে বসতে শৈবাল প্রশ্ন করল, কি হে, কতদূর ?

বাসব রাবীন্দ্রিক স্টাইলে বলল, আর নহে বেশি দূর।

—তরী তাহলে এবার পাড়ে ভিড়বে।

—হুঁ। এসো ডাক্তার, ওবিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, যে দুজন খুন হল, তারা কেউই চাটুয্যে পরিবারের কেউ নয়। আর এও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে খুন দুটি হয়েছে চম্পাদেবীকে ঘিরেই।

—অর্থাৎ—?

—অর্থাৎ যারা খুন হয়েছে, তারা দুজনেই চম্পাদেবীর কাছাকাছির লোক। কৃষ্ণাদেবী তাঁর আত্মীয়া এবং রাধা তাঁর পরিচারিকা।

—তাইতো!

বাসব সিগারেটের টুকরোটা অ্যাসট্রেতে ফেলে দিয়ে বলল, আমি স্থির নিশ্চিত হয়েছি হত্যাকারী ওদের দুজনকে হত্যা করতে চায়নি।

—তবে।

—তার টার্গেট হল চম্পাদেবী। কিন্তু দুবারই সে টার্গেট মিশ করেছে।

শৈবাল আশ্চর্য হয়ে বলল, এরকম মিশ হত্যাকারীর হল কি ভাবে?

—শোন, এই দুটো হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আমি অনেক ভেবে চিন্তে মোটামুটি একটা থিওরি খাড়া করেছি। যে কোন কারণেই হোক হত্যাকারী, চম্পাদেবীকে হত্যা করার মনস্থ করে এবং এই ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে সে রাধাকে বেছে নেয়।

—কি বলছ তুমি? রাধাকে—!

—হ্যাঁ, এবিষয় আমার কোন দ্বিমত নেই। আমি বলছি, কেন আমি নিশ্চিন্ত হলাম। প্রথমদিন মাঝরাত্রে যখন কাচ ভাঙ্গার শব্দে চম্পাদেবীর ঘুম ভাঙ্গল তখন তিনি কারুর কাছ থেকে সাহায্য নেবার জন্যে বারান্দায় ছুটে গেলেন। হত্যাকারীর উদ্দেশ্য সফল হল। কারণ কাচের জানলা ভাঙ্গার উদ্দেশ্যই ছিল, চম্পাদেবীকে ঘর থেকে কয়েক মিনিটের জন্যে বার করে দেওয়া, আর সেই ফাঁকে রাজনারায়ণের লেখা চিঠিখানা চুরি করে আনা। স্বাভাবিক ভাবেই হত্যাকারী আশা করেছিল, চিঠিখানা টেবিলের ওপরই থাকবে। কিন্তু সেখানা ছিল বালিশের তলায়। যাই হোক, চম্পাদেবী ভয় পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাধা ঘরে ঢুকে রাজনারায়ণের চিঠি মনে করে টেবিলের ওপর রাখা খামে মোড়া পরিচয় পত্রটা নিয়ে সরে পড়ল। খামখানা হাতে পেয়েই হত্যাকারী গলদ বুঝতে পারল। সৌভাগ্য ক্রমে সুযোগ আবার এসে গেল। সুপর্ণবাবু কলিংবেল বাজাবার পর রাধা আবার এসে উপস্থিত হল। রাধার ওপর আমার সন্দেহ হবার অন্যতম কারণ হল, গভীর রাত্রে সে নিশ্চয়ই জেগে বসেছিল না—ঘুমচ্ছিল। কাজেই একবার কলিংবেল বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে, কারুর উপস্থিত হবার আগেই তার উপস্থিতি সন্দেহজনক। কিন্তু রাত্রে চম্পাদেবী ঘুমিয়ে পড়ার পর অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সে চিঠিখানা পায়নি। না পাবারই কথা।

—চিঠিখানা হত্যাকারী কেন চুরি করতে চেয়েছিল ?

—আমার মনে হয়, চম্পাদেবীর সঙ্গে সুপর্ণবাবুর বিয়ের যে কথাটা আছে। হত্যাকারী চায়নি চম্পাদেবী তা জানতে পারুন। বোধহয় সে জানত না, রাজনারায়ণ সুপর্ণবাবুকেও একটা চিঠি দিয়ে গেছেন ওই সম্বন্ধে।

—তুমি তাহলে সুপর্ণবাবুকে সন্দেহ করছ না ?

—তারপর শোন, হত্যাকারী নিজের প্ল্যান অনুসারে কাজ আরম্ভ করল কলেজ রোডের বাড়িতে বাগানপার্টির দিন। চম্প্যাদেবী, সুপর্ণবাবু, কৃষ্ণাদেবী একই জায়গায় বসেছিলেন। এক সময় কৃষ্ণাদেবী উঠে গেলেন। ক্রমে সুপর্ণবাবু ও সবশেষে চম্পাদেবীও স্থান ত্যাগ করলেন। এদিকে কৃষ্ণাদেবী নিশ্চয়ই বেড়াতে বেড়াতে বাগানের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলেন। শুনেছি বাগানের একধারটা শালগাছের জঙ্গল। স্থানটা অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকাই স্বভাবিক। কৃষ্ণাদেবী সেখানে গিয়ে পড়লে হত্যাকারী তাঁকে শক্ত কিছু দিয়ে কাঁধে আঘাত করে। তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে হত্যাকারী নিজের ভুল বুঝতে পারে। আগের দিন একই রকম দুখানা শাড়ি চম্পাদেবী বাজার থেকে কিনে এনেছিলেন। সেই শাড়ি দুখানাই তারা তখন পরেছিলেন। কাজেই হত্যাকারী ওই মারাত্মক ভুলের মধ্যে গিয়ে পড়ে।

—এই শাড়ির ইতিহাস তুমি জানলে কি করে ?

—কিছুক্ষণ আগে গিয়ে চারুলতাদেবীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। কথা প্রসঙ্গে তিনিই বললেন।

—বেশ, তোমার কথাই মানলাম। যদি ভুল করেই কৃষ্ণাদেবীকে হত্যাকারী হত করে থাকে, তাহলে তাঁকে আবার হত্যা করবার কি দরকার ছিল তার ?

—দরকার ছিল। কারণ, নিশ্চয়ই কৃষ্ণাদেবী আহত হবার পূর্ব মুহূর্তে হত্যাকারীকে দেখে ফেলেছিলেন। হত্যাকারী তা বুঝতে পেরেই, তাঁর মুখবন্ধ করবার জন্যে তাঁকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল।

—তারপর তাঁর দেহটা কোনরকমে ওই ঝোপের মধ্যে বয়ে নিয়ে গিয়ে গ্যাস প্রয়োগ করা হয়, এই কথা তুমি বলতে চাও ?

—কোনরকম কথাটায় আমার আপত্তি আছে—বাসব বলল, অবশ্যই দেহটা মোটরে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দিন দুপুরে একটা অচেতন দেহ এতখানি রেস্তে সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়া মোটরকার ছাড়া আর কিসে সম্ভব ?

—এদিকটা যাহোক একরকম হল।—শৈবাল বলল, আরো প্রবলেম আমার মনে রয়েছে। এক, সেই অদ্ভুত কবিতা। দুই, কোকা মিক্সচারের সিগারেট।

—কবিতাটা শ্রীনাথবাবুর লেখা। হাতের লেখা ও ভাষা দুই। তবে তিনি কবিতা-লেখা কাগজ চম্পাদেবীর ঘরে রেখে আসেননি। এবং কী উদ্দেশে চিঠিটাকে ওখানে রেখে আসা হয়েছিল তা এখন বলতে পারছি না। কোকা মিক্সচারের সিগারেট কে খায় আমি জানি।

—রামনারায়ণবাবু নিশ্চয়ই ?

—ওখানেই তোমার হিসেবে ভুল হয়েছে ডাক্তার। তুমি ভেবে বসে আছ আমি সেদিন যে সিগারেটের টুকরোটা তোমায় দেখিয়েছি তা বুঝি রামনারায়ণ বাবুর সেই বিশ্রী গন্ধযুক্ত সিগারেট।

—তাছাড়া আর কি—?

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, যে লোক ওই ধরনের নেশা করে, সে কখনই অন্যের চোখের সামনে তা তুলে ধরবে না। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, একদিন রাত্রে রাজনারায়ণ লজে আমরা দুজন আগন্তুকের জন্যে সিঁড়ির পাশে লুকিয়ে পড়েছিলাম। তাদের একজনের হাতে সিগারেট ছিল ? টুকরোটা সেই সিগারেটের অংশ।

—তুমি যে বললে, তোমার অজানা নেই কে কোকা স্মোক করে ?

—ঠিকই বলেছি। তুমি আগেই শুনেছ আমার কাছ থেকে, আগন্তুক দুজনের মধ্যে যে মহিলাটি ছিলেন, তিনি চম্পাদেবী নন। ছিলেন ইন্দ্রবাবুর মেয়ে মিত্রানীদেবী। এখন তুমি ভেবে দেখ মিত্রানীদেবীর কার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়া স্বাভাবিক।

শৈবাল চিন্তা করতে লাগল।

বাসব আবার বলল, সুপর্ণবাবুকে এখানে কেন বাদ দিতে হবে তা তোমায় আমি সেদিন বলেছি। বুড়োদের কথা উঠতেই পারে না। কারণ তাঁরা বাপ ও দাদু, আর মহীতোষবাবু চল্লিশের ঊর্ধ্বে। জয়ন্তবাবুকেও বাদ দিতে হবে। কারণ সে সময় তিনি উপর থেকে নেমে আসছিলেন আগন্তুকদের সন্ধানে। এবার তুমি নিশ্চয়ই বলতে পারবে মিত্রানীদেবীর প্রেমিকটি কে ?

—কে, রঞ্জন মুখার্জি ?

—কারেক্ট। ভদ্রলোকের আবার তখন ফিরে আসার কারণ হল, সকলের মনে বদ্ধমূল ধারনা করিয়ে দেওয়া যে, আগন্তুকদের মধ্যে তিনি একজন নন। তাঁকে সন্দেহ হবার পর, লালচাঁদকে বললাম পোস্ট অফিসে খোঁজ নিতে, তার নামে সাউথ আমেরিকার কোথাও থেকে কোন পার্শেল আসে কী না। শুনলাম, আসে না। একটু হতাশ হতে হল। কিন্তু রঞ্জনবাবুকে সকালে পোস্ট অফিসে দেখামাত্র মনে হল, পার্শেলটা হয়তো ডায়রেক্ট মুঙ্গেরে আসে না। প্রথমে কলকাতা বা ভারতের অন্য কোন শহরে আর্জেন্টিনা থেকে পার্শেলটা আসে। তারপর সেখান থেকে এখানে পাঠান হয়। কাজেই

—তাহলে আর এই সিগারেটের পাহাড় করে, ধোঁয়ার সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছ কেন ? রঞ্জন মুখার্জিকে পুলিশের হাতে তুলে দিলেই হয়।

বাসব হাসল। —সে এক বিশেষ ধরনের সিগারেট খায়, আর সেই সিগারেটের মিক্সচার আমরা দুর্ঘটনার স্থলে পেয়েছি, কাজেই তাকে হত্যাকারী বলে চালান দিলে আইন তো আমাদের ছেড়ে কথা কইবে না।

—তা বটে। আচ্ছা, প্রথম দিন রাজনারায়ণ লজে আমাদের যে ওয়াচ

রেছিল সে কি রাধা ?

—আমার তাই মনে হয়।

এই সময় চাকরের মুখে খবর পাওয়া গেল নিচে পুলিশসাহেব এসেছেন।

ওরা দুজন তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এল।

বাইরের ঘরে কুলদীপ মেহরা অপেক্ষা করছিলেন।

কিছুক্ষণ ধরে তিনজনের মধ্যে অনেক বিষয় আলোচনা হল। বাসব নিজের মস্ত সন্দেহের কথা বলল মিঃ মেহরাকে।

এক সময় মিঃ মেহরা বললেন, আপনার অনুমানই ঠিক। যদিও এখন পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট রেডি হয়নি, তবু আমি ডাক্তারদের একটা অভিমত পেয়েছি। তাঁদের মতে মার্ডার সায়নাইডের সাহায্যেই হয়েছে।

—সোরাইয়ের জলে কিছু পাওয়া গেল নাকি ?

—জলে সায়নাইড মেশান ছিল। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথা হল, সোরাইয়ের পর মাত্র দুজনের হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। রাধা ও সুপর্ণবাবুর।

বাসব অন্যমনস্ক ভাবে বলল, চম্পাদেবীরও হাতের ছাপ থাকা উচিত ছিল। নি বহুবারই সোরাইটা ছুঁয়ে থাকবেন।

—তাঁর হাতের ছাপ পাওয়া যায়নি। আমরা সুপর্ণবাবুর নামে ওয়ারেণ্ট করেছি।

—হুঁ। চলুন, একবার কলেজ রোডের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।

—সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এখন যাবেন ?

চলুন। যাব যাব করে তো ওখানে যাওয়াই হচ্ছে না। একবার ানটা ঘুরে ফিরে দেখতে হবে।

জিপ নিয়ে এসেছিলেন মিঃ মেহরা।

ওতে করেই তিনজন কলেজ রোডে চললেন।

মিঃ মেহরা পুরানো কথার জের টানলেন। বললেন, তারপর কি হল ? বার তো টার্গেট মিশ করল হত্যাকারী, তারপর— ?

বাসব বলল, প্রথমবার সফলকাম না হয়ে, দ্বিতীয়বার চম্পাদেবীকে হত্যা বার পরিকল্পনা করল হত্যাকারী। পরিকল্পনায় কোথাও খুঁত ছিল না। াদেবী যে কোন সময় জল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবেন। কিন্তু তা না। তার আগেই রাধা জল খেয়ে প্রাণ দিল। যদিও ধরে নেওয়া গেছে হত্যাকারীর দলেরই লোক ছিল, তবু যে কোন কারণেই হোক জলে বিষ ান আছে, একথা তাকে জানানো হয়নি।

—এখন কি করবেন ভাবছেন ?

—ভাবছি কাল সকলকে ডেকে, একবার খোলাখুলি আলোচনা করব।

আর কোন কথা হল না।

জিপখানা যখন কলেজ রোডের সামনে এসে দাঁড়াল তখন প্রায় ছটা বাজে। মেহরা গাড়ি নিয়ে ড্রাইভারকে দূরে অপেক্ষা করতে বললেন।

বেশ কিছুটা বাগান পেরিয়ে বাড়িটা। ফুলের বাগান।

শাল বাগানটা বাড়ির পিছন দিকে। বাসব শাল বাগানের দিকে এ
চলল। পুকুরের পাশ দিয়ে যেতে হয় সেখানে।

ওরা শাল বাগানের মধ্যে এসে দাঁড়াল।

ঠেসাঠেসি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে বোধহয় শ'দেড়েক শালগাছ। চ
ঘন অন্ধকার। দিনেরবেলাও ভাল করে সূর্যের আলো ঢোকে না।

বাসব প্রশ্ন করল, এই শাল-বনটার পিছনে কোন রাস্তা আছে?

মিঃ মেহরা বললেন, আছে একটা সরু গলি।

—চলুন গলিটা দেখে আসি।

শাল-বনের শেষেই গলিটা। এঁকে বেঁকে একধার থেকে অন্যধারে
গেছে।

মেহরা বললেন, এই পথ দিয়েই তাহলে কৃষ্ণাদেবীর দেহটাকে চালান
হয়েছিল। এধারে লোক চলাচল… …

তাঁর কথা অর্ধসমাপ্ত রয়ে গেল—বাসব তাঁর হাত ধরে, প্রচণ্ড টান
তাঁকে একটা গাছের পিছনে নিয়ে এল। মুহূর্তের মধ্যে শৈবালও সেখ
উপস্থিত হয়েছে!

—ব্যাপার কি?

—সামনের দিকে তাকিয়ে দেখুন।

মিঃ মেহরা ও শৈবালের দৃষ্টি সামনের দিকে প্রসারিত হল।

চম্পা আসছে। অতি সতর্কতার সঙ্গে গলি দিয়ে এগিয়ে আসছে ও।

কুলদীপ মেহরা চাপা গলায় বললেন, একী! ভদ্রমহিলা এই অস
এখানে?

চম্পা গলি থেকে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করে বাড়িটার দিকে এগিয়ে চ

—মনে হচ্ছে, আপনি যার সন্ধান করছেন তার সাক্ষাত এখানে পা
যাবে। চম্পাদেবী বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলে, আমরাও না হয় কাছাকাছি ঘা
মেরে বসে থাকি।

মিনিট পঁয়তাল্লিশ পার হয়ে গেছে।

চম্পা যে দরজা দিয়ে বাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে, তারই সামনা-সা
একটা ঝাউগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে বাসব, শৈবাল ও কুলদীপ মেহরা।

সন্ধ্যা ঘন হয়ে এসেছে।

বিরক্তিকর ভাবে মশারা মুখের চারিপাশে গুনগুনিয়ে বেড়াচ্ছে।

কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কে জানে?

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল।

চম্পা বেরিয়ে এল। পিছনে আরেকজন।

সুপর্ণ!

চাপা গলায় কথা বলতে বলতে দ্জন এগিয়ে এল।

দ্'পক্ষের মধ্যকার ব্যবধান তখন হাত তিনেকের মাত্র।

এই সময়—কুলদীপ মেহরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্পর্ণর ওপর।

বাসব ও শৈবাল আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।

হঠাৎ এইরকম বিপর্যয়ের জন্যে চম্পা ও স্পর্ণ প্রস্তুত ছিল না। বিস্ময়ে বাক হয়ে গেল ওরা।

কুলদীপ মেহরা স্পর্ণর হাতে হ্যান্ডকাপ পরাতে পরাতে বললেন, কৃষ্ণা-ী ও রাধাকে হত্যা করার অপরাধে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করতে া হচ্ছি।

চম্পা আর্তকণ্ঠে বলল, হত্যার অপরাধে— ?

—আমার কাছে ওয়ারেন্ট আছে মিস্ চ্যাটার্জি। আইনের চোখে পনিও নির্দোষ নন। একজন পলাতক আসামীকে সাহায্য এবং আশ্রয় য়ার অপরাধে অপরাধী। কিন্তু আপনার মর্যাদার কথা বিবেচনা করে পনাকে আমি গ্রেপ্তার করলাম না।

—আস্ন স্পর্ণবাব্।

বাসব বলল, আপনার সঙ্গে তাহলে পরে দেখা করছি মিঃ মেহরা। এখন রা চম্পাদেবীকে নিয়ে রাজনারায়ণ লজে ফিরব।

ুলদীপ মেহরা স্পর্ণকে নিয়ে চলে গেলেন।

কত দ্রুত ঘটে গেল ঘটনাটা।

—আস্ন মিস্ চ্যাটার্জি।

চম্পা এবার ভেঙ্গে পড়ল।

—আপনি ওকে বাঁচান বাসববাব্। খ্ন ও করেনি—একটা ষড়যন্ত্রের জড়িয়ে পড়েছে।

—আমি সাধ্যমত করব। তবে আপনার সাহায্যের প্রয়োজন। আপনি যা না করলে এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া স্পর্ণবাব্র পক্ষে দ্ষ্কর হবে।

—আমায় কি করতে হবে বল্ন ?

—বিশেষ কিছ্ই না। আস্ন বলছি—।

ওরা তিনজন বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

টার পর বাসব থানায় এল। সঙ্গে শৈবালও আছে।

লালচাঁদ ওদের অভ্যর্থনা জানালেন।

দ্-এক কথার পর বাসব বলল, স্পর্ণবাব্র সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

—বেশ তো। দারওয়াজা—হাঁকলেন লালচাঁদ।

—না, না এখানে তাঁকে আনাতে হবে না। আমি সেলে গিয়েই কথা তে চাই।

দারওয়াজা এসে সেলাম দিল।

—সাহেবদের নতুন আসামীর কাছে নিয়ে যাও।

দারওয়াজার সঙ্গে ওরা সুপর্ণর সেলে এল।

সুপর্ণ মুহ্যমানের মত বসেছিল। ওদের আগমনে মুখ তুলল।

বাসব বলল, আমি কলকাতা থেকে এসেছি কৃষ্ণাদেবীর হত্যার করতে। আমার কথা আপনি নিশ্চয়ই চম্পাদেবীর মুখে শুনে থাকবেন?

—শুনেছি।

—আমি বিশ্বাস করি আপনি কৃষ্ণাদেবী বা রাধাকে হত্যা করেননি।

—আপনি বিশ্বাস করেন!—সুপর্ণকে এবার প্রাণবন্ত মনে হল।—কি পুলিশ সে কথা বিশ্বাস করে না।

—স্বাভাবিক। সারকামস্টান্সেস আপনাকে ক্রিমিনাল করে তুলে আপনি যদি কোন কিছু না লুকিয়ে প্রকৃত ঘটনাটা আমায় বলেন, কথা দি পুলিশের হাত থেকে আপনাকে আমি বাঁচাব।

—কি জানতে চান বলুন?

—কৃষ্ণাদেবী যেদিন মারা যান, সেদিনকার ঘটনাটা আমায় বলুন।

সুপর্ণ বলল, কলেজ রোডের বাড়ির পুকুরের ধারে আমি, চম্পা ও কৃ বসেছিলাম, গল্প হচ্ছিল। এক সময় কৃষ্ণা উঠে গেল। আমিও উঠে পড়লা রঞ্জনবাবুর সঙ্গে কিছু কাজ ছিল সেরে নেবার জন্যে। চম্পা বাড়ির মধ্যে গে

—রঞ্জনবাবুর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ভাল নয়। তবু সেদিন কি এ কথা ছিল আপনার তাঁর সঙ্গে?

—কৃষ্ণার বিয়ের কথা।

—বিয়ের কথা! কি রকম?

—নিশ্চয়ই শুনেছেন, কৃষ্ণার সমস্ত দায়িত্ব চম্পাই নিয়েছিল। তাই ত বিয়ের কথা আমরা ভাবছিলাম। আমার ইচ্ছে ছিল, জয়ন্তবাবুকে এসম্ব বলব। কিন্তু চম্পার রঞ্জনবাবুকেই পছন্দ। কাজেই আমাকে তাঁর কা কথাটা পাড়তে হয়েছিল।

—কি উত্তর দিয়েছিলেন তিনি?

—আমার প্রস্তাব শুনে তিনি উত্তর দেন, কৃষ্ণার জন্যে ভাল পাত্র তি খুঁজে দেবেন।

—হুঁ। আপনার সঙ্গে রঞ্জনবাবুর সম্পর্কটা তিক্ত হয়ে উঠল কেন?

—আমি নিজেও জানি না। তবে বরাবরই লক্ষ্য করছি রঞ্জনবাবু আমা পছন্দ করেন না।

—আপনি এখানে কাজ নিয়ে আসবার আগে, রঞ্জনবাবুই কি রাজনারায় বাবুর ব্যক্তিগত কাজকর্মগুলো করতেন?

—হ্যাঁ।

—আপনি আসবার পর?

—মুঙ্গেরের বাইরের কাজগুলো, মিঃ চ্যাটার্জি রঞ্জনবাবুকে দিয়ে করাতে

—ও। আচ্ছা তারপর কি হল, রঞ্জনবাবুর সঙ্গে কথা বলার পর কি করলেন ?

—আমি রঞ্জনবাবুর সঙ্গে কথা শেষ করে, আবার চম্পার কাছে চলে আসি। চম্পা ইন্দ্রবাবুর সঙ্গে কথা বলছিল তখন। কৃষ্ণাকে পাওয়া যাচ্ছে না, প্রথমে আমরা বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারা গেল দুপুরের দিকে। প্রচুর খোঁজাখুঁজি হল। কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না তার। আমরা ভীষণ ভাবনায় পড়লাম। চম্পার মনের অবস্থা কী রকম শোচনীয় হয়ে উঠল বুঝতেই পারছেন। পরের দিন কৃষ্ণার মৃতদেহ পাওয়া গেল পাঁচ নম্বর গুমটির ওধারে।

—আপনি এতদিন কোথায় অদৃশ্য হয়েছিলেন ?

—আমাকে আহত করে আটকে রাখা হয়েছিল।

—কি রকম ?

—আপনি হয়ত বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু—

—বিশ্বাসযোগ্য হলে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করব। আপনি বলুন ঘটনাটা।

সুপর্ণ একটু চুপ করে থেকে সমস্ত গুছিয়ে নিয়ে আরম্ভ করল ঃ

কৃষ্ণাকে পাওয়া যাচ্ছে না !

যদি বা পরের দিন তার সন্ধান পাওয়া গেল তাও মৃত অবস্থায়।

অবিশ্বাস্য কাণ্ড। চম্পাকে কী ভাবে সামলাবে সুপর্ণ !

কে কৃষ্ণাকে খুন করল ? কেন ?

সন্ধ্যা তখন হয় হয়।

সুপর্ণ শালবনের মধ্য দিয়ে বাড়ির দিকে আসছিল। চিন্তায় ভারাক্রান্ত ওর মন।

হঠাৎ পিছন থেকে মাথায় কে প্রচণ্ড আঘাত করল।

ঘুরে পড়ে গেল সুপর্ণ। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল।

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিল তাও জানে না।

জ্ঞান ফিরে আসতে ও অনুভব করল, একটা দড়ির খাটিয়ার ওপর হাত, পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার চারিদিক।

উঠে বসতে গেল সুপর্ণ—আষ্টে পিষ্টে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকার দরুন এক ইঞ্চি নড়তে পারল না ও। মাথায় অসহ্য ব্যথা।

বহুক্ষণ এই ভাবে পড়ে রইল সুপর্ণ। আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে চিন্তার সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছিল ও। হঠাৎ মৃদু একটা শব্দ হল। তার পরই আলোর ঝলকানি। কে একজন দরজা খুলে ঘরে প্রবেশ করল।

হাতে তার লণ্ঠন। কাছে আসতেই তাকে সুপর্ণ চিনতে পারল—রাধা !

রাধা মানে চম্পার জন্যে যে ঝি ঠিক করা হয়েছিল সে খাবার হাতে করে এসেছে। দরজার গোড়ায় আরেকজন পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেল সুপর্ণ।

কিন্তু তার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। আবছা অন্ধকারের মধ্যে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল সে। রাধা খাবারের থালাটা মাটিতে নামিয়ে রেখে বলল, আপনার হাত ও মুখের বাঁধন খুলে দিচ্ছি। খেয়ে নিন।

সে সুপর্ণর হাতের বাঁধন খুলে দিল। মুখের প্যাডটাও সরিয়ে নিল।

সুপর্ণ নিজের মাথায় হাত দিল। ব্যাণ্ডেজ করা হয়েছে।

মাথা ফেটে গিয়েছিল বোধহয়।

সুপর্ণ কোনরকমে উঠে বসল খাটিয়ায়।

উত্তেজিত গলায় বলল, আমাকে এখানে ধরে রাখা হয়েছে কেন?

-পুলিশ আপনাকে সন্দেহ করেছে। হাল্কা ভাবে রাধা বলল।

—পুলিশ! আমাকে!

—আপনার কী সমস্ত জিনিস পাওয়া গেছে মৃতদেহের কাছে। পুলিশের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই আপনাকে এখানে আটকে রাখা হয়েছে।

সুপর্ণর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়, সে এক গভীর ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়েছে।

ও চুপ করে বসে থাকে।

রাধা আবার বলল, খেয়ে নিন।

খেতে ইচ্ছে করছে না। পিত্তি পড়ে গেছে।

তবুও কোন প্রতিবাদ না করে খাবারের থালাটা টেনে নিল।

খেতে খেতে বলল, রাধা, চম্পা নিশ্চয়ই খুব অস্থির হয়ে পড়েছে?

মুখ বেঁকিয়ে রাধা বলল, তাঁর জন্যেই তো আপনার বিপদ আরো বেড়ে গেল। উনি কলকাতা থেকে কাকে আনাচ্ছেন খুনীকে ধরবার জন্যে।

এক সময় খাওয়া শেষ হল।

রাধা আবার সুপর্ণর হাত, পা ও মুখ বেঁধে আলোটা হাতে করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দরজায় তালা দেওয়ার শব্দ পাওয়া গেল।

এই ভাবে কয়েকদিন কাটল।

সুপর্ণ লক্ষ্য করল হাত ও পায়ের বাঁধনটা খুব শক্ত করে বাঁধলেও একটু আলগা থেকে যায়। হাজার হলেও রাধা মেয়েমানুষ। যতই হোক পুরুষালি কাজ তার পক্ষে যথাযথ হওয়া সম্ভব নয়।

সেদিন খাওয়া শেষ হলে রাধা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তখন নিজের কাজ আরম্ভ করল সুপর্ণ। হাত দুটোকে বারংবার ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে নাড় দিতে লাগল দড়ি ঢিলে করবার জন্যে।

চামড়া কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল।

কিন্তু এখন সে দিকে দৃষ্টি দিলে চলবে না। এই ভাবে হাতের কসরৎ দেখাবার পর দড়ি একটু ঢিলে হল। ক্রমে আরো ঢিলে হল।

দড়ির ফাঁসের মধ্যে থেকে হাতটা বার করে নিল সুপর্ণ। তারপর প দুটোকে মুক্ত করল। মুখের প্যাডও বার করে নিল। এখন ও সম্পূর্ণ

বন্ধন মুক্ত। এবার ঘর থেকে বেরুতে পারলেই হয়।

খাটিয়া থেকে উঠে দাঁড়াল সুপর্ণ। মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করে উঠল। চোখের ওপর একটা অন্ধকারের পর্দা নেমে এল।

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে শরীরটাকে সামলে নিল সুপর্ণ।

ঘরে আলো নেই। অন্ধকার। তবে কয়েকদিন ধরে এখানে থাকার দরুন অন্ধকারটা তার কাছে একটু তরল হয়ে এসেছে। সুপর্ণ ঘরের চারিদিক ঘুরে ফিরে বেড়াল ও সহজেই বুঝতে পারল, বাগানের শেষ প্রান্তে চাকরদের জন্যে যে কতকগুলো ঘর আছে, যার কয়েকটা ব্যবহার হয় না—তারই একখানায় ওকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

আজ রাত্রে আর রাধার আসবার সম্ভাবনা নেই। সুপর্ণ নিশ্চিন্ত ভাবে ঘরের বাইরে যাওয়ার পথের সন্ধান করতে লাগল। সামনের দরজাটায় তালা দেওয়া—কাজেই ওদিকে বিশেষ সুবিধা করা যাবে না। ও ল্যাট্রিনে এল।

ঘরের লাগোয়া ল্যাট্রিন।

সুপর্ণ বন্দী অবস্থায় কয়েকবার ল্যাট্রিনটা ব্যবহার করেছিল। ওর জানা ছিল ল্যাট্রিনের একধারে মেথর আসবার একটা দরজা আছে। উই-ধরা জীর্ণ দরজা।

নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজাটায় বারকতক ধাক্কা দিল সুপর্ণ। দরজাটা কাঠের বিট দিয়ে বন্ধ করা ছিল। প্রচণ্ড ধাক্কা সহ্য করার মত শক্তিও ছিল না তার। দরজার একটা পাল্লা ভেঙ্গে পড়ল।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত।

সকলের চোখ বাঁচিয়ে সুপর্ণ সেই রাত্রেই চম্পার কাছে উপস্থিত হল। চম্পাই ওকে কলেজ রোডের বাড়িতে লুকিয়ে রাখল।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল বাসব। তারপর বলল, রাধার সঙ্গে যে লোকটি এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকত, তার চেহারার বর্ণনা দিতে পারেন?

সুপর্ণ বলল, ঘরের মধ্যে সে একবারও ঢোকেনি। দরজার বাইরে আমার দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। বেশ বলবান চেহারা। বেঁটে নয়। আর কিছু আমি তার সম্বন্ধে বলতে পারব না।

—হুঁ। আচ্ছা, আপনি যেখানে বন্দী ছিলেন সেখানে কোন সোরাই ছিল কি? এই রকম অদ্ভুত প্রশ্নে সুপর্ণ ও শৈবাল দুজনেই অবাক হল।

—হ্যাঁ ছিল।

—আপনি সেই সোরাই থেকে জল খেয়েছিলেন?

—খেয়েছিলাম। রাধা খাবারের সঙ্গে জল আনত না। ওই সোরাই থেকেই আলগোছে জল খেতে হত।

—এখন আমরা চললাম সুপর্ণবাবু—বাসব বলল, দেখা যাক, কতদূর কী করে উঠতে পারি।

সুপর্ণ আর কিছু বলল না।

বাসব ও শৈবাল সেল থেকে বেরিয়ে এল।

অফিস ঘরে ফিরে এল ওরা। লালচাঁদ চা আনিয়ে রেখেছিলেন।

পট থেকে কাপে চা ঢালতে ঢালতে বললেন, কিছু সূত্রটুত্র পেলেন?

—একেবারেই যে পাইনি, তা নয়। ভাল কথা, সুপর্ণবাবুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, একথা রাজনারায়ণ লজের কেউ যেন জানতে না পারেন।

—চম্পাদেবী তো জানেন।

—তিনি কাউকে কিছু বলবেন না।

॥ বার ॥

বাসব রাজনারায়ণবাবুর মোটরটা গিয়ে পরীক্ষা করল।

কনভার্টেবল ডজ। থার্টি এইট মডেল।

মুঙ্গেরের মত ছোট শহরেও, এই মডেলের গাড়ি আর চলে না। এখানে এখন লেটেস্ট মডেলের হিন্দুস্থান আর ফিয়েটের ছড়াছড়ি। গাড়িখানা বদলে, একটা আধুনিক ভাল গাড়ি কেনবার ইচ্ছে রাজনারায়ণের ছিল। কিন্তু কিনব কিনব করেও আর কিনে ওঠা হয়নি।

চাকরদের কোয়ার্টারের কাছেই গ্যারেজ।

খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে বাসব স্টিয়ারিং, ব্রেক, দরজা ও অন্যান্য কয়েক স্থান, বিভিন্ন ধরনের কয়েকটা হাতের ছাপ সংগ্রহ করল।

হাতের ছাপ তোলার যন্ত্রপাতি ও সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। শৈবাল এবিষয় ওকে সাহায্য করল।

গ্যারেজের চাবিটা শ্রীনাথবাবুর কাছ থেকে নিয়ে এসেছিল বাসব। চাবিটা নেবার সময় বাসব তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, সেদিন কলেজ রোডে গাড়িটা কেউ নিয়েছিল বলে জানেন?

—এক গাড়িতে সকলে আঁটবে না বলে, তা হল গিয়ে সকলে রিক্সা করেই এখান থেকে ওখানে গিয়েছিলেন।

—গাড়ি নিশ্চয়ই গ্যারেজেই ছিল।

—তা হল গিয়ে গাড়িটা, গাড়ি বারান্দাতেই রাখা ছিল। পরের দিন রঞ্জনবাবু, তা হল গিয়ে গ্যারেজে তুলে রাখেন।

—এ বাড়িতে কে কে গাড়ি চালাতে পারেন?

শ্রীনাথ বললেন, তা হল গিয়ে, রঞ্জনবাবু ছাড়া আর কেউ পারেন না। অবশ্য কর্তা পারতেন।

—ড্রাইভার আছে?

—না।

বাসব আর কোন প্রশ্ন করেনি।

গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এসে, একটা পাকুড় গাছতলায় দাঁড়াল বাসব।

শৈবাল প্রশ্ন করল, এবার বাড়ি ফিরবে তো?

—না। একটু কাজ বাকি আছে ডাক্তার।

—মোটরটা আবার পরীক্ষা করবে নাকি?

—সুপর্ণবাবু যে ঘরে বন্দী ছিলেন, সেই ঘরের দরজাটা একবার পরীক্ষা করতে চাই।

—দরজাটা!

—হুঁ।

—কিন্তু সারি সারি অনেকগুলো ঘর দেখা যাচ্ছে, তুমি বুঝবে কি করে, কোনটায় সুপর্ণবাবুকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল।

বাসব মৃদু হেসে বলল, বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝতে হবে। আমরা এধারের বহুদিন থেকে বন্ধ থাকা ঘরগুলোর ল্যাট্রিন পরীক্ষা করব। যে ল্যাট্রিনের মেথর-ঢোকার দরজাটা ভাঙ্গা দেখতে পাব—বুঝতে হবে ওখানেই সুপর্ণবাবু বন্দী ছিলেন।

ওরা সারভেন্ট কোয়ার্টারের পিছন দিকে আসতেই দেখতে পেল একটা ঘরের মেথর-ঢোকবার দরজা আধভাঙ্গা অবস্থায় ঝুলছে।

—এস ডাক্তার, ওই সিংহদ্বার দিয়েই আমরা ভেতরে সেঁধিয়ে যাই।

ওরা ভাঙ্গা দরজা দিয়ে ল্যাট্রিন পার হয়ে ঘরে এল।

ঘরটা দায়সারা ভাবে চোখ বুলিয়ে দেখবার আগ্রহও বাসবের নেই।

বাইরে যাবার দরজাটা ভেজান ছিল।

ওরা দরজা খুলে বারান্দায় এল। দেখা গেল সেই পাকুড় গাছটার কাছাকাছিই একটা ঘর।

দরজার কড়ায় চাবি সমেত একটা তালা ঝুলছে।

বাসব বলল, চাবি খুলে খাবার দিতে এসে পাখী উড়ে গেছে দেখতে পেয়ে, রাধা ও সেই লোকটি তালাচাবি ফেলে রেখেই ভীত ভাবে সঙ্গে সঙ্গে সরে পড়ে।

এরপর দরজার কড়া, তালার উপরটা, কড়ার আসপাশের জায়গাগুলো থেকে আরো কয়েকটা হাতের ছাপ সংগ্রহ করল বাসব।

কাজ ওদের শেষ হল।

সারাটা দুপুর ফিঙ্গার প্রিন্টগুলো নিয়ে ব্যস্ত রইল বাসব।

সোরাইয়ের ওপর রাধার যে হাতের ছাপ পাওয়া গেছে, তার একটা কপি থানায় ফোন করে লালচাঁদের কাছ থেকে আনিয়ে নিল বাসব।

চারটের পর ও যখন শৈবালের কাছে এল তখন ওকে অত্যন্ত প্রফুল্ল দেখাচ্ছে।

শৈবাল বলল, খুব হাসিহাসি মুখ দেখছি। হেরাহেরি হয়ে এসেছে বোধহয়?

—হ্যাঁ, ডাক্তার। আমার থিওরি বানচাল না হলে, মুঙ্গেরে অদ্যই আমাদের শেষ রজনী !

—অর্থাৎ ?

-অর্থাৎ হত্যাকারী আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি। শুধু তাকে হাতে নাতে ধরবার একটা পরিকল্পনা আমি করছি।

—কে -কে সে ?

বাসব অল্প একটু হেসে সিগারেট ধরাল।

সন্ধ্যার পর বাসবের আহ্বানে সকলে সমবেত হয়েছেন ড্রইংরুমে।

বাসব কোনরকম ভূমিকা না করেই আরম্ভ করল, আপনারা অনেকেই আমার উপর আস্থা হারিয়েছেন বুঝতে পারছি। হত্যাকারীকে ধরা তো দূরের কথা, বলতে গেলে আমারই চোখের ওপর আরেকটা খুন হয়ে গেল। আমি আমার অক্ষমতায় লজ্জিত। তবে আমি বলব আপনারা আমার সঙ্গে যে অসহযোগিতা করেছেন, তার জন্যেই আমার কাজের বিঘ্ন ঘটেছে।

জয়ন্ত চৌধুরী বললেন, আপনি কি বলতে চাইছেন ?

—বেশ। এবার আমি পরিষ্কার ভাবেই এক এক করে বলছি। প্রথমে রামনারায়ণবাবুর কথা ধরা যাক। আশা করেছিলাম উনি নিজে থেকেই সমস্ত কিছু আমার কাছে স্বীকার করবেন। কিন্তু তা তিনি করেননি ! এখন

—প্লীজ মিঃ ব্যানার্জি—রামনারায়ণ করুণ কণ্ঠে বললেন, ওকথা এখানে আলোচনা করে লাভ নেই। আমি আপনাকে বলতামই, মানে

আমি দুঃখিত মিঃ চ্যাটার্জি - আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনার তৈরি ক্লোরিন গ্যাস দিয়ে রাজনারায়ণবাবু ও কৃষ্ণাদেবী নিহত হয়েছেন।

রামনারায়ণ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, বাসব তার আগেই আবার বলল, না, প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করবেন না। প্রমাণ না পেয়ে এ কথা বলিনি। ডাঃ রায়ের কাছ থেকে সত্তর হাজার টাকা আপনি নিয়েছিলেন, ক্লোরিনের সাহায্যে কিছু একটা তৈরি করার জন্যে।

ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, বাবা সহজ ভাবে মারা যাননি। একী বলছেন আপনি !

—প্রশ্ন তো ওখানেই। আপনি এ কথা শুনেছিলেন, তবু তাঁর মৃতদেহ সিরিয়াসলি পরীক্ষা করাননি ! কেন ?

—না মানে বাবা খুনই বা হতে যাবেন কেন ?

—চমৎকার বলেছেন। অথচ দেখুন এইসব কথাগুলো আমার জানা দরকার কিন্তু পুরোপুরি ভেঙ্গে আপনি আমায় কিছুই বলেননি। রামনারায়ণ-বাবু, গ্যাস ফ্লাস্ক দুটো সম্বন্ধে কিছু বলবেন ?

-আমার ও বিষয় কিছু বলবার নেই বাসববাবু।

বাসব পকেট থেকে একটা সিগারেটের টুকরো বার করল।

সকলের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, এই টুকরোটা কোন সাধারণ সিগারেট নয়। দক্ষিণ আমেরিকার নেশাবাজদের কাছে এটি একটি লোভনীয় বস্তু। কোকেনের পাতার বিশেষ এক মিক্সচার দিয়ে এই সিগারেট প্রস্তুত। রঞ্জনবাবু, এই উত্তেজনাকর নেশা আপনি কতদিন ধরে করছেন ?

নির্বিকার ভাবে রঞ্জন মুখার্জি বললেন, অনেক দিন ধরে।

—বলতে নিশ্চয়ই আপত্তি নেই, এই নেশাটি আপনি ধরেছেন কি ভাবে ?

—নিশ্চয়ই না। আমি তখন কলেজে পড়তাম। ব্রিটিশ গায়নার একটি নিগ্রো ছেলে আমার সঙ্গে পড়ত। তারই কাছে আমি এই সিগারেটের সন্ধান পেয়েছিলাম।

—সেই বোধহয় আপনাকে আর্জেন্টিনার রেমন্ড অ্যান্ড হেস কোম্পানির ঠিকানা দিয়েছিল ?

—হ্যাঁ।

—কৃষ্ণাদেবীর মৃতদেহ যেখানে পাওয়া যায়, সেখানে আমি এই সিগারেটের কিছু মিক্সচার পেয়েছি। ও সম্বধে কিছু বলবেন ?

রঞ্জন মুখার্জি একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, কৃষ্ণাদেবীকে খুঁজতে খুঁজতে আমি ওখানে গিয়ে পড়েছিলাম। ঝোপের মধ্যে আমি তাঁর মৃতদেহ দেখতে পাই। আমার ভয় হয়। আমি তাড়াতাড়ি চলে আসি ওখান থেকে।

আপনি পুলিশকে বা আমাকে এ বিষয় জানাননি কেন ?

—কারণ আমার মনে হয়েছিল আপনারা আমাকে সন্দেহ করবেন।

-ধন্যবাদ মিঃ মুখার্জি। আপনার সত্যি কথা বলার সাহস দেখে আমি আনন্দিত হলাম। আর একটা প্রশ্ন আছে, আপনার সামগ্রিক ব্যবহারটাই কেমন সন্দেহজনক। যেমন, চম্পাদেবীর জানলার কাচ ভাঙা হয়, সেদিন রাত্রে আপনি বাগানে উপস্থিত ছিলেন। যেমন, এক রাত্রে আপনি মিত্রানী-দেবীর সঙ্গে কোন বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। কিছু বলবেন, এ সম্বন্ধে ?

মিত্রানী নত মুখে বসেছিল।

ইন্দ্রনারায়ণ তার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন।

এবার একটু ইতস্ততঃ করে রঞ্জন মুখার্জি বললেন, আমায় ক্ষমা করবেন। এতগুলো লোকের সামনে কিছু বলতে পারব না। পরে আপনাকে সমস্ত জানাব।

বাসব তাঁকে আর কিছু বলল না। কয়েক মিনিটের জন্যে ঘরে পরিপূর্ণ নীরবতা নেমে এল।

জয়ন্ত চৌধুরী কী একটা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন।

চম্পা উঠে দাঁড়াল। বলল, আমি কিছু বলতে চাই—ওর গলা কাঁপছে।

বাসব বলল, বলুন ?

আমার ভয় হচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে আমার বিরুদ্ধে একটা গভীর

ষড়যন্ত্র গড়ে উঠেছে। কেউ আমায় প্রাণে মারতে চায়।

—সে কী মা! তোমায় কে প্রাণে মারতে চাইবে? ইন্দ্রনারায়ণ বললেন।

—আপনাদের আমি বোঝাতে পারব না কাকাবাবু। আমার বার বার মনে হচ্ছে, যা কিছু হয়েছে সমস্ত আমাকে কেন্দ্র করে। হত্যাকারী আসলে আমাকেই খুন করতে চায়।

রামনারায়ণ বললেন, এ তোমার ভুল ধারনা ভাই।

-হয়ত তাই। তবু যদি আমি হঠাৎ মারা যাই—তার আগে—

—তার আগে?

চম্পার কথার শেষটা শোনার জন্যে সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

—তার আগে আমি নিজের সম্পত্তি উইল করতে চাই।

এবার বাসব বলল, উইল করতে চান আপনি!

—হ্যা, মিঃ ব্যানার্জি। কালই। মহীতোষবাবু উপস্থিত রয়েছেন। আইনের দিকে কোনরকম গোলমাল হবার সম্ভাবনা নেই। আপনি ও শৈবালবাবু হবেন আমার উইলের অন্যতম সাক্ষী।

কথাটা শেষ করেই চম্পা দ্রুত প্রস্থান করল সেখান থেকে।

এই নাটকীয় পরিস্থিতির জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিলেন না। সকলেই চম্পার চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ঝিল্লীর ঐক্যতান শোনা যাচ্ছে।

সকলে এক যোগে যেন কিছু বলতে চাইছে।

কোন অশুভ সম্ভাবনার ইঙ্গিত করছে কি?

সশব্দে কোথায় এগারোটা বাজল। রাজনারায়ণ লজ ঘুমের কোলে ঢলে রয়েছে।

বাসব ও শৈবাল ছায়ার মত বাড়িতে ঢুকল। সঙ্গে কুলদীপ মেহরাও রয়েছেন।

আগের ব্যবস্থামত দরজা খোলাই ছিল। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে তিনজনে দোতলায় এল।

আবছা ভাবে তেতলার সিঁড়িটা দেখা যাচ্ছে। বারান্দার শেষ প্রান্তে তেতলার সিঁড়ি। সিঁড়ির সামনাসামনি একটা জায়গা বেছে নেওয়া হল। সেখান থেকে দেখা যায় তেতলায় কেউ উঠছে কিংবা নামছে কী না; অথচ ওদের কেউ দেখতে না পায়।

মিনিটের পর মিনিট কেটে চলল। সিঁড়ির দিকে একভাবে তাকিয়ে সকলে।

বারোটা বাজল কোথায়। তারপর সাড়ে বারোটা। একটাও বেজে গেল ক্রমে।

কুলদীপ মেহরা ফিসফিস করে বললেন, আমাদের বোধহয় পণ্ডশ্রম হল।

দু-ঘণ্টার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছি—

বাসব বলল, সারা রাত বোধহয় আমাদের এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হতে পারে। তবে ওর কথা শেষ হল না। হাল্কা পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। কে যেন এগিয়ে আসছে—একটা চলমান ছায়া দেখা গেল না। সন্তর্পণে এগিয়ে এসে ছায়াটি দাঁড়াল তেতলার সিঁড়ির মুখে।

এক মুহূর্ত। তারপর উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

মিনিট দুয়েক পার হল।

মিঃ মেহরা ও শৈবালকে নিয়ে বাসব তেতলাব দিকে এগিয়ে গেল। সিঁড়িব চার পাঁচটা ধাপ পার হয়েছে বোধহয়— ঠিক সেই সময় রাতের নীরবতাকে চুরমার করে গুলির আওয়াজ পাওয়া গেল-- সেই সঙ্গে চাপা আর্তনাদ।

ওরা দ্রুতবেগে ওপরে উঠে চলল। সিঁড়ির ওপরে পেঁছাবার পূর্বেই অপর দিক থেকে সবেগে কে একজন এসে পড়ল ওদের ওপর। শৈবাল ছিটকে পড়ল একধারে। মিঃ মেহরা ও বাসবকে কোনরকমে রেলিং ধরে নিজেদের সামলাতে হল। অসম্ভব দ্রুতগতিতে ধাপে ধাপে নেমে চলেছে আগন্তুক তখন। মিঃ মেহরা ধাবিত হলেন তার পিছনে।

বাসব পকেট থেকে টর্চ বার করে সিঁড়ির রেলিংএ ভর দিয়ে নিচের দিকে কয়েকবার আলো ফেলল। তারপর সেও নিচে নেমে গেল।

একতলার বারান্দায় ঝটাপটি চলেছে। গজ-কচ্ছপের গুঁতো-গুঁতি হচ্ছে যেন। প্রথমে মিঃ মেহরা, তারপর বাসব ও সবশেষে শৈবাল ঘটনাস্থলে এল।

টর্চের তীব্র আলোয় দেখা গেল রঞ্জন মুখার্জি ও শ্রীনাথবাবুর মধ্যে ধস্তাধস্তি চলেছে। বাসব এগিয়ে গিয়ে ওদের ছাড়িয়ে দিল।

শ্রীনাথবাবু হাপাতে হাঁপাতে বললেন, আপনার কথামত আমি সিঁড়ির নিচেই অপেক্ষা করছিলাম। গুলির আওয়াজ পেয়ে ওপরে উঠতে যাব, এমন সময় দেখি রঞ্জনবাবু পালিয়ে যাচ্ছেন। তাই –

—আমার কথামত কাজ করে ভালই করেছেন শ্রীনাথবাবু। তারপর মিঃ মুখার্জি ?

মিঃ মেহরা রঞ্জন মুখার্জির হাতে হ্যাণ্ডকাপ পরিয়ে দিয়েছিলেন ততক্ষণে। নির্বাক রঞ্জন তখন মাটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

—কিন্তু আমাদেব আর এখানে অপেক্ষা করা চলবে না।—বাসব বলল, আসুন, তেতলায়।

মিঃ মেহরা হুইশিল বাজালেন। বাইরে অপেক্ষমান দুজন কনস্টেবল ছুটে এল। তাদের হেপাজতে রঞ্জনবাবুকে দিয়ে তিনজনে তেতলার দিকে ধাবিত হলেন।

গুলির আওয়াজে সকলেরই ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। সকলেই নিজের নিজের চোখের দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন।

তেতলায় এসেই একটা খোলা দরজার দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে মিঃ

মেহরা বললেন, মনে হচ্ছে ওই ঘরে।

ঘর থেকে একটা ফিকে আলোর আভা বেরুচ্ছে। চম্পার ঘর ওটি। দোতলায় ওর ঘরে রাধা খুন হওয়ার পর, ওকে তেতলার এই ঘরে চলে আসতে হয়েছে। কারণ দোতলার ঘরটি এখন পুলিশের হাতে।

ঘরে প্রবেশ করে প্রথমে কিছু কিছুই বুঝতে পারা গেল না। ঘরের আলোটা অত্যন্ত হাল্কা। টর্চের আলোয় সুইচ বোর্ড খুঁজে নিয়ে বড় আলোটা জ্বালল বাসব।

তীব্র আলোয় ভরে উঠল ঘরখানা।

কিন্তু চম্পা কোথায়? বিছানা খালি। পাশের বালিশটা গুঁজড়ে পড়ে আছে এক ধারে। মেঝের জায়গায় জায়গায় রক্তের ছাপ। ওধারের একটা দরজার পাল্লায় রক্ত লেগে রয়েছে।

বাসব পাশের বালিশটা পরীক্ষা করল প্রথমে। তারপর রক্তমাখা দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজার ওপাশে ফালি বারান্দা একটা। বারান্দার সঙ্গে সংযুক্ত স্পাইরেলের সিঁড়ি। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নিচে নেমে গেছে।

উদ্বিগ্ন ভাবে মিঃ মেহরা বললেন, মিস চ্যাটার্জি কোথায়?

অন্যমনস্ক ভাবে বাসব বলল, আমি জানতাম না এধারে একটা স্পাইরেলের সিঁড়িও আছে। আসুন, দেখা যাক—

বাসব ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা নিচে নেমে এল। শৈবাল মিঃ মেহরা ও শ্রীনাথবাবুও ওর পিছনে পিছনে বাগানে এলেন।

সারভেন্ট কোয়ার্টারের কাছে এসে থামল বাসব।

কয়েকটা ঘরের সামনে খাটিয়া পেতে কয়েকজন ঘুমাচ্ছে। সারাদিনের পরিশ্রান্ত চাকরদের কানে গুলির আওয়াজ এসে পৌঁছায়নি। তারা পরম নিশ্চিন্ততায় ঘুমাচ্ছে।

বাসব বন্ধ ঘরগুলোর দিকে এল।

একটা ঘরের ভেজান দরজার পাল্লার ফাঁক দিয়ে আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

একটু চাপ দিতেই একটা পাল্লা সরে গেল।

ঘরে প্রদীপ জ্বলছে।

অত্যন্ত মোলায়েম আলোয় ঘরখানা কোনরকমে আলোকিত। কে একজন দরজার দিকে পিছন করে, খালি গায়ে কী করছে।

পাল্লা সরে যাওয়ার সময় একটু শব্দ হয়েছিল বোধহয়। বিদ্যুৎ বেগে উঠে দাঁড়াল লোকটি। ট্রাউজারের পকেটের মধ্যে হাত চালিয়ে দিয়ে কিছু একটা বার করে আনবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার আগেই ঝটিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে বাসব বলল, আমরাও সশস্ত্র। পকেট থেকে হাতটা বার করে আনুন। অনেক রাজা উজির মেরেও, শেষ পর্যন্ত বোড়ের চালেই মাৎ হয়ে গেলেন মিঃ মিত্র।

মিঃ মেহরা শৈবাল ও শ্রীনাথবাবুকে নিয়ে ঘরের মধ্যে এলেন।

বাসব বলল, মিঃ মেহরা, আসামী আমার সামনে। তিনটি হত্যাকাণ্ডের একমাত্র হত্যাকারী মহীতোষ মিত্রকে আপনি গ্রেপ্তার করতে পারেন।

মহীতোষ মিত্র পকেট থেকে হাত বার করে আনলেন। তাঁর বাঁ কাঁধের এক পাশ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। হিংস্র চোখে সকলের দিকে তাকালেন তিনি। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, আমি যে খুনগুলো করেছি তা প্রমাণ করতে পারবেন?

—পারব বৈকি। প্রমাণ একটা নয়, একটার পর একটা আছে মিঃ মিত্র। সর্বাধুনিক হল, আপনি এই কিছুক্ষণ আগে চম্পাদেবীকে খুন করতে গিয়ে, সাইলেন্সারের যে গুলিটি পাশের বালিশের ওপর খরচ করেছেন—তা আমরা খুঁজে পাবই। আর রিভলবারটা আপনার পকেটে রয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, হত্যা করা এবং হত্যা করতে গিয়ে ফস্কে যাওয়ার মধ্যে শাস্তির বিশেষ তারতম্য হয় না। তাছাড়া রঞ্জনবাবু একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। অন স্পট তিনি আপনাকে আহত করেছেন।

হিংস্র চোখ দুটো নিষ্প্রভ হয়ে গেল মহীতোষ মিত্রের।

চোয়াল ঝুলে পড়ল। তিনি অসহায় ভাবে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

॥ তের ॥

পরের দিন।

কুলদীপ মেহরাকে আজই বিস্তৃত ভাবে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে মুঙ্গের থেকে বিদায় নিচ্ছে বাসব ও শৈবাল। ট্রেন ছাড়তে আর বিলম্ব নেই। দানাপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জারকে ওরা প্রেফার করল না। ফিরে চলেছে আপার ইণ্ডিয়াতেই।

স্টেশানে ওদের তুলে দিতে এসেছেন অনেকেই। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন, রামনারায়ণ, ইন্দ্রনারায়ণ, কুলদীপ মেহরা ও শৈবালের শ্বশুরমশাই। সুপর্ণ আর চম্পাও অবশ্য আছে। তবে ওরা সি অফ্ করতে আসেনি, ওরাও চলেছে বাসব ও শৈবালের সঙ্গে কলকাতায়। ট্রেন ছেড়ে দিল যথা সময়ে। হাত নেড়ে এবং শুভেচ্ছাসূচক বার্তা বিনিময় করে উভয় পক্ষই বিদায় নিলেন উভয় পক্ষের কাছে।

দরজার কাছ থেকে সরে এসে বার্থের ওপর বসল বাসব।

ফোর বার্থ ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্ট। যাত্রীও চারজন।

বাসব একটা সিগারেট ধরাল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, সুপর্ণবাবু, বিশেষ দিনটিতে যেন আমাদের দুজনকে ভুলবেন না।

মৃদু হেসে সুপর্ণ বলল, ভুললে আমাদের নরকেও স্থান হবে না বাসববাবু। এত বড় বিপদ থেকে আপনি ছাড়া আমাকে আর কেউ উদ্ধার করতে পারত বলে আমি বিশ্বাস করি না।

চম্পা বলল, এখনও আমার কাছে সমস্ত ধাঁধা। মহীতোষবাবুর মত লোক যে এরকম নিষ্ঠুর প্রকৃতির হতে পারে, তা আমার কল্পনার অতীত ছিল। কি ভাবে আপনি তাঁকে সন্দেহ করলেন মিঃ ব্যানার্জি?

—প্রথমেই কী বুঝতে পারছিলাম! পরে

—ওভাবে নয়। প্রথম থেকে আমাদের সমস্ত কিছু বলুন? সুপর্ণ বলল।

বাসব সিগারেটে কয়েকবার টান দিয়ে আরম্ভ করল,– আমি এসে এখানে সমস্ত কিছু দেখে শুনে নেবার পর, ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কৃষ্ণাদেবী হত হলেন কেন। তাঁকে হত্যা করে হত্যাকারীর লাভ কি? অনেকেরই ওপর আমার সন্দেহ হচ্ছিল। কিন্তু কাউকেই প্রকৃত হত্যাকারী বলে ধরতে পারছিলাম না। তখন প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে পরীক্ষা করতে লাগলাম। যাতে প্রকাশ পেল, রঞ্জন মুখার্জি মিত্রানীদেবীকে ভালবাসেন এবং কোকো মিক্সারের সিগারেট স্মোক করেন। নেশাটি তিনি কী ভাবে ধরেছিলেন তার ইতিহাস আপনারা শুনেছেন। তাঁর হাবভাব অত্যন্ত সন্দেহজনক। তবু আমি তাঁকে অপরাধীর লিস্ট থেকে বাদ দিয়েছিলাম। কারণ প্রথম সাক্ষাতেই চম্পাদেবীর সঙ্গে তিনি যে ভাবে কথা বলেছিলেন বা চম্পাদেবীর ঘরের কাচ ভাঙ্গার কথাটা যে ভাবে বললেন আমায়, তাতে ওই রকম ধারনা হওয়াই স্বাভাবিক। হত্যাকারী সেধে নিজে থেকে এভাবে কথা বলতে পারে না। দ্বিতীয় নম্বর রামনারায়ণবাবু, তিনি ওষুধপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। ওটা না-কী তার হবি। এ বাড়িতে ডাক্তারিজ্ঞান অর্থাৎ স্বাভাবিক দৃষ্টিতে ক্লোরিন গ্যাসে মৃত্যু কী ভাবে হবে এবং ওই গ্যাস কী করে সংগৃহীত হয়, সে সম্বন্ধে একমাত্র তাঁরই জ্ঞান থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁকেও সন্দেহ করা যায় না। প্রথম কারণ, তিনি ক্লোরিন গ্যাস সম্বন্ধে যে কথা আমায় বলেন তা হত্যাকারীর পক্ষে কখনই আমাকে বলা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় রাজনারায়ণের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়—তাঁকে হত্যা করা হয়েছে এ কথা আমি তাঁর মুখেই প্রথম শুনি। এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, যে লোকের স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু হয়েছে সকলে জানে, তাকে হত্যাকাণ্ড বলা নিশ্চয়ই হত্যাকারীর অভিপ্রেত হবে না। তাছাড়া এ সমস্ত বলে তিনি যেন আমাকে সাহায্যই করতে চাইলেন। কাজেই—। তৃতীয় নম্বর ইন্দ্রনারায়ণ। তাঁর ব্যবহারে যদিও সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েনি, তবে ধরে নেওয়া যায় চম্পা-দেবীর সম্পত্তি পাওয়াতে তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট নন। এতে তাঁকে কৃষ্ণাদেবীর হত্যাকারী বলে সন্দেহ করা যায় না। মিত্রানীদেবীকে আমি এমনি বাদ দিলাম। জয়ন্ত চৌধুরীর ব্যবহারে সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। শ্রীনাথ কবিতা লেখেন। তাঁরই লেখা কবিতা চম্পাদেবী উপহার পেয়েছেন। কেন? কেনর উত্তরটা অবশ্য পরে পেয়েছিলাম। পরে সে কথা বলছি। অবশ্য সুপর্ণবাবুকে আমি কখনই সন্দেহ করিনি। কৃষ্ণাদেবীকে হত্যা করার তাঁর কোনই স্বার্থ থাকতে পারে না। বরং এটা বোকামির পরিচায়ক।

রাজকন্যা এবং অর্ধেক রাজত্ব যাঁর প্রায় করায়ত্তে (বাসব সুপর্ণ ও চম্পার দিকে তাকিয়ে হাসল) তিনি এরকম কাণ্ড করতে যাবেন কেন! দুর্ঘটনার স্থলে তাঁর কাফলিঙ্ক পেয়ে যাওয়াটাকে আমি মোটেই গুরুত্ব দিইনি। হত্যাকারী সুপর্ণবাবুকে ফাঁসাবার জন্যে এটা করেছে সহজেই বুঝতে পারা যায়। বাসব থামল।

সিগারেটের টুকরোটা জানালা গলিয়ে ফেলে দিল। শৈবাল, সুপর্ণ ও চম্পা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছে।

বাসব আবার আরম্ভ করল, মহীতোষ মিত্রকে সন্দেহ করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। তিনি এ্যাটর্নি এবং বাড়ির দীর্ঘ দিনের বন্ধু। আর সবচেয়ে বড় কথা তিনিই চম্পাদেবীকে এখানে পাঠিয়েছেন। আমার চিন্তা তখন ঘুরপাক খাচ্ছিল, কৃষ্ণাদেবীকে হত্যা করা হল কেন, এ বিষয়ে। রাধা মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি ধরতে পারলাম প্রকৃত ব্যাপারটা। আসলে হত্যাকারী চম্পাকে মারতে চায় কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দুবারই তার টার্গেট মিশ হয়েছে। প্রথমবার একই ধরনের শাড়ি পরে থাকার দরুন অন্ধকারে হত্যাকারীর ভুল হয়েছিল। এখানে মতভেদের প্রশ্ন উঠতে পারে। দ্বিতীয়বার মতভেদের কোন প্রশ্নই নেই—হত্যাকারীর যদি রাধাকে হত্যা করারই উদ্দেশ্য ছিল, তবে সে চম্পাদেবীর সোরাইয়ে সায়নাইড মিশিয়ে রাখবে কেন? ওই সোরাই থেকে রাধার জল খাওয়ার ৯০ পারসেণ্ট চান্স নেই। অথচ সেণ্ট-পারসেণ্ট চম্পাদেবীর ওই সোরাই থেকে জল খাওয়ার চান্স রয়েছে। আমি চম্পাদেবীকে হত্যা করার বিষয় স্থির নিশ্চিত হয়ে চিন্তা করতে লাগলাম এতে হত্যাকারীর কি লাভ? তিনি মারা গেলে উইল থেকে ব্যক্তি বিশেষের লাভ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সমস্ত টাকা যাবে রায়নারায়ণ ট্রাস্টে। রাধা মারা যাওয়ার পর আমি যখন ঘরখানা পরীক্ষা করছি তখন চোখে পড়ল সোরাইয়ের স্ট্যাণ্ডটার ওপর কালো সিল্কের খানিকটা থেড়ে পড়ে রয়েছে। আমি ঘর থেকে নিচে নেমে এলাম। সেখানে রামনারায়ণবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি আগের দিন রাত্রে জানতে পেরেছিলাম ক্লোরিন গ্যাসের ফ্লাস্ক দুটো রামনারায়ণের। এই তথ্য জানবার পিছনে একটা ইতিহাস আছে। আমি কয়েকদিন রাত্রে রাজনারায়ণ লজের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। সেদিন রাত্রে বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছি, চোখে পড়ল গেটের পাশে একটা সাইকেল দাঁড় করান। সাত-পাঁচ ভেবে তার টায়ারটা সেফটিপিন দিয়ে নষ্ট করে আমি গেটের অপর পারে লুকিয়ে রইলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে, দুজন লোক বাড়ির মধ্য থেকে বেরিয়ে এল। তাদের চিনতে কষ্ট হল না। একজন রামনারায়ণ, অপরজন ডাঃ রায়। আমি আগেই গিয়ে ডাক্তার রায়ের আস্তানায় ওত পেতে রইলাম। তারপর তাঁর কাছ থেকে কথা বার করতে কষ্ট হল না। তিনি যা বললেন, তার সারমর্ম হল, বছর দুয়েক আগে রামনারায়ণ নিজের রিসার্চের জন্যে লেখাপড়া করে ৭০ হাজার টাকা নেন। তিনি যা করতে

চাইছেন, তা সফল হলে অর্ধেক অংশীদার ডাঃ রায় হবেন। কাজ সবে খানিকটা এগিয়েছে এমন সময় গোলমাল বাধল। দুটো ক্লোরিন গ্যাসের ফ্ল্যাস্ক চুরি গেল। তারপরই রাজনারায়ণ মারা গেলেন। ডাঃ রায় সত্যি সত্যিই প্রথমে ধরতে পারেননি তিনি খুন হয়েছেন। কিন্তু কৃষ্ণাদেবী মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝতে পারলেন, চুরি যাওয়া ফ্ল্যাস্ক দুটোর সাহায্যেই দুজনের প্রাণ গেছে। তিনি ভয় পেলেন। কারণ, তাঁরই টাকায় ক্লোরিন গ্যাস তৈরি হয়েছে। টাকা তিনি আগে থেকেই ফেরত চাইছিলেন। রামনারায়ণের আশা ছিল, উইলে দাদা তাঁকে বহু টাকা দিয়ে যাবেন। কিন্তু তা হল না। মহাচিন্তায় পড়লেন রামনারায়ণ। সেদিন এইরকমই একটা তাগাদা দিতে রামনারায়ণের কাছে গিয়েছিলেন ডাঃ রায়।

বাসব চুপ করল। একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার আরম্ভ করল, যা বলছিলাম, ওপর থেকে নেমে এসে রামনারায়ণের সঙ্গে কথা হচ্ছে, এমন সময় সেখানে এলেন জয়ন্ত চৌধুরী ও মহীতোষ মিত্র। সেই মুহূর্তে আমার এক বিরাট প্রবলেম প্রায় সলভ হয়ে গেল। মহীতোষ মিত্রের নাকে আঁটা পাঁসনের সঙ্গে লাগান লম্বা কালো সুতোগুলো আমায় এক বিশেষ পথের সন্ধান দিল। আমি এইমাত্র সোরাইয়ের স্ট্যাণ্ডের ওপর থেকে যে কালো সুতোটা পেয়েছি, তা কি এই পাঁসনের সুতোগুলোরই অন্যতম? পোস্ট অফিস অবধি মহীতোষ মিত্র আমার সঙ্গে গেলেন। কথা প্রসঙ্গে আমি বললাম, যারা সম্পত্তি পেয়েছে তাদের মধ্যে কেউ উইল করলে তা ভ্যালিড হবে কী না। তিনি বললেন, হবে। কিন্তু মনে মনে বেশ চঞ্চল হলেন। কারণ এ সম্ভাবনা তাঁর মনে আসেনি। এখন সত্যি যদি চম্পাদেবী কাউকে উইল করে দেন নিজের সম্পত্তি, তাহলে তাঁর সমস্ত পরিকল্পনাটাই বানচাল হয়ে যাবে। একসময় তিনি তাঁর চশমাটা দেখালেন। এক সাইডের কাচ ফাটা। রাত্রে না কী বালিশের চাপে ফেটেছে। আমি কিন্তু তখুনি দেখে নিলাম ভাল করে পাঁসনের সঙ্গে যে থেড্রযুক্ত রয়েছে, তার সঙ্গে আমার সুতোটার কোনই পার্থক্য নেই। তবে কী মহীতোষ মিত্রই হত্যাকারী! কিন্তু কেন? কেনর উত্তরটা পাওয়া গেল যখন জানতে পারলাম, রায়নারায়ণ ট্রাস্টের উনিই চেয়ারম্যান. অবশ্যই এরপর আমার অনুমান করে নিতে কষ্ট হল না, ট্রাস্টের অন্যান্য সদস্যরা নিশ্চয়ই তারই নিজের লোক এবং এই রকম ট্রাস্টের তহবিল যে কোন ভাবে তছরূপ করবার দৃষ্টান্ত বিশ্বের সমস্ত দেশেই প্রচুর আছে। আরেকটা বিষয় আমি তার সম্বন্ধে নিশ্চিত হলাম। মোটরের নানাস্থান থেকে আমি দুটো হাতের ছাপ সংগ্রহ করেছিলাম। চম্পাদেবীকে মহীতোষবাবু রাজনারায়ণের যে চিঠিখানা দিয়েছিলেন, তা থেকেও হাতের ছাপ তুললাম। খামের ওপর দুজনের হাতের ছাপ থাকাই স্বাভাবিক—মহীতোষ মিত্র ও চম্পাদেবীর। চারটে হাতের ছাপের মধ্যে একটা কমন পাওয়া গেল। স্বাভাবিক ভাবেই সেটা মহীতোষ মিত্রর। কারণ চম্পাদেবী গাড়ি চালাতে

পারেন না, গাড়ির ধারে কাছে যাননি। আর রঞ্জন মুখার্জি সম্প্রতি রাজনারায়ণের থামটা হাতে নেননি। তারপর সারভেণ্ট কোয়ার্টারের দরজার ওপর আবার দুটো হাতের ছাপ পাওয়া গেল। তার মধ্যে একটা রাধার। অন্যটা আবার মহীতোষ মিত্রর সঙ্গে মিল হল। আশা করি আপনারা আমায় ফলো করেছেন?

তিনজনেই ঘাড় নাড়লেন।

—এবার আমি মহীতোষ মিত্রকে হাতেনাতে ধরবার পরিকল্পনা করলাম। চম্পাদেবী আমাকে সাহায্য করলেন। আসলে সেদিন সকলকে ডাকিয়ে এত কথা বলার উদ্দেশ্য হল সময় বুঝে চম্পাদেবী নিজের উইলের কথা বলবেন। যাতে হত্যাকারী কোনমতেই বুঝতে না পারে যে তার বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র হচ্ছে। আমার পরিকল্পনা যে ব্যর্থ হয়নি, তা আপনারা দেখেছেন। মহীতোষ মিত্র চম্পাদেবীর উইল পাল্টাবার কথা শুনেই ঠিক করে নিলেন, রাত্রেই তিনি কাজ শেষ করবেন। অবশ্য আমি এখন বলতে বাধ্য হচ্ছি, চম্পাদেবীর অভিনয় হয়েছিল প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীদের মত। তারপর যা হয়েছে আপনারা জানেনেই।

শেবাল বলল, রঞ্জনবাবু মহীতোষবাবুকে গুলি করতে গেলেন কেন?

—কারণ, তিনি চম্পাদেবীর বডিগার্ড ছিলেন। বুঝতে পারলে না? তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, সেদিন সকলের সামনে রঞ্জনবাবু আমায় বলেছিলেন, কতকগুলো কথা তিনি এতগুলো লোকের সামনে বলতে পারবেন না। পরে আমাকে জানাবেন। আমার সঙ্গে পরে তাঁর কথা হয়েছিল। রঞ্জনবাবুর চরম দুরবস্থার দিনে রাজনারায়ণ তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। রঞ্জনবাবু অকৃতজ্ঞ নন। যদিও একান্তে সুপর্ণবাবু সেক্রেটারি নিযুক্ত হওয়ায় একটু মনক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, তবু তিনি রাজনারায়ণকে অন্ধের মত ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। রাজনারায়ণ, দেবনারায়ণের মৃত্যুর পরও চেষ্টা করেছিলেন পুত্রবধূ যাতে চম্পাকে নিয়ে তাঁর কাছে চলে আসেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা সফল হয়নি। এদিকে তাঁর নাতনিটি কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হবে, এতেও তিনি স্থির থাকতে পারছিলেন না। তাই রঞ্জনবাবুর সাহায্যে চম্পাদেবীর নানারকম চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে থাকলেন। তিনি থ্রম্বোসিসের রুগী ছিলেন। এদিকে বয়সও বেশ হয়ে গেছে—কখন আছেন কখন নেই—এটর্নি ডেকে উইল করে ফেললেন এবং চম্পাদেবীকে সম্পত্তির অর্ধেক দিলেন। কিন্তু তাঁর ভয় ছিল অপরিচিত নাতনিটির এই বিরাট সম্পত্তি পাওয়াটা অনেকেই ভাল চোখে দেখবেন না। হয়ত কোনরকম বিপদ হতে পারে—এসব সাত-পাঁচ ভেবে তিনি রঞ্জন মুখার্জিকে নির্দেশ দেন যে, তিনি মারা যাওয়ার পর চম্পাদেবীর সঙ্গে সুপর্ণবাবুর বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে চোখে চোখে রাখতে। রঞ্জনবাবু অক্ষরে অক্ষরে সে আদেশ পালন করেছেন। চম্পাদেবী এখানে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁকে চোখে চোখে রাখতে লাগলেন।

রাতে-বেরাতে তিনি চম্পাদেবীর ঘরের আশে-পাশে ঘুরে বেড়াতেন। রাজ নারায়ণের রিভলবারটা তাঁর কাছে ছিল। রঞ্জনবাবুও বুঝতে পেরেছিলে হত্যাকারী চম্পাদেবীকে হত্যা করতে চায়। দোতলার ঘর বদল করে চম্পাদেব যখন তেতলায় গেলেন, রঞ্জন মুখার্জি তখন তেতলায় নিজের ডিউটি পার্মানে করলেন। যথা নিয়মে মহীতোষ মিত্র আমার টোপ গিলে চম্পাদেবীকে হত করতে গেলেন। মিঃ মিত্র চম্পাদেবীর ঘরে ঢোকাব পরই রঞ্জনবাবু তাঁে আহত করেন। অবশ্য তার আগেই মহীতোষ মিত্র নিজের সাইলেন্সার দিে চম্পাদেবী মনে করে বালিশে গুলি করেন।

চম্পা প্রশ্ন করল, কিন্তু আমাকেই বা তিনি মারতে চেয়েছিলেন কেন ?

কারণ আপনার নগদ টাকা ও সম্পত্তির পরিমাণ অত্যন্ত বেশি আপনাকে খুন করতে পারলেই একটা ধনভাণ্ডার হাতে আসার সম্ভাবনা।

—আচ্ছা, সেই অদ্ভুত কবিতাটা আমার বিছানায় রেখে এসেছিল কে চম্পা আবার প্রশ্ন করল।

—এও রঞ্জন মুখার্জির কাজ। তিনি শ্রীনাথবাবুর কবিতার খাতা থেকে কবিতাটা ছিঁড়ে রেখে এসেছিলেন।

—কেন ?

-ওই কাচ ভাঙ্গা সংক্রান্ত ব্যাপারের পর তাঁর ধারনা হয়, আপনি ঘুমিে পড়লে আপনার বিপদ আসতে পারে। ওই অদ্ভুত কবিতাটা আপনার চিন্তা খোরাক হবে -আপনি ভয় পাবেন। তখন মিত্রানীদেবী বা চারুলতাদেবী ঘরে আপনি রাত কাটাতে বাধ্য হবেন। এখন শুনুন ঘটনাটা কী ভাবে গে ওঠে। রাজনারায়ণ উইল করলেন। মহীতোষবাবুর পরামর্শে ট্রাস্ট গঠ করলেন এবং মনে হয় মহীতোষের অনুরোধে তাঁকেই চেয়ারম্যান করলেন নিজের বিপদও রাজনারায়ণ ডেকে আনলেন ওই সঙ্গে। উইলের কোন কথা মিঃ মিত্রর অজানা থাকার কথা নয়। তিনি ভেবে দেখলেন, চম্পাদেবী বিরা সম্পত্তি হাতে পাচ্ছেন। তাঁকে যদি হত্যা করা যায়, লাখ লাখ টাকা ট্রাস্টে ফাণ্ডে আসবে। ট্রাস্টের ফাণ্ডে আসা মানেই তাঁর হাতের মুঠোয় আসা অথচ কেউই তাঁকে হত্যাকারী হিসেবে সন্দেহ করবে না। পুলিস বাড়ি কাউকে সন্দেহ করবে। চম্পাদেবীর এই উড়ে এসে জুড়ে বসায় সকলে অসন্তুষ্ট। কাজেই -। পরিকল্পনা ঠিক করে প্রথমে তিনি ক্লোরিন গ্যাসে সাহায্যে রাজনারায়ণকে হত্যা করলেন। মহীতোষ মিত্রের রাজনারায়ণ সে অবাধ গতি -গ্যাস ফ্লাস্ক দুটো রামনারায়ণের ঘর থেকে সরিয়ে আনত অসুবিধা হয়নি তাঁর। কিন্তু চম্পাদেবীকে হত্যা করতে গিয়ে তিনি অকৃতকার্য হলেন। এদিকে সুপর্ণবাবু তাঁর হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কাজে আবার তাঁর প্ল্যান হল দ্বিমুখী। সুপর্ণবাবুকে যে ঘরে বন্ধ করে রাখ হয়েছিল, সেখানে একটা সোরাই ছিল—তার থেকে তিনি জল খেতেন। তাঁ হাতের ছাপ সোরাইয়ের গায়ে ছিল। মহীতোষ মিত্র রাধার সাহায্যে সে

সোরাইটা চম্পাদেবীর ঘরে রাখল এবং তার জলে পটাশিয়াম সায়নাইড মিশিয়ে দেন। চম্পাদেবী সে সময় ড্রইংরুমে ইন্দ্রবাবুর সঙ্গে গল্প করছিলেন। আমার মনে হয়; সোরাইয়ে ঝুঁকে সায়নাইড মেশাবার সময় মিঃ মিত্রর প্যাসনে নাক থেকে খসে পড়ে এবং একটা কাচ ফেটে যায়। আর একটা সুতোও ছিঁড়ে যায় সেই সময়। এই সোরাই বদলের উদ্দেশ্য হল চম্পাদেবী মারা গেলেই, সোরাইয়ের গা থেকে হাতের ছাপ পেয়ে পুলিশ সুপর্ণবাবুকে আরো দৃঢ় ভাবে সন্দেহ করবে।

চম্পা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল, অপূর্ব—।

--কি অপূর্ব মিস্ চ্যাটার্জি ?

মৃদু হেসে সুপর্ণ বলল, আপনার প্রতিভা।

শৈবাল বলল, তোমার মাথাটা কিন্তু ভারত সরকার কিনে নিলে পারে।

—কেন, কেন—আমার মাথার অপরাধ ?

–উতলা হয়ো না বৎস। তুমি জানো, একবার রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মাথা সরকার কিনতে চেয়েছিল ?

—কি রকম—? তিনজনে একসঙ্গে প্রশ্ন করলেন।

গল্প বলার ভঙ্গীতে শৈবাল আরম্ভ করল, একদিন রামেন্দ্রসুন্দরের কলকাতার বাড়িতে তাঁর গ্রামের বিপিন মণ্ডল এসে উপস্থিত।

রামেন্দ্রসুন্দর মণ্ডলকে প্রশ্ন করলেন, এখন তো ট্রেনের সময় নয়! এলে কি ভাবে!

মণ্ডল বলল, পায়ে পায়ে চলে এলাম বড়বাবু।

—বল কী! এতখানি পথ—তোমার এরকম দুর্বুদ্ধি কেন হল মণ্ডল ?

--আজ্ঞে, আপনার একটা খারাপ খবর পেয়ে ট্রেনের কথা আর মনে পড়ল। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম।

বিস্মিত কণ্ঠে রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, আমার কি মন্দ খবর তুমি পেলে মণ্ডল ?

কিন্তু মণ্ডল আর বলতে চায় না। শেষে অনেক অনুরোধ করার পর সে বলল, আপনার মাথা নাকি-এক লাখটাকায় কিনে নিয়েছে সরকার ? ঘি বার করে দেখবে কী আছে মগজে। আমি গেজেট পড়তে না পারলেও, ভাল লোকের কাছে শুনেছি। গেজেটে না-কী খবর বেরিয়েছে।

একথা শুনে রামেন্দ্রসুন্দর একেবারে থ'।

শৈবাল থামতেই সকলে একযোগে হেসে উঠল।

পূর্ণবেগে তখন ছুটে চলেছে ডাউন আপার ইণ্ডিয়া।

এক

অনন্ত ভ্রূ কুঁচকালো।

ভ্রূ কুঁচকে প্রায় পাঁচ সেকেণ্ড তাকিয়ে রইল ফোনের দিকে। ফোনের ঝনঝনানি একটানা চলেছে। এখন সাড়ে তিনটে। অফিসে পা দেবার পর থেকে তেত্রিশবার রিসিভার তুলেছে। আর পারা যায় না। এত ফোন এলে বিরক্তি আসা স্বাভাবিক।

অপারেটারকে বলা আছে, নিতান্ত দরকারি না হলে তাকে যেন লাইন না দেওয়া হয়। তবু অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। অপারেটারের বক্তব্য, সব কলই নাকি দরকার বলে চিহ্নিত। ফোন অ্যাটেণ্ড করতেই যদি সময় কেটে যায়, তবে কাজ করবে কখন?

অনিচ্ছার সঙ্গে অনন্ত রিসিভার তুলে নিল: হ্যালো, সোম স্পিকিং—

অপরপ্রান্ত থেকে ভেসে এল, বিকাশ বলছি···

তাও ভাল। কোন ব্যবসাদারের গজগজানি নয়।

হাইকোর্ট থেকে ফোন করছ বোধহয়? ব্যাপার কি বিকাশ, আজ এক সপ্তাহ ধরে তোমার কোন সাড়াশব্দ নেই?

আমি ছিলাম না ভাই। একটা কেসের ব্যাপারে ভুবনেশ্বর যেতে হয়েছিল।

অনন্ত হাসল। দিনকাল ভালই চলেছে তাহলে। মোটা টাকা পকেটস্থ করেই ফিরেছ নিশ্চয়?

তা মন্দ হল না। শোনো, সোমবার সন্ধ্যাবেলায় ফ্রী আছো?

তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি পজিশানটা দেখে নিই।

রিসিভার টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে, অনন্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকটা হাতে তুলে নিল। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এগারো তারিখে এসে থামল। সেদিন সোমবার। খুঁটিয়ে দেখে নিল পাতাটা।

আবার তুলে নিল রিসিভার : হ্যালো···ছ'টার পর আর কোন কাজ নেই। সোমবার সস্ত্রীক আমার ওখানে আসতে চাইছ নাকি?

বিকাশের হাসি মাখানো গলা ভেসে এল : ঠিক তা নয়—মানে এগারো তারিখ আমার ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি! তাই···

বাই জোভ···আমি ভুলেই গিয়েছিলাম···গত বছর তো আমাদের বেশ কয়েক কোর্স ডিনার খাইয়েছিলে। আমাদের ছাড়া এবার আর ক'জনকে বলছ?

আর কাউকে নয়। একগাদা লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা করলে ভারি ঝামেলা হয়। এবার শুধু তোমরা দুজন। লাইট হাউসে অনেকদিন পরে 'অফ হিউম্যান বণ্ডেজ' এসেছে, শুনেছ তো? আমরা চারজন ছবিটা দেখব। অবশ্য তার আগে কোন হোটেলে ডিনারটা সেরে নিতে হবে। কেমন ব্যবস্থা?

তার মানে, নাইট শো। চমৎকার! খবরটা শুনে মালা বেশ উৎসাহিত হবে বলে মনে হয়।

মিতার উৎসাহও কিছু কম নয়। এখন ছাড়ছি। ইতিমধ্যে অবশ্য দেখা করে নেব।

লাইন কেটে গেল।

অনন্ত রিসিভার নামিয়ে রেখে ভ্রূ কুঁচকে ওয়াল ক্লকের দিকে তাকাল। চারটে দশ। টেবিলের ওপর থেকে সবেমাত্র ডানহিলের প্যাকেটটা তুলে নিয়েছে, একজন প্রবেশ করল ঘরে।

আসুন দত্তবাবু।

দত্তবাবু বললেন, আজই সন্ধ্যার ফ্লাইটে চৌধুরীসাহেব দিল্লী যাচ্ছেন। সাড়ে বারোটার সময় আপনাকে খুঁজেছিলেন। তখন—

প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করতে করতে অনন্ত বলল, আমি তখন লাঞ্চে গিয়েছিলাম। মিস্টার চৌধুরী কি এখন অফিসে নেই?

না, স্যার। উনি একটা আন্দাজ বেরিয়ে গেছেন। যাবার আগে গাড়ির চাবিটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, আপনাকে দিতে।

দত্তবাবু সুদৃশ্য রিংসমেত চাবিটা টেবিলের ওপর রাখলেন।

ওঁর তো ফিরতে দিন দশেক দেরি হবে, তাই না ?

দিন পনেরো লাগবে স্যার। দিল্লী থেকে কাঠমাণ্ডু যাবেন। আজই খবর এসেছে, ইলেকট্রনিক ইন্টারন্যাশনালের সেমিনার আছে ওখানে। ওখানে কয়েকদিন লেগে যাবে।

অনন্ত সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, আপনি ভারি ভাল খবর শোনালেন। দিন পনেরো এখন গাড়িটা ছোটানো যাবে, কি বলেন ? ভাল কথা, অমিতাভকে একবার পাঠিয়ে দিন তো।

উনি তো আড়াইটে আন্দাজ সময় হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আর ফিরে আসেননি অফিসে ! ঠিক আছে—

দত্তবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর, ভ্রূ কুঁচকে কি যেন ভাবল অনন্ত। তারপর গাড়ির চাবিটা তুলে নিল। বিচিত্র স্বভাবের মানুষ চৌধুরীসাহেব। প্রভাকর চৌধুরী—এই অফিসের বড়কর্তা। বিয়ে করেননি। তাঁর কোন আত্মীয়স্বজন আছে কিনা, তাও জানা যায় না। একাই থাকেন কিড স্ট্রীটের একটা ফ্ল্যাটে। কর্মতৎপরতার জন্যই হোক বা আর যে কোন কারণেই হোক, অনন্তকে স্নেহের চোখেই দেখেন চৌধুরীসাহেব। তাঁকে অফিসের কাজে প্রায়ই বাইরে যেতে হয়। প্রতিবারই বাইরে যাবার আগে নিজের গাড়ির চাবিটা দিয়ে যান অনন্তকে।

অনন্ত আড়মোড়া ভাঙল। রিস্টওয়াচের ওপর চোখ বুলিয়ে অলস ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। এগিয়ে গিয়ে হ্যাঙ্গার থেকে কোট নিয়ে গলিয়ে নিল। তারপর বেরিয়ে এল ঘর থেকে। অফিসের বাইরে ফুটপাথ ঘেঁষে চৌধুরীসাহেবের ফিয়েটখানা দাঁড়িয়ে ছিল।

ড্রাইভিং সীটে বসে সবেমাত্র গাড়িতে স্টার্ট দিতে যাবে, দেখল, প্রণিমা অফিস থেকে বেরিয়ে ফুটপাথে এসে দাঁড়াল। ওর দৃষ্টি পড়ল অনন্তর ওপর। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল ওর দিকে। প্রণিমা ঘোষালসাহেবের সেক্রেটারি। ভারি স্মার্ট মেয়ে।

মৃদু হেসে বলল, আপনি ভাগ্যবান পুরুষ।

বিস্মিত অনন্ত প্রশ্ন করল, কেন ?

মিস্টার চৌধুরী বাইরে গেলেই গাড়িটা আপনাকে দিয়ে যান। এরকম সুযোগ ক'জন পায়, বলুন ?

তা বটে। তবে তোমার ভাগ্যটাও ফেলনা নয়। চৌধুরীসাহেব বাইরে গিয়েই আছেন। তোমারও কাজকর্মের কোন বালাই নেই ভারি আরামের চাকরি, কি বল ?

তা বলতে পারেন। আপনি যাচ্ছেন কোন্ দিকে ?

নর্থের দিকে। বাসায় ফিরছি।

আমাকে একটা লিফট দেবেন ? কলেজ স্কোয়ারের কাছে নেমে যাব।

অফকোর্স। উঠে পড়।

প্রণিমা উঠে বসবার পরই অনন্ত গাড়ি ছেড়ে দিল। খাপছাড়া ভাবে কথাবার্তার মধ্যেই কলেজ স্কোয়ার এসে পড়ল। প্রণিমা মামার বাড়িতে থাকে। ওর মামার বাসা সূর্য সেন স্ট্রীটে। অনন্ত যখন নিজের বিবেকানন্দ রোডের ফ্ল্যাটে পৌঁছল, তখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা। সেখানে এক অস্বস্তি তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। ফ্ল্যাটের দরজায় তালা মারা। অর্থাৎ মালা কোথাও বেরিয়েছে।

ডুপ্লিকেট চাবি নেই। সিগারেট ধরিয়ে কয়েক মিনিট ধোঁয়া ছাড়ল। এখন কি করা যায় ? তারপর কি খেয়াল হতে সামনের ফ্ল্যাটের দরজায় করাঘাত করল। অবসরপ্রাপ্ত অরিন্দম গুপ্ত এখানেই থাকেন। পেশায় তিনি বাস্তুকার ছিলেন। ভদ্রলোক ভারি অমায়িক।

দরজা খুলে গেল। ড্রেসিংগাউন শোভিত অরিন্দম বললেন, আসুন, আসুন।

অনন্ত সোফায় গিয়ে বসল। অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বলল, আপনার শরণে না এসে উপায় ছিল না। শ্রীমতী ঘরে তালা মেরে কোথায় বেরিয়েছেন।

অরিন্দম বললেন, আড়াইটে আন্দাজ বেরিয়েছেন। আমি তখন জানালার সামনে দাঁড়িয়ে।

সেকি! এতক্ষণ ধরে কি করছে ? আমি তো ভেবেছিলাম,

কিছুক্ষণ হল কাছে-পিঠে কোথাও গেছে।

কাছে-পিঠে তো নয়ই। ট্যাক্সিতে গেছেন। অফিস থেকে সবে ফিরছেন, চা খাবেন তো? ভেতরে বলে দিই।

অরিন্দম পর্দা সরিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

অনন্ত ভাবতে লাগল। ট্যাক্সিতে চেপে দুপুরবেলা মালা গেল কোথায়? আত্মীয়স্বজন অবশ্য কলকাতার চারধারে অনেক রয়েছেন। তাঁদের কারোর ওখানে গেল নাকি? মনে পড়ে গেল, এরকম আগেও দু-একবার হয়েছে। তখন বলেছিল, ভবানীপুরে গিয়েছিল মেজমামার বাড়ি।

অরিন্দম ফিরে এলেন। বসতে বসতে বললেন, ভারি চিন্তায় পড়ে গেছেন মনে হচ্ছে?

চিন্তা মানে—, অনন্ত বলল, মালার কাণ্ডজ্ঞানের কত অভাব দেখুন। চাবি একটাই—অফিস থেকে ফিরে কিভাবে ফ্ল্যাটে ঢুকব, সেকথা একবারও তার মনে পড়ল না। তাছাড়া আজকাল দিনকাল ভাল নয়। একলা ট্যাক্সিতে কোথাও যাওয়া…

একলা তো নয়। ট্যাক্সিতে এক ভদ্রলোক ছিলেন।

ভদ্রলোক!

তাই তো দেখলাম। স্মার্ট চেহারার এক ভদ্রলোক।

চা এসে পড়ল। নীরবে চা-পান শেষ হল একসময়। তখন ঘড়িতে প্রায় সওয়া ছ'টা।

পর্দার ফাঁক দিয়ে অনন্ত দেখল, ওদের ফ্ল্যাটের সামনে মালা এসে দাঁড়িয়েছে। তালা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল মিনিট খানেকের মধ্যে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়াল অনন্ত।

কি হল?

শ্রীমতী এসে পড়েছেন। চলি। স্বার্থপরের মত কিছু সময় কাটিয়ে গেলাম আপনার কাছে।

অরিন্দম হাসলেন।

ওদিকে—

মালা ভেতরে ঢুকেই ভ্যানিটি ব্যাগটা সোফার ওপর ছুঁড়ে ফেলল। তারপর ক্লান্তভাবে বসে পড়ল। মোটামুটি সুশ্রীই বলা চলে ওকে। বছর পাঁচেক বিয়ে হয়েছে। বাচ্চা না হওয়ার দরুণ চেহারার বাঁধুনীও চমৎকার। ভারি একটা নিশ্বাস ফেলে রিস্ট-ওয়াচের দিকে তাকাল, প্রায় সাড়ে ছ'টা। তারপরই ওর দৃষ্টি গেল দরজার দিকে। অনন্ত ঘরে প্রবেশ করছে। ওকে কিছুটা গম্ভীর দেখাচ্ছে।

মালা সোফা ছেড়ে এগিয়ে গেল অনন্তর দিকে ঃ রাগ হয়েছে বুঝি?

অনন্তর গলায় ঝাঁজ ঃ আনন্দে ফেটে পড়ার মত কিছু করেছ নাকি?

একটু ফিরতে দেরি হয়েছে, অমনি রাগ হয়ে গেল?

আমার অফিসের ফোন নম্বরটা তুমি জানতে?

মালা অনন্তকে জড়িয়ে ধরল। বলল মোলায়েম গলায়, তিনবার চেষ্টা করেছি, লাইন পাইনি। সে দোষটাও আমার বুঝি? কলকাতায় ফোনের অবস্থা কি রকম শোচনীয়, তা কি তোমার জানা নেই? আর রাগ করতে হবে না। বস এখানে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে চা করে আনছি।

মালার কাছ থেকে সরে এসে অনন্ত সোফায় বসল। বলল, এইমাত্র অরিন্দমবাবুর ওখানে চা খেলাম। ফ্ল্যাটের চাবিটা তুমি ওঁর ওখানে রেখে যেতে পারতে।

মালা পাশে এসে বসল ঃ এটা আমার দোষ হয়ে গেছে, স্বীকার করছি। কেন যে তখন খেয়াল করলাম না।

যাক, যা হবার হয়ে গেছে। এখন মহারাণী বলবেন কি, কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?

এইভাবে কথা বললে কিন্তু ভীষণ রেগে যাব।

অনন্ত গলা নামিয়ে বলল, তুমি তাহলে বলবে না?

কি মুশকিল, কখন বললাম বলব না। কালীঘাট গিয়েছিলাম।

কালীঘাট ?

মালা দ্রুতগলায় বলল, আকাশ থেকে পড়ছ যে! মেজদির প্রতাপাদিত্য রোডের বাড়ি কখনো যাওনি নাকি ?

অনন্ত কোট খুলে সোফার হাতলে রাখল। টাই-নট আলগা করতে করতে বলল, কে নিতে এসেছিল তোমাকে ?

কে আবার নিতে আসবে? অনেকদিন যাইনি—ভাবলাম ঘুরে আসি। ট্যাক্সি ডেকে বেরিয়ে পড়লাম। চা তো খাবে না, লাইট কিছু খাবে? আমার কিন্তু খিদে পেয়ে গেছে।

নিয়ে এসো। আমি কাপড় বদলে আসছি।

মালা কিচেনের দিকে পা বাড়াল। ছায়াচ্ছন্ন মন নিয়ে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অনন্ত। এগোতে যাবার মুখেই ওর দৃষ্টি পড়ল ভ্যানিটি ব্যাগটার ওপর। মালা তখন দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে।

অমিতাভ আকাশের দিকে তাকাল, ভারি মেঘ ঠিক যেন মাথার ওপর ঝুলছে। এখন বৃষ্টি আরম্ভ হলে আতান্তরের শেষ থাকবে না। লোকদুটো তাড়াতাড়ি এখন এসে পড়লেই বাঁচা যায়। অমিতাভ একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় এসে দাঁড়াল। অদূরের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালকে ভারি পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে।

কয়েক মিনিট পরেই দুজন লোককে ওর দিকেই আসতে দেখা গেল। ব্লু জিনস আর কলারহীন বেনলনের গেঞ্জী তাদের পরনে। শরীরের কাঠামো ভালই। আমেরিকান কায়দায় ছোটখাটো করে চুল ছাঁটা। দুজনে অমিতাভের সামনে এসে থামল। একজন বলল, কতক্ষণ এসেছেন ?

অমিতাভ চকিতে এধার ওধার তাকিয়ে নিয়ে বলল, কয়েক মিনিট হল। আপনারা যে সময়মত আসবেন, ভাবতে পারিনি।

দুজনের মুখেই চওড়া হাসি দেখা দিল। বলল একজন, কথা দিয়ে কথা রাখাটাই হল আমাদের ব্যবসা। এ ব্যাপারে ফাঁকি পাবেন না। এখন বলুন, আপনার সমস্যাটা কি ?

ঘোরালো কিছু নয়। একজন লোককে…

সরিয়ে দিতে হবে?

দ্বিতীয়জন বলল, কলকাতা থেকে তো যখন-তখন পারি—প্রয়োজন হলে দুনিয়া থেকেও। তবে ফি'টা কয়েক গুণ বেড়ে যাবে।

না, না, দুনিয়া থেকে সরাতে হবে না—দ্রুতগলায় অমিতাভ বলল, আমার সমস্যাটা অন্যরকম।

কি রকম শুনি?

একজনকে তার স্ত্রীর কাছ থেকে আলাদা করে দিতে হবে। এমন একটা ব্যাপার সৃষ্টি করতে হবে, যাতে সে নিজের স্ত্রীকে ডাইভোর্স করে দেয়।

কেল্টু, ব্যাপার কিছু বুঝছ?

বিচিত্র হাসিতে মুখ ভাসিয়ে কেল্টু বলল, এই সহজ কথাটা বুঝতে পারব না দোস্ত! ব্যবসায় নামবার পর কম কিছু তো দেখলাম না। আমরা ডাইভোর্সের ব্যবস্থা করে দেব, তারপরই ইনি সেই মহিলাকে নিজের জমিদারি বানিয়ে ফেলবেন। কি বলেন মশাই, ঠিক বললাম তো?

হ্যাঁ…মানে, অনেকটা…

এই দেখ, তোতলাতে আরম্ভ করলেন যে! এরকম নার্ভাস মক্কেল নিয়ে সময় সময় বেশ ঝামেলা হয়ে দাঁড়ায়। তুমি যে কিছু বলছ না পিকু?

পিকু বলল, ওঁকে নার্ভাস হতে দাও, তাতে আমাদের কি গেল এল? শুনুন মশাই, এ সমস্ত কাজ চট করে হয় না। কিছু সময় লাগবে।

অমিতাভ নিজেকে স্বাভাবিক করে নিয়ে বলল, কত সময় লাগবে?

এখনো তো কিছুই শুনিনি। আগে সব শুনি, তারপর বলা যাবে। সে ভদ্রলোক পয়সাওয়ালা? গাড়ি আছে?

মোটা মাইনের চাকরি করেন। অবস্থাপন্ন বলা যেতে পারে। বর্তমানে একটা ফিয়েট ওঁর কাছে আছে।

গাড়ির রং এবং নম্বরটা বলুন ?

অমিতাভ বলল।

এরপর তিনজনের মধ্যে প্রায় ঘণ্টাখানেক কথা হল। সমস্ত খুঁটিনাটি জেনে নিল কেল্টু আর পিকু। আঁকাবাঁকা পথের তারা পাকা খেলোয়াড়। এই কাজটা তাদের কাছে ছেলেখেলা মাত্র। অ্যাডভান্স হিসাবে কিছু টাকা হাত বদল হল। তখন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে।

বিকাশ আর মিতাকে কিছুটা এগিয়ে দিয়ে অনন্ত ফিরে এল ফ্ল্যাটে। ম্যারেজ অ্যানিভার্সারিতে যে প্রোগ্রাম স্থির হয়েছিল, সেই সম্পর্কেই আনুষ্ঠানিক ভাবে ওরা বলতে এসেছিল। সমস্ত শুনে মালা তো মহা খুশি।

এক সময় একলা পেয়ে বিকাশ বলল, তোমাকে আজ যেন মন-মরা দেখাচ্ছে। কিছু হয়েছে নাকি ?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনন্ত বলল, কিছু একটা হয়েছে, অথচ কিছু করে উঠতে পারছি না। চিন্তার কারণ সেটাই।

এর মানে কি ? আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। সমস্ত খুলে বল। হয়তো আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব।

পারবে না।

কারণ ?

ব্যাপারটা মালাকে নিয়ে।

কিছুটা অবাক হয়ে বিকাশ বলল, মালাকে নিয়ে ? সে আবার কি করল ?

সে কি করছে, সেটাই তো আমি জানতে চাই। এখন এ প্রসঙ্গ থাক। পরে তোমাকে সব কথা বলব।

…ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে প্রবেশ করল অনন্ত। ক্লান্ত চোখে ঘরের চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে গা এলিয়ে দিল সোফায়।

মালা টেলিভিসনের সামনে বসার উপক্রম করছিল, অনন্তকে ওইভাবে বসতে দেখে এগিয়ে এল : শরীর খারাপ বোধ করছ ?

না তো।

তোমাকে কেমন দেখাচ্ছে। তাছাড়া…

তাছাড়া ?

কয়েক দিন থেকে বেশ গম্ভীর। ব্যাপারটা কি ?

অনন্ত ভারি নিশ্বাস ফেলে বলল, ব্যাপারটা তোমাকে নিয়েই। ইদানিং তুমি কিছু আমার কাছে লুকিয়ে যাচ্ছ। এমন কি মিথ্যার আশ্রয় নিতেও তোমার বাঁধছে না।

আশ্চর্যের ভাব মুখে ফুটিয়ে মালা বলল, এ সমস্ত তুমি কি বলছ ? আমার আবার ব্যাপার কি ? মিথ্যে কথাই বা বলতে যাব কেন ?

বলেছ মালা, আমি নিঃসন্দেহ হয়েই বলছি, তুমি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছ।

কোন কথাটা মিথ্যা বলেছি, বল ?

সেদিন তুমি বলেছিলে, ট্যাক্সি করে একাই মেজদির বাড়ি গিয়েছিলে। কথাটা বলেছিলে কি ?

হ্যাঁ, বলেছিলাম। তাতে হয়েছেটা কি ?

ম্লান হেসে অনন্ত বলল, হয়েছে এই, সেদিন অরিন্দমবাবু তোমাকে একজন লোকের সঙ্গে ট্যাক্সিতে যেতে দেখেছেন। হয়েছে এই, খোঁজ নিয়ে দেখেছি, গত দু'মাসের মধ্যে তুমি তোমার মেজদির বাড়ি যাওনি। আরো শুনবে ? তোমার ভ্যানিটি ব্যাগে দুটো সিনেমার টিকিট পাওয়া গেছে। সেদিন লাইট হাউসে তুমি একজনের সঙ্গে ম্যাটিনি শো দেখতে গিয়েছিলে।

আচ্ছা, আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করা হয়েছে !

তুমি মিথ্যার আশ্রয় নিতে পার, আর আমি গোয়েন্দাগিরি করতে পারব না ! এখন আমি জানতে চাই, লোকটা কে ?

মালা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, তুমি জোর করে কিছু জানতে চাইলেই, আমাকে উত্তর দিতে হবে নাকি ?

জোর জবরদস্তির কথা নয়। বাস্তবকে স্বীকার করে নাও। যা হবার হয়ে গেছে। আমি ব্যাপারটা ভুলে যেতে রাজী আছি।

ভুলে যেতে রাজী আছো, মানে—তুমি আমাকে দয়া করছ নাকি? আমি করেছিটা কি যে তুমি আমাকে দয়া করবে?

শোনো মালা, চেঁচিয়ে কথা বললেই, সত্যি মিথ্যা হয়ে যাবে না। কোন স্বামী চায় না, তার স্ত্রী কোন বিশ্রী ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ুক তুমি ভেবে দেখ, দু' নৌকায় পা দিয়ে চললে, ফল কি ভাল হতে পারে?

তুমিও এক নৌকায় ভাসছ বলে মনে হয় না।

আমি !!!

আকাশ থেকে পড়লে যে?—তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে মালা বলল, ভেবেছ, আমি কিছু জানি না। তোমাদের অফিসের প্রণিমা—তার সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কি, সেকথা শুধু আমি নয়, অনেকেই জানে।

বাজে কথা। তোমার মত স্ত্রী থাকতে আমি পরের পেছনে ছুটব কেন? তুমিও আমায় ভালবাসতে মালা। হঠাৎ এমন কি হল, যার জন্যে···

কিছু হয়নি। তোমার বকবকানি আমি অনেকক্ষণ ধরে শুনছি, আর নয়। তুমি ভুলে যাচ্ছ, আমার ধৈর্যের একটা সীমা আছে।

এবার গম্ভীর গলায় অনন্ত বলল, এইভাবে তাহলে তোমার দোষটা উড়িয়ে দিতে চাও? চমৎকার। এখন আমি জানতে পারি কি, শেষ পর্যন্ত আমাদের সম্পর্কটা কি দাঁড়াবে?

কি আবার দাঁড়াবে? যেমন আছে, তাই থাকবে। তোমার মতলব আমি বুঝতে পেরেছি। আমাকে ঘাড় থেকে নামিয়ে প্রণিমাকে তুমি এই ফ্ল্যাটে ঢোকাতে চাও। তা হবে না। এত সহজে আমি তোমাকে রেহাই দেব না।

কথা শেষ করেই মালা ওখান থেকে উঠে গেল।

বিমর্ষ ভাবে অনন্ত সিগারেটের জন্য পকেট হাতড়াতে লাগল।

বেলা তখন একটা।

অন্যান্য দিনের কিছু আগেই অনন্ত লাঞ্চ সারতে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ে। আজ যে মনের অবস্থা শোচনীয় শুধু, তাই নয়, খিদের তাগিদও অনুভব করেনি। অ্যাসট্রে সিগারেটের টুকরোয় ভরে উঠেছে। বলতে গেলে একনাগাড়ে ধোঁয়া ছেড়ে চলেছে কয়েক ঘণ্টা ধরে। মালা তাকে ঠকাচ্ছে।···কিন্তু লোকটা কে?

আর ভাবতে ভাল লাগে না। অনন্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কোটটা হ্যাঙ্গার থেকে নেবার জন্য এগিয়ে যাবার মুখেই থামল—

প্রণিমা ঘরে প্রবেশ করল: বেরোচ্ছেন নাকি?

ভাবছিলাম ঘুরে আসি খানিক। মনের অবস্থা আজ বিশেষ সুবিধের নয়। যাক, ওকথা। কিছু বলবে নাকি?

প্রণিমা বলল, দরকারি কিছু নয়। লাঞ্চ আওয়ারে আপনি নিজের ঘরে রয়েছেন, জানতে পেরে ভাবলাম···

বেশ তো। বসো।

অনন্ত আবার নিজের চেয়ারে ফিরে এল।

না বেরোলেও চলবে আমার। অফিসে ক'দিন না এলেই তো পার। বড়সাহেব নেই—তোমার আর কাজটা কি?

বসতে বসতে প্রণিমা বলল, ভাল লাগে না বাড়িতে। একটা কথা বলছিলাম, অবশ্য জানি না, বলাটা কতদূর ঠিক হচ্ছে···

বিলিতি এটিকেট ছেড়ে, এখন কথাটা কি, তাই বল?

আমাদের অফিসের অমিতাভ দত্তর সঙ্গে আপনাদের কি পারিবারিক সম্পর্ক আছে?

অনন্ত সোজা হয়ে বসল: না তো। এ প্রশ্ন কেন?

আমিও তাই জানতাম। তবে···

ব্যাপারটা কি? অমিতাভ তোমাকে কিছু বলেছে নাকি?

না, না। আমি জেনারেল ডিপার্টমেন্টের কারোর সঙ্গে কথা বলি না। হাতে কাজ নেই, ঘুরতে ঘুরতে অপারেটার আইরিনের কাছে গিয়ে বসেছিলাম। ফোন আসছিল, যাচ্ছিল। আইরিন

যথাস্থানে লাইনগুলো চালান দিচ্ছিল। হঠাৎ দেখলাম, আইরিন আপনার ফ্ল্যাটের ফোন নম্বর টুকে নিয়ে কানেকশন করছে।

তারপর—

প্রথমে আমি তেমন গা করিনি। আপনি নিজের ফ্ল্যাটে ফোন তো করতেই পারেন। কিন্তু কানেকশন পাবার পর আইরিন যখন যথাস্থানে লাইন দিয়ে বলল, মিস্টার দত্ত, কথা বলুন।···তখন আমি অবাক হলাম।

চিন্তিত গলায় অনন্ত বলল, তুমি ভাবলে, অমিতাভ আমাদের এত ঘনিষ্ঠ যে, আমার অনুপস্থিতিতে আমার স্ত্রীকে ফোন করতে পারে।

অনেকটা সেই রকম।

কি কথাবার্তা হল, শুনলে নাকি ?

ইতস্তত ভঙ্গিতে প্রণিমা বলল, এসব ব্যাপারে আগ্রহ দেখানো ভব্যতা নয়। তবু শেষ পর্যন্ত কৌতূহল চাপতে পারলাম না। আইরিনকে বলাতে লাইনের সঙ্গে কানেকশন করে দিল। শুনলাম, আপনার স্ত্রী বলছেন, ছটো থেকে আড়াইটের মধ্যে লাইট হাউসের কাছে এসো। অনেক কথা আছে।···আমি বেশ অবাক হলাম মিস্টার সোম। তাই···

অবাক হবার কিছু নেই। আমি জানি না, হয়তো অমিতাভ মালার বাপের বাড়ির পাড়ার লোক। আগে থেকেই জানাশোনা ছিল বোধহয়।

কথাটা সহজ ভাবে বলার চেষ্টা করলেও, অনন্তর গলা কেঁপে গেল। ভারি দমে গেল মন। শেষ পর্যন্ত অমিতাভ।···কি আছে লোকটার মধ্যে, যাতে মালার মত মেয়ে পাগল হয়ে উঠেছে ? এই তাহলে ব্যাপার।

প্রণিমা অনন্তর ভাবান্তর লক্ষ্য করল। ও প্রসঙ্গকে পাশ কাটিয়ে বলল, সময় তো পার হয়ে যাচ্ছে। আজ লাঞ্চে যাবেন না নাকি ?

শরীর বিশেষ ভাল নেই। এবেলা উপবাস দিলেই চাঙ্গা হয়ে

উঠব। তুমি বরং লাঞ্চ সেরে এসো।

তাই যাই।—চেয়ার ছেড়ে প্রণিমা উঠে পড়ল।

বেলা তখন তিনটে। লাইট হাউসের সামনে যে ছোট রেস্টুরেন্ট আছে, বইয়ের এবং অন্যান্য নানা ধরনের দোকানের ভিড়ে চোখেই পড়ে না। তবে মানতেই হবে, রেস্টুরেন্টের পরিবেশ বেশ ছিমছাম। একটু বেশি দাম পড়লেও, খাদ্য তালিকার বৈচিত্র্য লক্ষণীয়।

এখানেই একটা টেবিলে মুখোমুখি বসে আছে মালা আর অমিতাভ। মালা হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছে। তাকে কিছুটা উত্তেজিত দেখাচ্ছে। অমিতাভ শুনছে মন দিয়ে, তবে তাকে দেখে বুঝতে পারা যাচ্ছে না সে এখন উত্তেজিত কি বিমর্ষ।

মালা নিজের মূল বক্তব্য শেষ করবার পর বলল, আমিই ছটফট করছিলাম, তোমাকে সমস্ত কথা বলার জন্য। তুমি ব্যাপারটা বুঝছ তো?

নিরুৎসুক গলায় অমিতাভ বলল, বোঝাবুঝির কিছু নেই। কথা একটাই, আমরা ধরা পড়ে গেছি। সত্যি কথা বলতে কি, একদিক থেকে ভালই হল। লোকটা আজ নয় কাল জানতে পারতই। এখনই জেনে গেল।

তোমার এই নিরুৎসুক ভাব কিন্তু আমার ভাল লাগছে না। কিছু একটা তাড়াতাড়ি কর। আমি তো ভয়ে মরে যাচ্ছি।

অনন্ত সোমকে ভয় পাবার কিছু নেই। সমস্ত কিছু জেনে যাবার পর, স্বামীত্ব ফলাতে গিয়ে বাড়াবাড়ি কিছু করবে না। তোমার আমার চোখে তার যত দোষই থাক না কেন, একটা গুণ কিন্তু আছে—সে বোকা নয়।

তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু এতে আমাদের কি লাভ হচ্ছে?

মৃদু হেসে অমিতাভ বলল, লাভের হিসাব রেখে সব সময় লোকে কথা বলে না। ঘাবড়াবার কিছু নেই। প্ল্যান মতই এগোচ্ছি আর ক'টা দিন, তারপরই আমরা কাজ গুছিয়ে নেব।

প্ল্যানটা কি ?

প্ল্যান শুনে কি করবে ? মেয়েদের পেটে কথা থাকে না। সময় তো এত কাটল, আর ক'টা দিন অপেক্ষা করতে পারছ না ?

মালার গলায় অভিমানের ছোঁয়া : ব্যাপারটা আমাকে নিয়ে, অথচ আমাকেই তুমি কিছু বলবে না। এর মানে কি ?

অমিতাভ মুখে হাসি টেনে বলল, অমনি রাগ হয়ে গেল ! নাকি এটা অভিমান। বেশ, কি জানতে চাও বল ?

তোমার প্ল্যানটা কি ?

অত্যন্ত সাদামাটা। এই বিশাল কলকাতায় প্রত্যহ কত অ্যাক্সিডেণ্ট হচ্ছে—হচ্ছে তো ?

তা তো হচ্ছেই।

আমাদের পরিচিত কোন ব্যক্তির অ্যাক্সিডেণ্ট হতে পারে ?

স্বচ্ছন্দে পারে।

ভরসা করি, আমার আর কিছু বলার দরকার নেই। খোলাখুলি ভাবে সমস্ত শুনলে, তোমার অস্বস্তি ভীষণ বেড়ে যাবে। মেয়েদের নার্ভ তেমন স্ট্রং হয় না কিনা।

এতক্ষণ পর অমিতাভ সিগারেট ধরাল।

ওদিকে—

অনন্ত যখন লাইট হাউসের বারান্দার তলায় এসে দাঁড়াল, তখন কাঁটায় কাঁটায় পৌনে চারটে। আরো কিছুক্ষণ আগে আসবারই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু অফিস থেকে বেরোবার মুখেই কয়েকজন এসে পড়ায়, বেরোতে দেরি হয়ে গেল। এখন মালাকে হাতেনাতে ধরতে পারলে হয়।

এদিক ওদিক তাকাল অনন্ত। কাচের বিশাল দরজা ঠেলে ভেতরে গেল। মালার চিহ্নমাত্র নেই। আবার বাইরে এসে সামনের ফুটপাথের দিকে তাকাতেই দেখল, ফল যারা ফেরি করছে, তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে অমিতাভ দুজন লোকের সঙ্গে কথা বলছে।

রাস্তা অতিক্রম করল অনন্ত।

ওকে দেখেই অমিতাভ থতমত খেলো। লোক দুজন ছিটকে গেল এধার ওধার।

কে হে, তুমি এখানে?

নিজেকে স্বাভাবিক করতে করতে অমিতাভ বলল, একটা কাজে এসেছিলাম।

ছুটি নাওনি তো? খবর পেলাম, তুমি প্রায়ই অফিস থেকে অফ হয়ে যাচ্ছ। ভাল হ্যাবিট নয় কিন্তু।

ঠিক তা নয় স্যার…মানে…

যেতে দাও ওকথা। দেখা হয়ে গিয়ে ভালই হল। এসো, দু'কাপ কফি নিয়ে বসা যাক।

অনন্ত রেস্টুরেণ্টের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। অনিচ্ছার সঙ্গে যেতে হল অমিতাভকেও। খদ্দের বিশেষ ছিল না। কোণের দিকের একটা টেবিলে বসল দুজনে মুখোমুখি। বেয়ারা আসতেই অর্ডার দেওয়া হল কফির। নির্বিকার ভঙ্গিতে অনন্ত প্রশ্ন করল, মালা চলে গেছে?

অমিতাভের বুকের মধ্যেকার রক্ত ছলাৎ করে উঠল: মালা… মানে…

আমার স্ত্রীর কথা বলছি। এই রেস্টুরেণ্টেই বসেছিলে বোধহয় দুজনে?

কি বলছেন স্যার। আমি তো…

বুঝতে পারছ না? এনকোয়ারি করে দেখা যাক। বেয়ারা আসছে, ওর সঙ্গে কথা বলে দেখি।

বেয়ারা এসে দু'কাপ কফি রাখল টেবিলের ওপর।

অনন্ত পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে এগিয়ে ধরল তার দিকে: ওহে, টাকাটা নাও।

বিস্মিত বেয়ারা নোটটা নিল।

অনন্ত আবার বলল, টাকা তোমায় এমনি দিচ্ছি না। আমার কিছু জানবার আছে। আমার সামনে যে ভদ্রলোক বসে আছেন,

ইনি কি কিছুক্ষণ আগে এখানে এসেছিলেন ?

অমিতাভকে ভাল করে দেখে নিয়ে বেয়ারা বলল, হ্যাঁ, বাবু। দেওয়াল ঘড়িটার কাছাকাছি বসেছিলেন।

অমিতাভ ঘামতে আরম্ভ করেছে।

সঙ্গে আর কেউ ছিল ?

সঙ্গে একজন মহিলা ছিলেন।

তুমি যেতে পার।

বেয়ারা চলে যেতেই অনন্ত তীক্ষ্ণ গলায় বলল, মিথ্যে কথাটা ধরা পড়ে গেল দেখলে তো ! মালা বোধহয় পিছনের দরজাটা ব্যবহার করেছে।

অমিতাভ আপ্রাণ চেষ্টা করে নিজেকে ধাতস্থ করতে করতে বলল, আপনার স্ত্রী এখানে আসতে যাবেন কেন ? বেয়ারা ঠিকই বলেছে। যে মহিলা আমার সঙ্গে ছিলেন, তিনি আমার বান্ধবী।

বেয়ারা ঠিক বললেও, তুমি ঠিক বলছ না। তোমার বান্ধবীটি মালা ছাড়া আর কেউ নয়। অফিসে ফোন করেছিল—তোমায় এখানে সে আসতে বলেছিল। এ সমস্ত কথা জানতে আমার অসুবিধা হয়নি।

কি বলবে অমিতাভ ভেবে পেল না।

চুপ করে রয়েছ যে ?

কি ধরনের উত্তর পেলে আপনি খুশি হবেন ?

তীক্ষ্ণ গলায় অনন্ত বলল, তোমার সাহসের প্রশংসা করতে পারলে আমি খুশি হতাম। একটা কথা ভেবে দেখেছ কি ? পরস্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে যাওয়া সাধারণ ব্যাপার নয়। এর একটা আইনগত দিক আছে। তোমার ভবিষ্যতের দফারফা হয়ে যেতে পারে, তা কি এখনো বুঝতে পারছ ? বেয়ারা—

বেয়ারা এসে দাঁড়াল।

একটা পাঁচ টাকার নোট তার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, কফির দাম।

যদিও এক চুমুক কফিও অনন্ত খায়নি।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, মালার সঙ্গে বোঝাপড়াটা শেষ করে নিই। তারপর আইন কথা বলবে।

কথাটা শেষ করেই রেস্টুরেন্ট থেকে সে বেরিয়ে এল। ফিয়েট পার্ক করা ছিল নিউ এম্পায়ারের একটু ওধারে। মনের মধ্যে তখন ঝড় চলেছে। গাড়িতে বসেই স্টার্ট নিল। ফিয়েট ধাবিত হল উত্তরমুখো।

জ্যাম এবং মিছিলের বাধা কাটিয়ে অফিস থেকে নিজের ফ্ল্যাটে যখন অনন্ত পৌঁছল, তখন ছ'টা কুড়ি। যা অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, তাতে বেশ তাড়াতাড়িই পৌঁছতে পেরেছে বলা চলে।

কলিংবেল বাজাতেই দরজা খুলে দিল বিকাশ।

কিছুটা ঝাঁঝের সঙ্গে বিকাশ প্রশ্ন করল, ছিলে কোথায় এতক্ষণ? তুমি কখন এসেছ?

পাঁচটায় আসবার কথা আমাদের, ঠিক সময় এসেছি। আজ এগারো তারিখ, ভুলে গিয়েছিলে নাকি?

ভুলে যাইনি। মানে···তোমাদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি, আমার ভুলে গেলে চলবে কেন বিকাশ!

তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু ছিলে কোথায় এতক্ষণ? তোমার অফিসে ফোন করেছিলাম। শুনলাম, চারটের কিছু আগে বেরিয়েছ।

সহজ গলায় অনন্ত বলার চেষ্টা করল, আর বল কেন, এক জায়গায় আটকে পড়েছিলাম।

মিতা হাসিতে মুখ ভাসিয়ে এগিয়ে এল: বুঝলাম, আপনি কাজের মানুষ। আর দয়া করে সময় নষ্ট করবেন না। কাপড়-চোপড় বদলে আসুন! আমরা এখুনি বেরিয়ে পড়ব।

ম্যাডামের আজ্ঞা শিরধার্য।

আড়চোখে মালার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে অনন্ত পাশের

ঘরে চলে গেল। সেজেগুজে ড্রেসিং টুলের ওপর বসেছিল। ট্রাউজার আর পাল্টালো না, চটকদার একটা হাওয়াই শার্ট গায়ে গলিয়ে নিয়ে, ড্রইংরুমে ফিরে আসার মুখেই অনন্ত দেখল, বিকাশ প্রবেশ করছে এঘরে।

অনন্ত, একটা কথা তোমায় বলতে এলাম।

বল ?

মহিলাদের সামনে বলব না বলেই এখানে আসতে হল। কথাটা অপ্রিয়। তুমি কেন ডিসটার্বড্ আছো, আমি জেনেছি।

বিস্মিত গলায় অনন্ত প্রশ্ন করল, কিভাবে জানলে ?

আজই সকালে একজন ফোনে আমায় ব্যাপারটা জানাল। সংবাদদাতা নিজের পরিচয় কিন্তু কিছুতেই দিল না।

গলার আওয়াজে বুঝতে পারলে না ?

আমাদের পরিচিতদের মধ্যে কেউ নয়।

অনন্তর মুখে ম্লান হাসি খেলে গেল।

আমার কনজুগাল লাইফ কি রকম শোচনীয় হয়ে উঠেছে বুঝতেই পারছ। অথচ যেভাবে মালাকে চার্জ করা উচিত, আমি সেরকম কিছুই করিনি। ভাবছি—

আমিও একটা কথা ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি সোম। ওই লোকটার কি এমন স্ট্যাটাস ? তোমার তুলনায় তো কিছুই নয়।

পারসোনালিটিও এমন কিছু নয়। কি দেখে যে মালা ভুলেছে, ভগবান জানেন।

আমি বলছিলাম—বিকাশ বলল, তুমি যদি রাজি হও তাহলে আমি আর মিতা এ ব্যাপারে নাক গলাতে পারি।

অর্থাৎ—?

মালাকে নিয়ে আমরা বসবো। এই ব্যাপার নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করব। তারপর—

আলোচনার মাধ্যমে যদি ব্যাপারটা মিটে যায়, আমি সমস্ত কিছু ভুলে যেতে রাজি আছি বিকাশ। তা যদি না হয়, তবে আমার

সম্মান নিয়ে অবাধে খেলা চালিয়ে যাবার সুযোগ আমি দিতে পারব না। আইনের দ্বারস্থ হতেই হবে। তারপর মালা কার সঙ্গে কি করে বেড়াচ্ছে তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা থাকবে না।

বটেই তো। ভারি বিশ্রী পরিস্থিতি। ওই কথাই রইল তাহলে। আজ আর কিছু নয়। হৈ-হল্লা করে সময়টা কাটিয়ে দেওয়া যাক। কাল আমি আর মিতা কোন সময় আসছি মালার কাছে।

মালা নিজের রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল। পৌনে বারোটা।

মিনিট কয়েক হল ওরা 'গ্লোব'এর সামনেকার ফুটপাথে এসে দাঁড়িয়েছে। ছবিটা বেশ বড়, নইলে ইংরিজি ছবির এত সময় নেবার কথা নয়। বিবাহ-বার্ষিকী উপলক্ষে বিকাশ আজ ভালই খরচ করেছে। নৈশ আহারের রাজকীয় ব্যবস্থা ছিল 'প্রিন্সেসে'। তারপর গ্লোবে এই মন-মাতানো সিনেমা। এবার আস্তানায় ফেরার পালা। ভিড় হাল্কা হয়ে যাবার পরই ওরা ফিয়েটের দিকে এগুলো।

এই, সোম—

অনন্ত পকেট থেকে চাবি বার করে গাড়ির দরজা খুলতে যাচ্ছিল, বিকাশের উত্তেজিত গলার আওয়াজ পেয়ে ফিরে দাঁড়াল।

কি হল ?

তোদের চৌধুরী সাহেবকে দেখলাম।

মাথা খারাপ। তিনি এখন দিল্লীতে। ফিরতে এখনো আরো কয়েকদিন লাগবে। অন্য কাউকে দেখে থাকবে।

বিকাশ দ্রুত গলায় বলল, আমি কি ভদ্রলোককে চিনি না নাকি ? পরিষ্কার দেখলাম ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের দিকে এগিয়ে গেলেন। ভিড়ের মধ্যে মিশে গেছেন, নইলে এখনও দেখা যেত।

তার মানে উনিও আমাদের সঙ্গে সিনেমা দেখেছিলেন ?

তাই হবে।

কি যে বলো তার কোন মানে হয় না। উনি ফিরে এসেছেন, অথচ অফিসে গেলেন না ? আমাকে তো খবর দেবেন, ওঁর গাড়িটা

আমার কাছে রয়েছে। যেতে দাও ওকথা। এসো, রওনা দেওয়া যাক।

সকলে বসার পর ফিয়েট গতি নিল।

অন্যান্য সিনেমা হলের শো অনেক আগেই ভেঙেছে। চৌরঙ্গী ঝিমিয়ে পড়া ভাব। পথচারি নামমাত্র। গাড়ির যাতায়াতও অনেক কম। জহরলাল নেহেরু রোড মাড়িয়ে ফিয়েট চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ে পড়ল। কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীটে মিতা আর বিকাশকে নামিয়ে দিয়ে অনন্ত নিজেদের ফ্ল্যাটে ফিরবে।

মালা বলল, আপনি চৌধুরী সাহেবকে ঠিক দেখেছেন?

বিকাশ বলল, সোমের কথাই ঠিক। আমি বোধহয় ভুলই দেখেছি।

চৌধুরী সাহেব দিল্লী থেকে নেপাল যাবেন। কলকাতা ফিরতে এখনো কম করেও আরো আটদিন।

তার মানে, আমার চশমার পাওয়ার বাড়াতে হবে।

ফিয়েট বৌবাজার স্ট্রীট অতিক্রম করল। এধারটা বেশ নির্জন। লোক চলাচল নেই বললেই চলে। অবশ্য অজস্র মানুষ ফুটপাথে শুয়ে আছে চাদর বা ওই জাতীয় কিছু মুড়ি দিয়ে। অধিকাংশ পশ্চিমার এই এক অভ্যাস, যে কোন ঋতুই হোক না কেন, কিছু একটা মুড়ি না দিয়ে শুতে পারে না।

আরো শ'খানেক গজ এগোবার পর অনন্ত লক্ষ্য করল, একজন লোক রাস্তার মাঝ বরাবর এসে পড়েছে। তাকে পাশ কাটাতে গিয়ে আরেকজন প্রায় মুখোমুখি এসে পড়ল। গুরুতর একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবার মুখেই প্রাণপণে ব্রেক কষল অনন্ত। টায়ারের ঘষড়ানির তীক্ষ্ণ শব্দের মধ্যে প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে ফিয়েট থেমে গেল।

এরপর যা ঘটল, তা হিন্দী সিনেমাতেই সম্ভব।

পলকের মধ্যে একজন এসে অনন্তর মাথায় শক্ত কিছু দিয়ে আঘাত করল। স্টিয়ারিং হুইলের ওপর তার মাথা এলিয়ে পড়ল। রক্তধারা বইতে লাগল। ওদিকে দ্বিতীয়জন বিকাশকেও কাবু করে ফেলেছে। রক্তাক্ত মাথায় তার শরীর নিচের দিকে গুঁজড়ে পড়েছে।

ভয়ে, আতঙ্কে মিইয়ে পড়া মহিলা দুজনের দিকে ওরা এবার এগোল। একজনের হাতে রিভলবার? দরজা খুলে ফেলা হল একধারের। হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিতেই রাস্তায় এসে পড়ল মালা। মিতার গালে ততক্ষণে ওজনদার এক চড় এসে পড়েছে। রাজ্যের অন্ধকার নেমে এল তার চোখের ওপর।

সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল মিনিট দুয়েকের মধ্যেই।

মিতা নিজেকে সহজ করে নিতে কতক্ষণ সময় নিয়েছিল, তার কোন হিসেব নেই। একটা সোরগোল কানে আসতে মাথা তুলল। নিজের শরীরটাকে সোজা করে নিল কোন রকমে। গাড়ির পাশে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। লোক জড়ো হয়েছে বেশ কিছু। তারা উত্তেজিত ভাবে কি সমস্ত আলোচনা করছে। অনন্ত আর বিকাশ তখনও মূর্ছার আওতায়।

মিতাকে উঠে বসতে দেখেই প্রশ্নের ঝড় আরম্ভ হয়ে গেল। মিতা কিভাবে ঘটনাটা বলবে, ভেবে পাচ্ছে না। ব্যাপারটা রাষ্ট্র হওয়ার মূলে একজন ট্রাক-ড্রাইভার। রাস্তার মাঝবরাবর একটা গাড়িকে তেরছা ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, নিজের ট্রাক থামিয়েছিল। তারপর নেমে এসে অবস্থা দেখেই তো তার পিলে চমকে উঠেছে। ফুটপাথে শায়িত লোকজনদের তুলতে সে আর কাল-বিলম্ব করেনি।

এই রকম পরিস্থিতিতে একটা ওয়ারলেস ভ্যান এসে উপস্থিত হল। এর পরের অবস্থা সামাল দিল পুলিশ। বিকাশ আর অনন্তকে নিয়ে যাওয়া হল মেডিক্যাল কলেজে। খবর পেয়েই স্থানীয় থানা থেকে চিত্ত বক্সী দ্রুত ছুটে এলেন। মিতার এজাহার নেওয়া হল। মালা-অপহরণ একটা রহস্যের ধাঁধা হয়ে দাঁড়াল। এই অঞ্চলে এরকম ঘটনা অনেকদিন ঘটেনি।

বক্সী মিতাকে বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে, একপাশে সরে এসে সহকারীর দিকে তাকিয়ে বললেন, একটা ব্যাপার হিসেবে মিলছে না দত্ত। এ মহিলাও দেখতে শুনতে খাসা। গুণ্ডারা একে ছেড়ে

গেল কেন ?

তাড়াতাড়িতে দুজনকে নিয়ে যাওয়ার রিস্ক হয়তো ওরা নিতে চায়নি।

ঘটনাটা যদি দৈবাৎ ঘটে থাকে, তাহলে তোমার কথা ঠিক। আমি বলতে চাইছি, গুণ্ডারা নির্জন রাস্তা দিয়ে একটা ঝকঝকে ফিয়েটকে আসতে দেখে থামাল। তারপর অন্য কেউ বা পুলিশ আসবার আগেই ওই মহিলাকে নিয়ে দ্রুত সরে পড়ল।

সহকারী সুনীল দত্ত বলল, এছাড়া আর কি হতে পারে !

গলা ঝেড়ে নিয়ে বক্সী বললেন, বলতে হবে গুণ্ডারা দামী জিনিসপত্রর লোভে একাজ করেনি। দেখলে তো, ভদ্রমহিলার গায়ে গয়না রয়েছে। ভদ্রলোক দুজনের রিস্টওয়াচ আর আংটি যথাস্থানে রয়েছে। এক্ষেত্রে—

কলকাতায় সেক্সম্যানিয়াকের অভাব আছে, একথা জোর দিয়ে বলা চলে না।

তা বটে। ভদ্রলোক দুজন ধাতস্থ হোন। ওঁদের সঙ্গে কথা বলার পর আলোর সন্ধান পাওয়া যাবে মনে হয়।

চিত্ত বক্সী সিগারেট ধরালেন।

ভোর চারটের পর অনন্ত আর বিকাশ ধাতস্থ হল। মালাকে গুণ্ডারা নিয়ে গেছে শুনে তারা হতভম্ব। এই কাজ অমিতাভ করেছে ভেবে নিতে দুজনেরই অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। সে কি এত নিচে নামতে পারবে ? তাছাড়া তার কি ভয় নেই ? সেক্ষেত্রে অবৈধ ব্যাপারটা আগেই জানাজানি হয়ে গেছে ?

বক্সী দুজনের এজাহার নিলেন। এরপর কিছু প্রশ্ন রাখলেন ওদের সামনে : গুণ্ডা দুটোকে পরে দেখলে চিনতে পারবেন ?

বিকাশ বলল, খুব ভাল করে অবশ্য দেখার সুযোগ পাইনি। তবে মনে হয় চিনতে পারব।

অনন্ত বলল, ওদের দুজনকে আমি আগে লাইট হাউসের সামনে দেখেছিলাম।

কি করছিল তারা তখন ?

আমাদের অফিসের অমিতাভ দত্তর সঙ্গে কথা বলছিল। আমি রাস্তা পার হতেই ওরা সরে পড়ল।

অমিতাভ দত্তও সরে পড়েছিল ?

না। সে কোথাও যায়নি। তাকে নিয়ে আমি একটা রেস্টুরেণ্টে বসেছিলাম। কিছু কথাবার্তা হয়েছিল আমাদের মধ্যে।

গুণ্ডা দুজন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করেছিলেন ?

না। ওরা যে বদলোক, তখন আমি বুঝতেই পারিনি।

অমিতাভ দত্ত আপনার স্ত্রীকে চেনেন ?

একটু ইতস্তত করে অনন্ত বলল, পরিচয় আছে।

চিত্ত বক্সী ভ্রূ কুঁচকে কি যেন ভাবলেন। বললেন তারপর, আপনার স্ত্রীর ব্যাপারটা আমরা ফার্স্ট প্রায়োরিটি হিসাবেই দেখব। ইতিমধ্যে খোঁজাখুঁজির কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। যে কোন পরিবারের পক্ষেই এক বিশ্রী ব্যাপার। কপালে অবশ্য দুর্ভোগ থাকলে, কে খণ্ডাবে বলুন ? যা হোক, আপনার স্ত্রীর একটা ছবি আমাদের দরকার হবে।

বিকাশ বলল, তোমার পার্সে মালার যে ছবিটা আছে, সেটাই দিয়ে দাও। মনে হয়, ওতেই কাজ হবে।

অনন্ত পকেট থেকে পার্স বার করল। স্বাভাবিক কারণেই ছবিটা ছোট। তবে বেশ স্পষ্ট। মালার সুন্দর মুখের প্রতিটি রেখা পরিষ্কার ধরা পড়েছে।

ছবিখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিয়ে বক্সী পকেটে রাখলেন। আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল তিনজনের মধ্যে। অনন্তর আকুলতায় সহানুভূতি জানালেন বক্সী। তারপর পুলিশ ভ্যানেই দুজনকে দুজনের ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া হল। ফিয়েট অন্য ড্রাইভারের সহযোগিতায় পিছু পিছু গেল।

বেলা তখন দুটো। চিত্ত বক্সী নিজের দপ্তরে বসে একজনের

সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলেন। এখনো মালার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। অনুসন্ধান চলছে। রিসিভার নামিয়ে রাখার মুখেই একজন সহকারী ঘরে প্রবেশ করল।

গোবিন্দ এসেছে স্যার।

পাঠিয়ে দাও।

দশাসই চেহারার গোবিন্দকে একনজর দেখলেই বুঝতে পারা যায়, অনেক ঘাটের জল খাওয়া এই লোকটা সাধারণ শ্রেণীর নয়। প্রকৃত অর্থেই ব্যাপারটা তাই। গোবিন্দ মধ্য কলকাতার একজন কুখ্যাত গুণ্ডা। দলবল নিয়ে ছিনতাই, লুটপাট করাই তার কাজ। বেশ কয়েকবার জেলেও গেছে।

গোবিন্দ ঘরে ঢুকেই মাথা নুইয়ে বলল, আমায় ডেকেছেন বড়বাবু?

সিগারেটে দীর্ঘ টান দিয়ে বক্সী বললেন: তারপর গোবিন্দ, খবর কি? ব্যবসা ভালই চলছে তো?

আপনাদের নেকনজর রয়েছে বড়বাবু, ব্যবসা আর ভাল চলবে কি করে? গড়িয়ে গড়িয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছি। আমায় ডেকে পাঠালেন কেন? এধারে আমি তো কিছু করিনি।

আমি কি বলছি, কিছু করেছ? একটু খোশগল্প করতে ডাকলাম আর কি! বস, ওই চেয়ারটায়।

ঘাড়টায় চুলকে বসতে বসতে গোবিন্দ বলল, এমনি ডেকে পাঠাবার লোক আপনি নন। কিছু একটা নিশ্চয় হয়েছে। তাড়াতাড়ি বলুন বড়বাবু। আমি ভীষণ ঘাবড়ে যাচ্ছি।

মৃদু হেসে বক্সী বললেন, এত সহজে ঘাবড়াবার লোক তুমি নও। শোনো গোবিন্দ, কিছু খবরের জন্যে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। মেডিক্যাল কলেজের পিছন দিকের অংশটা তোমার এলাকাতেই পড়ে, নয় কি?

আজ্ঞে, মানে—

কাল রাত্রে কাদের ডিউটিতে পাঠিয়েছিলে ওধারে?

কাল তো ওধারে কোন ছিনতাই-টিনতাই হয়নি বড়বাবু। রটকেষ্ট, খগা আর পান্নু ডিউটিতে ছিল। ওরা তো খালি হাতেই ফিরেছে।

ছিনতাই হয়েছে গোবিন্দ। কাল রাত বারোটার পর গাড়ি থামিয়ে একজন মহিলাকে ছিনতাই করা হয়েছে।

কিছুটা উত্তেজিত ভাবে গোবিন্দ বলল, আপনি বলছেন কি বড়বাবু? ওসমস্ত নোংরা কাজ আমরা করি না। জোর করে কেড়েকুড়ে নিলাম, সুযোগ বুঝে দোকান থেকে মাল গায়েব করে দিলাম—আমাদের কাজ এই পর্যন্ত। খুন করা, মেয়ে লোপাট করে দেওয়া, এ সমস্ত যে করি না, তা তো আপনি ভালই জানেন।

কখন বললাম, তোমরাই মহিলাকে লোপাট করেছ? ব্যাপারটা হচ্ছে, দুজন লোক মিলে কাজটা করেছে। তাদের সম্পর্কে তোমার কাছ থেকে কিছু খবর আমার চাই।

কিছু জানিই না তো খবর দেব কি? অনেক সময় কি হয় জানেন বড়বাবু—

কি হয়?

অন্য এলাকা থেকে লোক এসে ঝামেলা বাধিয়ে চলে যায়। এই রকমই একটা কিছু হয়ে থাকবে। সেই লোকদুটোর চেহারা কেমন, বলতে পারেন?

অনন্ত আর বিকাশের কাছ থেকে গুণ্ডাদের চেহারার যে বর্ণনা পাওয়া গিয়েছিল, বক্সী তাই বললেন। গোবিন্দ মন দিয়ে শুনল। তারপর অন্যমনস্ক ভাবে কি যেন ভাবতে লাগল। বক্সী তাকে ভাবার সুযোগ দিয়ে আবার একটা সিগারেট ধরালেন।

মিনিট কয়েক পরে গোবিন্দ বলল, চেহারার যে বর্ণনা দিলেন বড়বাবু, তাতে আমার মনে হচ্ছে…

ওরা তোমার চেনা লোক?

প্রেম-ভালবাসা কিছু নেই। তবে—

থামলে কেন? নাম কি ওদের?

একটার নাম বোধহয় পিকু। ওরা কোন এলাকা নিয়ে থাকে না।

সারা কলকাতাতেই কাজ করে বেড়ায়। মাস কয়েক আগে একটা কাজে ওদের কাছাকাছি হয়েছিলাম। তাই—। ওরা কিন্তু ভারি সাংঘাতিক। খুনটুন করতে মোটে ঘাবড়ায় না। আমার মনে হয় দু-দশটা বোধহয় করে চুকেছে।

সিগারেটে দীর্ঘ টান দিয়ে চিন্তিত গলায় বক্সী বললেন, লোক-দুটো আগে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে কিনা জানো?

তা তো বলতে পারব না।

ধরা পড়ে থাকলে, ওদের রেকর্ড লালবাজারে নিশ্চয় আছে। সে পরের কথা। শোনো গোবিন্দ, লোকদুটো সম্পর্কে ভালভাবে খোঁজখবর নাও। যা সংবাদ পাবে, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবে। বুঝতেই পারছ, এতে তোমার ভাল ছাড়া মন্দ হবে না। এখন তুমি যাও।

গোবিন্দ বিদায় নিল।

চিত্ত বক্সী চিন্তার জাল বুনতে লাগলেন। গোবিন্দর কথা ঠিক হলে, একটা নাম পাওয়া গেছে। এটা একটা ভাল সূত্র। পিকুর সম্পর্কে রেকর্ডরুমে খোঁজখবর নিতে হবে। এখুনি ফোন করবেন না, লালবাজারে নিজে যাবেন—

তাঁর চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। সহকারী সুনীল দত্ত হন্তদন্ত হয়ে ঘরে প্রবেশ করল। উত্তেজিত গলায় বলল, স্যার, মালা সোমের সন্ধান পাওয়া গেছে।

বলো কি?—বক্সী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন: কোথায় পাওয়া গেল তাঁকে?

ভবানী সরকার লেনের অর্ধেক তৈরি একটা বাড়িতে। ভদ্র-মহিলাকে গলা টিপে মেরে ফেলা হয়েছে।

ব্যাপারটা তাহলে এইভাবে গড়াল। কিভাবে জানা গেল, মহিলা ওখানে মরে পড়ে আছেন?

বাড়িটা অর্ধেক তৈরি হবার পর, কোন কারণে পড়ে আছে। পাড়ার ছেলেরা ওখানে দিনের বেলায় আড্ডা মারে—নাটকের

রিহার্সাল দেয়। ওদেরই প্রথমে চোখে পড়ে। মোড়ের কনস্টেবলকে খবর দেয় ওরা। আপনি তখন থানায় ছিলেন না। জানতে পেরেই ছুটলাম। ছবি মিলিয়ে দেখলাম, মালা সোমই। ওখানে পাহারার ব্যবস্থা করে আপনাকে খবর দিতে এসেছি।

তুমি এক কাজ কর, অনন্ত সোম আর বিকাশ সেনকে খবর দাও। সনাক্তকরণের ব্যাপারে ওঁদের দরকার হবে। বরং তুমি গাড়ি নিয়ে যাও। ওঁদের নিয়ে এসো।

ঘটনাস্থলের ঠিকানা জানিয়ে সুনীল বেরিয়ে পড়ল। দলবল নিয়ে থানা থেকে বেরোতে চিত্ত বক্সীর সময় লাগল আরো আধ ঘণ্টাটাক। ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাবার পর দেখা গেল, সেখানে লোকে লোকারণ্য। এমন একটা খবর রটে যেতে খুব একটা সময় লাগার কথা নয়।

খুঁটিয়ে চারিধার দেখলেন চিত্ত বক্সী। সামনের দিকের এক খানা ঘর ঢালাই হয়েছে। বাকি দু'খানা ছাদহীন। তারপর উঠান ছোট আকারের। উঠানের পর আবার দু'খানা ছাদহীন ঘর। এই ঘর দু'খানার একখানায় মালা সামান্য পাশ ফেরা অবস্থায় পড়ে আছে। এক নজরেই বুঝতে পারা যায়, গলা টিপে মারা হয়েছে।

ফর্সা গলায় নীলচে দাগ। চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে এলেও, সে যে সুশ্রী ছিল, এখনো বুঝে উঠতে অসুবিধা হয় না। শাড়িখানা ঘরের এককোণে পড়ে রয়েছে। প্রায় হাঁটু পর্যন্ত সায়া তোলা। ব্লাউজের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। গায়ে কোন গয়না নেই। এমন কি রিস্টওয়াচও অদৃশ্য হয়েছে। ধর্ষণ, লুট এবং খুন।

প্রবীণ পুলিশ কর্মচারি চিত্ত বক্সী চাকরি জীবনে অনেক কিছু দেখেছেন। তবু এখন দীর্ঘশ্বাস চাপতে পারলেন না। এই সমস্ত মেয়েদের খুন করতে এতটুকু বিকার জাগে না মনে। উনি মৃতদেহের কাছ থেকে সরে এলেন। ইঙ্গিত পেয়েই ফটোগ্রাফার এবং অন্যান্য এক্সপার্টরা কাজে নেমে পড়ল।

পাড়ার লোকেদের কাছ থেকে জানা গেল, এই বাড়ি তৈরি

করাচ্ছিলেন উত্তরপাড়ার বিনয় রক্ষিত। কাজ বেশ দ্রুতই এগোচ্ছিল। মাসখানেক আগে ট্রাম থেকে পড়ে গিয়ে ভদ্রলোক গুরুতর অ্যাক্সিডেন্ট বাধিয়ে বসেছেন। সেই থেকে বাড়ি তৈরি বন্ধ আছে। রক্ষিতের উত্তরপাড়ার ঠিকানা কেউ বলতে পারল না।

এই সময় সুনীল দত্তর সঙ্গে মহা বিচলিত অবস্থায় অনন্ত আর বিকাশ এসে পৌঁছল।

এর পরের আধ ঘণ্টা কিছুটা মানসিক চাপের মধ্যে দিয়ে কাটল চিত্ত বক্সীর। মৃতদেহ সনাক্তকরণের পর ভেঙে পড়া অনন্তকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন তিনি। বিকাশও সমবেদনার কথায় তাকে শান্ত করার চেষ্টা করল। অনন্ত কিছুটা স্বাভাবিক হবার পর বক্সী কাজের কথা পাড়লেন।

তদন্তের সুবিধার জন্যেই একটা প্রশ্ন করতে হচ্ছে মিস্টার সোম। ভাল করে ভেবে নিয়ে উত্তর দিন। আপনার স্ত্রীর গায়ে গতকাল কি কি গয়না ছিল?

অনন্ত বলল, যতদূর মনে পড়ছে গলায় হার, হাতে চারগাছা করে চুড়ি, কানপাশা আর চিরুণী।

কোন গয়না ক'ভরির ছিল, বলতে পারেন?

চুড়িগুলো তো এক ভরি করে। বছর দুয়েক আগে গড়িয়ে দিয়েছিলাম। হার সাড়ে তিন ভরির। বাকি দুটো গয়নার ওজন বলতে পারব না।

ধরুন, দেড় ভরি। সব মিলিয়ে তেরো ভরি হল। এখনকার হিসাবে কুড়ি হাজার টাকার বেশি। গুণ্ডারা ভালই হাতিয়েছে বলতে হবে। আর আপনাদের আটকে রাখব না। সুনীল পৌঁছে দিয়ে আসবে।

একটু থেমে বক্সী আবার বললেন, বডি এবার পোস্টমর্টেমের জন্যে পাঠাচ্ছি। ওখানকার কাজ মিটে গেলেই আপনাদের জানাব, তখন সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করবেন।

পরের দিন সকালে বিকাশ এল অনন্তর ফ্ল্যাটে—সঙ্গে মিতা মনমরা অবস্থায় অনন্ত তখন সোফায় বসেছিল। অবিন্যস্ত চুল, সাজপোশাকে কোন পারিপাট্য নেই। দেখেই বুঝতে পারা যায়, রাত্রে তার ঘুম হয়নি। অনন্ত অবশ্য একা ঘরে নেই, প্রতিবেশী অরিন্দম গুপ্তও রয়েছেন। আগন্তুকদের দেখে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর শিষ্টাচারসম্মত ভাবে বিদায় নিলেন সকলের কাছ থেকে।

বিকাশ বসতে বসতে বলল, যা হবার তা তো হয়ে গেছে ভাই। এত যদি ভাবতে থাক, তবে শরীর টিঁকবে না।

অনন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ভেবে যে আর কোন লাভ নেই, বুঝি। তবে ঘটনা যেভাবে মোড় নিয়েছে, তাতেই মন বিভ্রান্ত হয়ে রয়েছে।

মিতা বলল, চা করে আনি। খাবেন?

জিজ্ঞেস করছ কি—করে নিয়ে এসো। দেখ, কিচেনে আর কি আছে। জলখাবারের ব্যবস্থাটাও কর গিয়ে।

মিতা কিচেনের দিকে চলে যাবার পর বিকাশ আবার বলল, একদিক থেকে দেখতে গেলে ব্যাপারটা ঠিকই হয়েছে। মালা তোমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। সেই দুর্ভোগ থেকে একজন তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

তোমার কথা অস্বীকার করা যায় না। কে খুনটা করেছে বলো তো? ব্যাপারটা বেশ রহস্যজনক। মালাকেই বা ওরা নিয়ে গেল কেন? তাছাড়া খুন করার অর্থ কি? আজকাল তো মেয়ে বিক্রি হচ্ছে। মালা সুন্দরী ছিল। স্বচ্ছন্দে তাকে চালান করে দিয়ে মোটা টাকা লাভ করতে পারত।

তুমি ঠিকই বলছ। এমন হওয়াই উচিত ছিল। তবে—আমি অন্য একটা কথা ভাবছি।

কি কথা?

বিকাশ বলল, আমার ধারণায়, খুনটা তোমাদের অফিসের অমিতাভ দত্তই করিয়েছে। মনে করে দেখ, সেদিন লাইট হাউসের

সামনে তুমি ওই গুণ্ডা দুটোকে অমিতাভর সঙ্গে দেখেছিলে। ওই ধরনের দুজন লোকের সঙ্গে অমিতাভের কথাবার্তা কেন হবে?

সন্দেহটা যে আমার হয়নি, তা নয়। তবে ঠিক মিল খাওয়াতে পারছি না। মালার প্রতি অমিতাভের আকর্ষণ ছিল—তাকে সে খুন করাতে যাবে কেন?

এও একটা কথা। তবু আমার মন বলছে, অমিতাভ এই ব্যাপারের মধ্যে যে কোন ভাবেই হোক, আছেই আছে।

চিন্তিত গলায় অনন্ত বলল, এমন হতে পারে, গুণ্ডা সহযোগিতায় একটা প্ল্যান অমিতাভ তৈরি করেছিল। মালা নিশ্চয় সমস্ত কিছু জানা ছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরক. দাঁড়িয়ে গেছে। গুণ্ডারা দুজন মালার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে একটু বেশি রকম ঝুঁকে পড়ায়…

হতে পারে। অমিতাভ সংক্রান্ত কথা আমরা পুলিশকে বললে পারতাম। ওদের তদন্তের কিছুটা সুবিধে হত।

মিতা ট্রেতে করে তিন কাপ চা আর কিছু টোস্ট নিয়ে এল এই সময়।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেবার অবকাশ কিন্তু পাওয়া গেল না, ঝনঝন শব্দে কলিংবেল বেজে উঠল। বিস্মিত দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকাল তিনজন। এখন আবার কে এল? দ্বিতীয়বার বেল বাজবার পর মিতা দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

ঘরে যিনি প্রবেশ করলেন, তাঁকে দেখে অনন্ত আর বিকাশ হতবাক। আগন্তুক প্রভাকর চৌধুরী।

অনন্তদের অফিসের বড়কর্তা প্রভাকর চৌধুরীর বয়স পঞ্চান্নর বেশি নয়। বেশ অভিজাত দর্শন। সাজপোশাকেও বেশ পারিপাট্য আছে। কোন ভূমিকা না করেই তিনি এই মর্মন্তুদ ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করলেন। সময়োচিত সান্ত্বনা জানালেন অনন্তকে।

মিতা নিজের চায়ের কাপ ওঁকে বাড়িয়ে দিল।

কাপ হাতে তুলে নিয়ে চৌধুরী আবার বললেন, দিল্লী যাওয়াই

স্যর। কনফারেন্স পিছিয়ে যাওয়ায় কাঠমাণ্ডুর প্রোগ্রামও বাতিল করে ফিরে এলাম। এসেই শুনলাম এই প্যাথেটিক ঘটনাটা।

অনন্ত বলল, আপনি কবে ফিরেছেন স্যার?

আজ ভোরে।

বিকাশ আর অনন্ত মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

আপনি যে কলকাতায় পা দিয়েই আমার এখানে আসবেন, ভাবতে পারিনি। এখন আপনার বিশ্রামের দরকার। জার্নির এক্সাস গেছে। বলছিলাম···

তেমন কিছু নয়। আমি ঠিক আছি। পুলিশ কতদূর এগোল বুসিটা নিয়ে—কিছু শুনেছ?

এখানো কিছু জানি না। তবে ওরা উঠেপড়ে লেগেছে। মনে হয়, হত্যাকারীকে ধরে ফেলতে পারবে।

প্রভাকর চৌধুরী সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বললেন, আমার তা মনে হয় না। ওদের কাজকর্ম একটু ঢিমে তালেই চলে। এটা ঠিক, তোমার স্ত্রী আর ফিরে আসবেন না। তাই বলে আমাদের হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে, তার কোন মানে নেই। যারা এই কাজ করেছে, তাদের শাস্তি নিশ্চিত দরকার।

বিকাশ এতক্ষণ পর কথা বলল, আপনি ঠিকই বলছেন। তবে এক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি, বলুন?

কেসটা থানার হাতে পড়ে থাকলে, কাজের কাজ কিছু হবে বলে মনে হয় না। আজই লালবাজারের সঙ্গে যোগাযোগ করব। হোমি-সাইড দপ্তরের বড়কর্তার সঙ্গে আমার ভালই চেনাজানা আছে। লালবাজার যাতে কেসটা টেকআপ করে, সে সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে কথা বলে দেখি।

অনন্ত বলল, আপনি যা ভাল বোঝেন, করুন স্যার। আমি তো ভেবে কোন কূল-কিনারা পাচ্ছি না।

ওই কথাই রইল তাহলে।—প্রভাকর চৌধুরী সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

দুশো একচল্লিশের কে হ্যাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীটের ড্রইংরুমে তখন অবসরের আবর্ত। সোফায় একটু আড় হয়ে বসে আছে বাসব। দাঁতে চেপে থাকা পাইপে হালকা মাপের টান দিতে থাকায়, অল্প অল্প ধোঁয়া বেরোচ্ছে। শৈবাল বসে আছে সামনেই। একজোড়া তাস অলস ভাবে সাফল্ করে চলেছে। মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে বাসব বলল, ডাক্তার, আরেক কাপ কফি হলে কেমন হয়?

মন্দ হয় না। তবে এখনই তা সম্ভব হচ্ছে না। দেখলে না, বাহাদুর থলি হাতে করে বাজার চলে গেল।

তাও তো বটে। সময় আর কাটতে চাইছে না ডাক্তার। হাতে কাজকর্ম না থাকলে ভারি খারাপ লাগে।

মৃদু হেসে শৈবাল বলল, আজকাল কলকাতায় হাঁচতে কাশতে খুন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারগুলো আর তেমন গুরুত্ব পায় না।

পাবে কি করে? ওই সমস্ত খুনের মধ্যে কোন রহস্য থাকে না। রেষারেষি বা রাজনৈতিক হত্যা। দেশটা একেবারে গোল্লায় গেছে। মাথা খাটিয়ে কেউ একটা অপরাধ পর্যন্ত করে না।

তোমার দুর্ভাগ্য। এই মাথা মোটারাই তোমাকে বেকার করে রেখেছে। আসল কথাটা কি জানো, আমরা ভেজালের যুগে বাস করছি। গ্রে ম্যাটারের অভাব তো হবেই।

সারা পৃথিবী এখন ভেজালের আওতায় রয়েছে। কথাটা তা নয়। আসলে মাথা খাটিয়ে আমরা কিছু করতে চাই না। মোটা দাগের কাজ করেই এদেশের লোক পার পেতে চায়। ইউরোপ, আমেরিকার দিকে তাকিয়ে দেখ, ছোটখাটো অপরাধেও ওরা কিরকম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। গতকালই এ মাসের ক্রিমিনাল ইন্টার-ন্যাশনালে পড়ছিলাম একটা ঘটনা···

বাসবের কথা শেষ হবার আগেই কলিংবেল বেজে উঠল।

সচকিত হল দুজনে। দ্রুত গলায় শৈবাল বলল, তোমার বেকারত্ব ঘুচল বোধহয়।

জোর দিয়ে বলা যায় না।

আবার বেল বাজল।

বাসব উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। দরজার ওধারে একজন নবীন এবং একজন প্রবীণ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। দুজনেই মার্জিত পোশাকে সজ্জিত। কিন্তু দুজনের মুখেই উদ্বেগের ঘনঘটা।

প্রবীণ বললেন, আমি বাসববাবুর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

আসুন ভেতরে। বসুন। ইনি আমার ঘনিষ্ট বন্ধু ডাক্তার শৈবাল রায়।

আগন্তুকরা সহজেই বাসবকে চিহ্নিত করলেন। নমস্কার বিনিময়ের পর আসন গ্রহণ করলেন। নিজেদের পরিচয় দিলেন তারপর।

বাসব বলল, এবার আপনাদের সমস্যার কথাটা বলুন মিস্টার চৌধুরী। অকারণে তো কেউ আমার কাছে আসে না।

প্রভাকর চৌধুরী বললেন, এক মর্মন্তুদ ঘটনার এখন আমরা মুখোমুখি। ঘটনাটা ঘটেছে মধ্যকলকাতার এলাকাতে। আপনি তো ভালোই জানেন, আঞ্চলিক এলাকার কাজ কেমন ঢিমেতালে চলে। লালবাজারে গিয়েছিলাম, ওঁদের তদ্বিরে যাতে কেসটার তাড়াতাড়ি সুরাহা হয় সেই অনুরোধ জানাতে। গিয়ে শুনলাম, ইতিমধ্যে হোমিসাইড স্কোয়াড থেকে ব্যাপারটা হাতে নেওয়া হয়েছে।

বড়কর্তা পুরন্দর সামন্তর সঙ্গে কথা হল বুঝি ?

হ্যাঁ। ওঁর সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। উনি আপনাকে যথেষ্ট খাতির করেন দেখলাম। বললেন, ওঁরা যা করবার তা তো করবেই, তবে ইচ্ছে করলে আপনার সহযোগিতা নিতে পারি তারপর···

বুঝলাম। তারপর উনি আমার প্রশংসার বান ডাকিয়ে দিলেন আপনারাও আর সময় নষ্ট না করে এখানে চলে এসেছেন, এই তো ? এবার ঘটনাটা বলুন ? আমার পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব হবে, নিশ্চয় করব।

অনন্ত, তুমিই বল ?

অনন্ত সমস্ত ব্যাপারটা যতদূর সম্ভব গুছিয়ে বলল। বাসব

পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে শুনে গেল একমনে।

কয়েক মিনিট চুপচাপ। দৈনিকপত্রে ছোট আকারে সংবাদটা ছাপা হয়েছিল। বাসবের চোখ এড়িয়ে যায় নি। তখন একবারও মনে হয়নি কেসটা তারই হাতে এসে পড়বে শেষ পর্যন্ত।

এ তো গেল ঘটনা। এবার নেপথ্য কাহিনী কিছু থাকলে বলুন।

নেপথ্য কাহিনী! ও, বুঝলাম—

অনন্ত এবার মালা আর অমিতাভকে নিয়ে যে বিশ্রী পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল, তার বিস্তারিত বর্ণনা দিল। লাইট হাউসের সামনে দেখা গুণ্ডা দুটোর কথাও বাদ দিল না।

পাইপ নিভে গিয়েছিল। বাসব ধরিয়ে নিল।

মালাকে খুন করে তার কি লাভ? সে তো মালাকে নিজের করে পাবারই চেষ্টা করছিল।

হুঁ। আপনার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?

বহরমপুরে।

অমিতাভ বহরমপুরের ছেলে?

বলতে পারব না।

কলকাতায় আপনার স্ত্রীর কোন আত্মীয়স্বজন আছেন?

মামা আর এক দিদি আছেন।

দুজনের ঠিকানা আমার দরকার হবে।

অনন্ত কাগজ চেয়ে নিয়ে ঠিকানা লিখে দিল।

এবারের প্রশ্নটা একটু ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে, কিছু মনে করবেন না। আপনি স্বাস্থ্যবান, সুরূপ ব্যক্তি। ভাল আয় করেন। এর পরও আপনার স্ত্রী আপনার চেয়ে সব ব্যাপারে ইনফিরিয়র এমন একজনের প্রেমে পড়ে গেলেন কিভাবে? এ সম্পর্কে আপনি কোন ভাবনা-চিন্তা করেছেন কি?

বিব্রত ভঙ্গিতে অনন্ত বলল, পাঁচ বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে। মালার ব্যবহারে কোন অসঙ্গতি আমি লক্ষ্য করিনি। বরং সে আমার প্রতি যথেষ্ট যত্নশীলা ছিল। অতি সম্প্রতি ঘটনাটা জানতে পেরে

আমি হতবাক হয়ে যাই। আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম। কিন্তু আমার সঙ্গে সে অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করেছিল। নিজের এতদিনকার মিষ্টি স্বভাবটা মালা মুহূর্তের মধ্যে বদলে ফেলেছিল।

প্রভাকর চৌধুরী বললেন, মালা খুন হওয়ার সঙ্গে এদের দাম্পত্য জীবনের সম্পর্ক কি—তা জেনে আপনার কি লাভ?

বাসব মৃদু হেসে বলল, লাভ আছে, আবার নেইও। কথাটা কি জানেন, আমাদের যতদূর সম্ভব জেনে নিতে হয়। কোন কথাটা পরে কাজে লাগবে আগে থেকে তা কিছু বলা যায় না।

সমস্ত শুনে আপনার কি মনে হল, হত্যাকারীকে ধরা যাবে?

প্রশ্নটা একটু বেখাপ্পা ধরনের হল মিস্টার চৌধুরী। ঘটনার রূপরেখা জানার সঙ্গে সঙ্গে যদি হত্যাকারীকে ধরে ফেলা যেত, তাহলে তো বহুদিন আগেই মহামানব হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যেতাম। সবে শুরু। অনেক সিঁড়ি এখন উঠতে হবে। তবে এটা ঠিক, চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না।

এখন আমাদের আর কিছু করণীয় আছে কি?

আপাতত নেই। পরে প্রয়োজন পড়তে পারে।

সৌজন্যসূচক দু'চার কথা বলে, পাঁচশো টাকা আগাম সম্মান দক্ষিণা দেবার পর প্রভাকর চৌধুরী অনন্তকে সঙ্গে নিয়ে ওখান থেকে বিদায় নিলেন তার আগে বাসব ওদের দুজনের এবং বিকাশের ঠিকানাটা নিয়ে রাখল

টাকাগুলো ড্রেসিং গাউনের পকেটে রাখতে রাখতে অলস ভঙ্গিতে বাসব বলল, কি রকম বুঝলে ডাক্তার?

শৈবাল বলল, ঘটনাটা রহস্যঘন বলে মনে হল না

আর কিছু?

বিশেষ কোন অর্থ নেই তবু মনে হল, হত্যাকারীকে ধরার ব্যাপারে প্রভাকর চৌধুরীর আগ্রহটা যেন একটু বেশি।

আমারও তাই মনে হয়েছে। এমন হতে পারে, উনি অনন্তবাবুকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, তাই হয়তো···আবার অন্য কোন কারণও থাকতে

পারে।

অন্য কারণটা কি ?

এখনই বলা যাবে না। সকলকে বাজিয়ে দেখার পর একটা ধারণা খাড়া করা সম্ভব। তার আগে নয়।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে আবার বলল, তোমার ধারণায়, ঘটনাটা তেমন রহস্যঘন নয়। আমার মন বলছে, আসল ঘটনাটা ঠিক তার বিপরীত। যা জেনেছি, তা শেষ কথা নয়। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কি গিয়ে দাঁড়ায়।

সেণ্টার টপের ওপর থেকে তাসজোড়া তুলে নিয়ে ভাজতে ভাজতে শৈবাল বলল, কিভাবে কাজ আরম্ভ করবে, স্থির করলে ?

প্রথম কাজ হচ্ছে, লালবাজারে যাব না। সকলের স্টেটমেণ্ট আর পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট দেখে নিতে হবে। তারপর এগোব। মিস্টার সামন্তর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেণ্টটা করে রাখি।

বাসব সোফা ছেড়ে ফোনস্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে গেল।

বেলা তখন তিনটে। হোমিসাইডের বড়কর্তা পুরন্দর সামন্ত তখন নিজের অফিসেই ছিলেন। বাসবকে দেখে সহাস্যে স্বাগত জানালেন। চা আনার আদেশ দিতে বিলম্ব করলেন না।

দেখছেন তো, আপনাকে কত ভালবাসি। পুলিশের লোক হয়েও আপনার কাছে মক্কেল পাঠালাম।

বাসব মৃদু হেসে বলল, সেকথা আর বলতে। বেকার বসে থেকে থেকে তো পাগল হয়ে যাবার অবস্থায় এসে পড়েছিলাম। যা হোক, কাজের কথায় আসা যাক। কেসটা থানা থেকে তুলে নিয়েছেন নাকি ?

এখনো থানার হাতেই আছে, তবে আমরা দেখাশোনা করছি। আপনার কোন অসুবিধা হবে না। যে কোন সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত আছি।

ধন্যবাদ। স্টেটমেণ্টের কপি আপনার কাছে নিশ্চয় আছে। পড়ে দেখতাম একবার।

অবশ্য।

নিজের টেবিলের ড্রয়ার থেকে স্টেটমেন্টের কপিগুলো বার করে বাসবের দিকে এগিয়ে দিলেন সামন্ত।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করল। ধোঁয়ার জাল বুনতে বুনতে পড়া শেষ করতে সময় লাগল প্রায় মিনিট পনেরো।

সামন্ত প্রশ্ন করলেন, কিছু পেলেন?

সবাই সত্যি কথা বলে থাকলে, যা শুনেছি, ঘটনাটা মোটামুটি সেই রকমই দাঁড়াল। অনুসন্ধান কিভাবে চালাতে হবে, সে সম্পর্কে যদি প্রশ্ন করেন, তবে আমি বলব, কয়েকটি বিষয়ের ওপর আমাদের বিশেষভাবে জোর দিতে হবে।

যেমন?

বাসব চিন্তিত গলায় বলল, নাম্বারিং করেই বলি। এক: সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও শুধু মালা সোম কেন, দ্বিতীয় মহিলাটিকে গুণ্ডারা নিয়ে গেল না কেন? সেক্ষেত্রে তিনিও সুরূপা এবং সালঙ্কারাও ছিলেন। দুই: গুণ্ডারা কি নিজের ইচ্ছাতেই কাজটা করেছে, না তাদের কেউ নিয়োগ করেছিল? তিন: নিয়োগকর্তা কি অমিতাভ? চার: তাই যদি হবে, তবে প্রেমিকাকে খুন করিয়ে সে কিভাবে লাভবান হচ্ছে? পাঁচ: মালা সোমের প্রকৃত চরিত্র কেমন ছিল? অমিতাভ ছাড়া তার কি আরো পুরুষ বন্ধু ছিল? ছয়: প্রভাকর চৌধুরী এই কেসের ব্যাপারে এত আগ্রহশীল কেন? এটা কি নিতান্তই সদিচ্ছা, না অন্য কোন গূঢ় কারণ আছে?

বাসব থামতেই সামন্ত বললেন, আপনার প্রশ্নগুলো ভাল। উত্তরগুলো ঠিক ঠিক পেলে, আমরা নিশ্চিত ভাবে কূলে পৌঁছতে পারব।

আরো কিছু প্রশ্ন আছে। সে কথা যাক। তিনটে ব্যাপারকে এখন আমি অগ্রাধিকার দিতে চাই।

যেমন—

সম্ভব হলে কালই অমিতাভের সঙ্গে আমার একটা সিটিংয়ের

ব্যবস্থা করে দিন।

বেশ। লালবাজারে ডেকে পাঠাচ্ছি।

ঠিক হবে না। লোকটা এই চৌহদ্দিতে এসে ভড়কে যেতে পারে। কথা বার করে নিতে অসুবিধা হবে। আমি বরং কাল দুপুরে ওর অফিসেই যাব। আপনি শুধু জানিয়ে রাখবেন।

চা এসে পড়ল এই সময়। পেয়ালা তুলে নিয়ে সামন্ত বললেন, এই তো গেল একটা ব্যাপার। বাকি দুটো—

বাকি দুটো আমি নিজেই সামলে নিতে পারব।

আরো দু'চার কথার পর বাসব শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে ওখান থেকে বিদায় নিল। ইচ্ছে করেই পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট দেখতে চাইল না। কারণ যা শুনেছিল, ওর পক্ষে তাই যথেষ্ট।

লালবাজারের মোড়ে পৌঁছবার পর শৈবাল বিদায় নিল। তাকে কাজে যেতে হবে। বাসব বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের দিকে এগোল। সঙ্গে নিজের গাড়ি নেই। ট্যাক্সিতেই লালবাজারে এসেছিল। ওরিয়েন্ট সিনেমা হলের গজ দশেক এধারেই থামল বাসব। থামল একটা পান-সিগারেটের দোকানের সামনে।

জুলফিতে পাক ধরলেও দোকানদারকে বুড়ো বলা চলে না। বিলক্ষণ বলশালী ব্যক্তি। বলা বাহুল্য, সে এনায়েত। বাসবের কার্যকলাপ সম্পর্কে যারা বিলক্ষণ ওয়াকিবহাল, তারা এনায়েতকে অবশ্যই স্মরণ করতে পারবেন। বহু তদন্তে সে বাসবকে লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছে দেবার ব্যাপারে মূল্যবান সহযোগিতা দিয়েছে।

এনায়েত বাসবকে দেখতে পেয়েছিল। দোকান থেকে নেমে এল হাসিতে মুখ ভরিয়ে: সেলাম হুজুর।

সেলাম। তোমার খবর ভাল তো?

-এখন কি ষোলো আনা খবর কারোর ভাল থাকে সাব! চলে যাচ্ছে কোন রকমে।

বাসব মৃদু হেসে বলল, তা বটে। একটা কাজ আছে এনায়েত। জটিল কিছু নয়। একটু ঘোরাঘুরি করলেই খবর পেয়ে যেতে পার।

কার খবর চাইছেন ?

পিকু বলে কাউকে চেনো ?

এনায়েতের ভ্রূ কুঁচকে উঠল : পিকু ?

ছিনতাই-টিনতাই করত। যতদূর আঁচ পাওয়া যাচ্ছে, তাতে মনে হয়, সে আর তার সঙ্গী মিলে একটা খুন করে বসে আছে।

নামটা ঠিক মনে করতে পারছি না সাব। এই অঞ্চলে বোধহয় তার যাতায়াত নেই।

না। সে অন্য এরিয়ায় কারবার করে। তবে···

আপনি চিন্তা করবেন না। আমি আজই কাজে নেমে পড়ছি। লোকটাকে ঠিক চিনে বার করতে পারব। এই অঞ্চলটা গোবিন্দ বলে একটা লোক দেখাশোনা করে। সে ঠিক খবর দিতে পারবে।

আরো দু'চার কথার পর বাসব এনায়েতের হাতে একশো টাকার একটা নোট গুঁজে দিয়ে ট্যাক্সির সন্ধানে ভিক্টোরিয়া হাউসের দিকে এগোল। আজ আর নয়। বাকি ক'জনের সঙ্গে আগামীকাল দেখা করলেই চলবে।

বিকাশ নড়েচড়ে বসল। হাত একটু কেঁপে গেলেও সিগারেট ধরাতে পারল ঠিক মতই। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে তাকাল সামনে অনায়াস ভঙ্গিতে বসে থাকা বাসবের দিকে।

আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা কি আমার পক্ষে ঠিক হবে? বিশেষে যে মহিলা—

আপনার বন্ধু-পত্নী।

বাসব পাদপূরণ করে দিয়ে আবার বলল, এক্ষেত্রে সঙ্কোচের কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। উনি বেঁচে থাকলে অবশ্য অন্য কথা ছিল। উনি খুন হয়েছেন। কাজেই ওঁর সম্পর্কে যতদূর সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করতে পারলেই তদন্তের সুবিধে হবে।

দেখুন—বিকাশ বলল, প্রত্যক্ষ ভাবে আমি কিছু দেখিনি বা জানি না। ভদ্রমহিলাকে বরং পতিপরায়ণা বলেই মনে হবে। তবে—

বলুন ?

অনন্তর কাছ থেকেই একদিন কথাটা জানতে পারলাম। সে তার স্ত্রীর চরিত্রকে সন্দেহ করছে। আমি কথাটা বিশ্বাস করিনি। সে আমাকে পরে বলেছিল ব্যাপারটা এখন কি পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েছে। তাদের অফিসে অমিতাভ নামে এক ছোকরা আছে। তারই সঙ্গে নাকি···বুঝলেন মিস্টার ব্যানার্জি, স্ত্রী চরিত্র দেবতারাই নাকি বুঝতে পারেন না, আমরা তো সামান্য মানুষ। কিন্তু কি দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার। অনন্তর মত স্বামী থাকতে—

এইরকমই হয়। আপনি পুলিশকে যা বলেছেন, তা আমি শুনেছি। এছাড়াও আর কিছু আমায় বলতে পারেন ?

আর কিছু ?

ধরুন, সেদিন—সিনেমা দেখা, হোটেলে খাওয়া-দাওয়া বা গাড়িতে ফেরার সময় এমন কিছু লক্ষ্য করেছিলেন বা অনুভব করেছিলেন, যা আপনার কাছে অদ্ভুত লেগেছিল ?

চিন্তিত গলায় বিকাশ বলল, তেমন কিছু তো—তবে—

বলুন ?

আমি যতদূর জানতাম, মালা সোম একটু আমুদে ধরনের এবং ছটফটে মহিলা। সেদিন তাঁকে ভারি চুপচাপ লাগছিল। তাছাড়া কেমন একটা ত্রস্ত ভাব।

কি রকম ?

সেদিন ভদ্রমহিলা কথা তো কম বলছিলেনই, তাছাড়া সতর্ক দৃষ্টিতে বারবার তাকাচ্ছিলেন এধার ওধার। বিশেষ করে, সিনেমা দেখে যখন আমরা বেরোলাম, তখন মাত্রাটা একটু বেড়ে গিয়েছিল।

বাসব পাইপ ধরাল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, অনন্তবাবু ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন ?

বোধহয় না। আমিই বলতাম। কিন্তু—

বলতে ভুলে গেলেন।

ঠিক তা নয়। এই সময় একটা ব্যাপার ঘটল।

ব্যাপার। এমন কি সে সময় ঘটল, যাতে আপনারা সকলেই আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন ?

ঠিক তাই।

বিকাশ সিগারেট ধরাল। বলল আবার, হল থেকে বেরিয়ে আমরা গাড়ির দিকে এগোচ্ছিলাম, হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল অনন্তর বস প্রভাকর চৌধুরীর ওপর। অবাক হলাম। কারণ ওঁর দিল্লীতে থাকবার কথা। সেই কারণেই ওর গাড়িটা অনন্তর কাছে রয়েছে। ভদ্রলোক অবশ্য ততক্ষণে ভিড়ে মিশে গিয়েছিলেন। কথাটা বললাম অনন্তকে—বিশ্বাস করল না। অবশ্য বিশ্বাস না করারই কথা। তবে আমি স্পষ্ট দেখেছিলাম ভদ্রলোককে।

পরে অনন্তবাবু এ সম্পর্কে ওঁকে প্রশ্ন করেছিলেন ?

মনে হয় করেনি। জিজ্ঞেস করলে আমাকে ও-সম্পর্কে নিশ্চয় কিছু বলত। ওঁর মনের অবস্থা কি রকম যাচ্ছে, বুঝতেই পারছেন। তবে একটা কথা আপনাকে অন্যভাবে বলেছি। এখন মনে হচ্ছে সঠিক ব্যাপারটা আপনাকে বলাই বোধহয় উচিত।

ভ্রূ কুঁচকে বাসব বলল, কোন কথাটা বলুন তো ?

মালা সোমের চারিত্রিক ব্যাপারটা প্রথমে আমি অনন্তর কাছ থেকে শুনিনি। আমি জানতে পেরেছি জেনে, ও আমাকে বিষয়টা এক্সপ্লেন করে বলেছিল।

আপনি জেনেছিলেন কিভাবে ?

ফোনে একজন আমাকে বলেছিল।

ফোনে !!!

হ্যাঁ। সে নিজের পরিচয় দেয়নি।

গলাটা চিনতে পেরেছিলেন ?

না। কেমন ভারি ভারি শোনাচ্ছিল।

বাসব বলল, মাউথপীসে রুমাল জড়িয়ে কথা বলছিল মনে হয়। কিভাবে কথা আরম্ভ করল ?

কোন ভূমিকা করেনি। যতদূর সম্ভব মনে পড়ছে, কথাটা এই

ভাবে হয়েছিল—

বিকাশ সেন কথা বলছেন ?

হ্যাঁ···আপনি—

একটা প্রয়োজনীয় কথা জানাতে চাই···অনন্ত সোমের স্ত্রী একজনের সঙ্গে প্রেম-প্রেম খেলা আরম্ভ করেছেন, জানেন বোধহয়—

ননসেন্স—কে আপনি ?

আমার নাম জেনে কি করবেন—খবরটা শুনুন—অমিতাভ চৌধুরী অনন্ত সোমের অফিসে চাকরি করে—সেই ছোকরার জন্যে শ্রীমতী পাগল—অবৈধ প্রেমে আলাদা একটা মাধুর্য আছে নিশ্চয় স্বীকার করবেন—

আমি আর কথা না বাড়িয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। কার এই বাদরামী, তখন সেটাই হয়ে উঠেছিল আমার কাছে বড় চিন্তা।

বাসব চিন্তিত ভাবে তাকিয়ে রইল সেণ্টার টপের দিকে।

এই সময় মিতা ট্রে'তে কিছু ভাজাভুজি আর চা নিয়ে ঘরে এল। নরম গলায় বলল, চা'টা খেয়ে নিন।

বাসব মুখ তুলল : বসুন, মিসেস সেন। মিস্টার সেনের সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছে তাতে আমি উপকৃতই হয়েছি বলা চলে। এবার আপনাকে গোটা কয়েক প্রশ্ন করতে চাই।

মিতা বসতে বসতে বলল, বলুন।

বাসব চায়ের পেয়ালা তুলে নিয়ে বলল, মালা সোম সম্পর্কে কিছু বলুন ? আপনার সঙ্গে তো অনেক দিনের আলাপ। তাঁর সম্পর্কে অনেক কথাই আপনার জানা থাকার কথা।

মিতা চিন্তিত গলায় বলল, অনেক কথা বলতে যা বোঝায়, তেমন কিছু মালার সম্পর্কে আমি জানি না স্বামীর সঙ্গে মাঝে মাঝে ওদের ফ্ল্যাটে গেছি বা ওরা আমাদের এখানে এসেছে। তখন নিজের নিজের সংসার বা সিনেমা থিয়েটার নিয়ে গল্প হয়েছে। তবে—

বলুন ?

বাচ্চা হচ্ছিল না, এই আক্ষেপ মালার ছিল।

বাচ্চা না হওয়ার কারণ কি? ওঁরা মেডিক্যাল টেস্ট করিয়েছিলেন?

বলতে পারব না।

বিকাশবাবু, আপনি কিছু জানেন?

বিকাশ বলল, যতদূর মনে পড়ছে, বছর দুয়েক আগে অনন্ত বলেছিল, দুজনের মেডিক্যাল টেস্ট করাবে। টেস্টের ফলাফল কি হয়েছিল, তা অবশ্য আমি জানি না।

বাসব এবার মিতার দিকে মুখ ফেরাল: মালা সোমের চরিত্র অন্যখাতে বইছে, আপনি বুঝতে পারেননি?

মিতা বলল, একেবারেই না।

এবার ঘটনার রাতের কথায় আসা যাক। অর্থাৎ গুণ্ডারা যখন গাড়ি আক্রমণ করলেন, আমি তখনকার অবস্থাটা আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই।

পুলিশকে তো বলেছি। নতুন করে কিছু বলতে পারব বলে তো মনে হয় না।

আরেকবার বলুন। তবে এবার একটু চিন্তা-ভাবনা করে বলুন।

গুণ্ডারা যখন গাড়ি রুখে ওঁদের মারতে আরম্ভ করল, তখন আমি এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে চেঁচাতে পর্যন্ত পারিনি। মালা কিন্তু আমার মত এত ভয় পায়নি। ঝুঁকে পড়ে ব্যাপারটা দেখছিল।

বলেন কি?

আমার তো তাই মনে হয়েছিল।

আপনার ধারণায়, এরকম যে একটা কিছু ঘটবে, মালা সোমের আগে থেকেই তা জানা ছিল?

না। আমি নিশ্চিত হয়ে কিছু বলছি না। তবে—

বুঝলাম। বাসব উঠে দাঁড়াল: আজ চলি। পরে হয়তো আবার কথা বলার প্রয়োজন পড়তে পারে।

তখন ভরা সন্ধ্যা? সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বাসব বসে আছে। ঠোঁটের আগায় জ্বলন্ত পাইপ। একই ভাবে বসে আছে অনেকক্ষণ। চিন্তা তাকে কুরে কুরে খেয়ে চলেছে।

শৈবাল প্রবেশ করল ঘরে। বন্ধুবরকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে বসতে বসতে বলল, ভারি চিন্তায় পড়ে গেছ মনে হচ্ছে?

বাসব সোজা হয়ে বলল, কেসটা আমায় ভাবিয়ে তুলেছে।

এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে—

মন্থরার চাতুরী আর চলছে না ভাই। প্যাঁচটা যে ঠিক কোথায়, কিছুতেই ধরতে পারছি না।

গুণ্ডারা মহিলাকে রেপ করেছে, গয়নাগাঁটি কেড়ে নিয়েছে, তারপর স্বাভাবিক নিয়মেই খুন করেছে—ব্যাপারটা এই দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখলেই তো সব মিটে যায়।

নিভন্ত পাইপ ধরিয়ে নিল বাসব: তুমি বলতে চাইছ গুণ্ডা দুটোকে ধরে ফেলতে পারলেই ব্যাপারটার ওপর যবনিকা পড়ে গেল? ব্যাপারটা এত জলবৎতরলম নয়। গভীর একটা প্যাঁচ আছেই আছে। অমিতাভের সঙ্গে যদি গুণ্ডা দুটোকে দেখা যেত, তাহলে নাহয় একটা কথা ছিল। হিসেবটা গোলমেলে হয়ে গেছে ওখানেই।

শৈবাল কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু এনায়েত ঘরে প্রবেশ করায় কিছু বলা হল না। দুজনকে সেলাম জানিয়ে এনায়েত বসল হাসিমুখে।

বাসব বলল, খবরটবর কিছু এনেছ মনে হচ্ছে?

পান-চর্চিত দাঁতের ঝিলিক দিয়ে এনায়েত বলল, যে কাজ হাতে নেব সাব, তার কিছু করতে পারব না তা কি করে হয়?

বেশ, বেশ। শুনি, কি খবর আনলে?

গোবিন্দকে সহজেই পাকড়াও করলাম। শুনলাম থানা থেকে ওকে আগেই বলা হয়েছে গুণ্ডা দুটোর সন্ধান করতে।

তারপর?

গোবিন্দ ঘোড়েল লোক সাব। লাইনে রয়েছে তো। ওর অনেক সুলুক সন্ধান জানা আছে। একটার নাম হচ্ছে পিকু···আপনি তো

বলেই ছিলেন। অন্যটা হল কেল্টু। দুজনে একসঙ্গে মিলে অনেক খুনটুন করেছে।

এঁরা তাহলে বেশ বড় দরের ক্রিমিন্যাল?

হ্যাঁ, সাব। পরের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এরা খুন করে।

হুঁ। কোথায় থাকে জানতে পেরেছ?

এনায়েতের মুখে এবার বিস্তারিত হাসি দেখা গেল: এটা সাব আমার বাহাদুরী। গোবিন্দও ঠিকানা বার করতে পারেনি। আমি অন্যভাবে খোঁজখবর করে ওদের আস্তানার সন্ধান পেয়েছি।

কোথায় থাকে ওরা?

বেলেঘাটায়। বস্তিটা একেবারেই ভাল নয়। যত্তোসব মার্কামারা লোকেরা থাকে। ওদের ঘর তালাবন্ধ দেখলাম। খবর নিয়ে জানলাম দিন দুয়েক ওধারে যায়নি।

একটু চিন্তা করে বাসব বলল, অন্য কোন মক্কেলের কাজে ব্যস্ত আছে বোধহয়। আরেকটু কষ্ট তোমায় করতে হবে এনায়েত।

বলুন সাব।

ওদের ঘরের ওপর নজর রাখতে হবে। ফিরে এলেই ফোনে খবর দেবে আমায়। আমি সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছব ওখানে। তোমার খাটুনির মাত্রা অবশ্য এতে বেড়ে গেল। তবে—

আপনি ব্যস্ত হবেন না। এ সমস্ত কাজ করতে আমার ভালই লাগে।

এনায়েত বিদায় নিল।

বেশ কিছুক্ষণ কথা হল না দুজনের মধ্যে। শেষে বাসব বলল, বিকাশ সেনকে কেউ মালা সোমের কেচ্ছার কথা টেলিফোন করে জানালো—এটা কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার!

শৈবালের সমস্ত কিছু জানা ছিল। সে বলল, এমনও তো হতে পারে, কথাটা আদপেই সত্যি নয়।

বিকাশ সেনকে কেউ ফোন করেনি বলছো? গল্পটা ভদ্রলোক নিজের মাথা থেকে বার করেছেন?

এমন কি হতে পারে না ?

পারে। তবে এই প্রসঙ্গে একটা বড় ধরনের প্রশ্ন দেখা দেবে ডাক্তার। এই গালগল্প প্রচারের কারণটা কি ? এতে বিকাশ সেন কিভাবে লাভবান হচ্ছে ?

শৈবাল ভ্রূ কুঁচকে বলল, এ ধরনের একটা প্রশ্ন অবশ্য থেকে যাচ্ছেই। ধরে নেওয়া যাক, আমরা বুঝতে না পারলেও লাভ একটা নিশ্চিত হবে। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল ?

বাসব বিমর্ষ ভাবে বলল, এমন কিছু দাঁড়াল যা আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনার বাইরে। ফোনের ব্যাপারটা যদি মিথ্যে হয়, তাহলে আর একটা বিষয় নিয়ে আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে।

কোন বিষয় ?

সেদিন সিনেমা থেকে বেরোবার পর কেউ দেখতে পেল না অথচ বিকাশ সেন দেখলেন, প্রভাকর চৌধুরী ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছেন। সত্যি তিনি প্রভাকর চৌধুরীকে দেখেছিলেন, না বানানো গল্প ?

খেলা বেশ জমে উঠছে। এক কাজ করলে হয়। প্রভাকর চৌধুরীর সঙ্গে এ সম্পর্কে কথা বলা যেতে পারে।

ঠিক বলেছো।—বাসব উঠে পড়ল।

কি হল ?

চল, যাওয়া যাক। বিদ্যাসাগর কি বলে গেছেন জানো তো ? কোন কাজ কাল করিব বলিয়া ফেলিয়া রাখিবে না।

কিড স্ট্রীট কলকাতার অন্যতম ছিমছাম রাস্তাগুলোর মধ্যে একটা। অভিজাত আর পদস্থ ব্যক্তিদেরই এখানে বসবাস। ঠিকানাটা জানা থাকায় প্রভাকর চৌধুরীর ফ্ল্যাট খুঁজে পেতে বিশেষ অসুবিধে হল না। কলিংবেলে আঙুল ছোঁয়াবার অল্পক্ষণের মধ্যেই দরজা খুলে গেল। গৃহকর্তা ওদের মুখোমুখি হলেন স্বয়ং। তারপরই বিস্ময় মিশ্রিত উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়লেন।

কি সৌভাগ্য ! আপনারা ! আসুন—আসুন—

ওরা সাজানো গোছানো একটা ঘরে গিয়ে বসল।

গৃহস্বামী বললেন, 'কি খাবেন বলুন? আমি অবশ্য একলা মানুষ, তবে কোন অসুবিধে হবে না। একটা কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড আছে। হুইস্কি বা ওই ধরনের কিছু যদি প্রেফার করেন, তাহলে—

বাসব দ্রুতগলায় বলল, না না, চা-ই যথেষ্ট। আমরা এখন এসেছি কেসটা সম্পর্কে আপনার সঙ্গে কথা বলতে।

বেশ তো। আমার দ্বারা যদি কোন উপকার হয়, আমি সব সময় রেডি আছি জানবেন। একটু বসুন।

প্রভাকর চৌধুরী প্যাসেজের দিকে চলে গেলেন। ফিরে এলেন অবশ্য কয়েক মিনিটের মধ্যেই। মনে হয় কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ডকে চা সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে এলেন।

বলুন এবার?

আশা করি, আপনি আমার কাছে কোন কথা লুকোবেন না?

নিশ্চয় না।

আপনি দিল্লী থেকে কবে কলকাতায় ফিরেছেন, মিস্টার চৌধুরী?

বলেছি তো। আবার এ প্রশ্ন কেন?

বাসব পাইপে মিক্সচার ঠাসতে ঠাসতে বলল, বলেছেন। তবে উত্তরটা ঠিক নয়।

তার মানে—

আমাদের ইনফর্মেশন অনুসারে, আপনি কলকাতায় ফিরেছেন মালা সোম খুন হবার আগেই।

তীক্ষ্ণ গলায় চৌধুরী প্রশ্ন করলেন, ইনফর্মেশনের উৎসটা জানাতে নিশ্চয়ই বাধা নেই।

একেবারেই না।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে আবার বলল, বিকাশ সেন আপনাকে দেখেছেন। ওরা যখন গ্লোব থেকে সিনেমা দেখে বেরোলেন, তখন আপনি ওখানেই ছিলেন।

বিকাশ সেন ভিড়ের মধ্যে আমার মত আর কাউকে দেখে থাকতে

পারেন।

অবশ্যই পারেন। তবে কথাটা কি জানেন, তদন্তের সুবিধের জন্যে যা সত্যি, আমি তাই জানতে চাইছিলাম।

প্রভাকর চৌধুরী একটু চুপ করে থেকে কি সমস্ত ভাবলেন। বললেন তারপর, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার জেনে তদন্তের কি সুবিধা হবে, আমি বুঝতে পারছি না। যা হোক্, আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করাই আমার কর্তব্য। দিল্লীতে আমি একদিনের বেশি থাকিনি। ওখানে গিয়েই বুঝতে পারলাম, কনফারেন্স হবার সম্ভাবনা নেই।

তার মানে, মালা সোম খুন হওয়ার বেশ কয়েক দিন আগে থেকেই আপনি কলকাতায় আছেন?

হ্যাঁ।

অথচ অফিসে জাননি। গাড়িটাও অনন্তবাবুর কাছ থেকে ফেরত নেননি—এ সমস্তর নিশ্চয় সঙ্গত কারণ আছে?

এই সময় এক ছোকরা চা আর স্ন্যাকস রেখে গেল সেন্টার পিসের ওপর।

তিনজনে পেয়ালা তুলে নিল।

প্রভাকর চৌধুরী বললেন, কারণটা সঙ্গত কিনা জানি না। আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে, আমার বেহিসেবী জীবন সম্পর্কে কিছু বলতে হয়। উঁচু ঘরে জন্মেছিলাম। লেখাপড়াও শিখেছিলাম ভাল মত। যথা সময়ে বিয়েও করেছিলাম। বছর পাঁচেক পরে স্ত্রী মারা গেলেন। এর পরই কেমন সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল। সেই সমস্ত বৃত্তান্ত আপনাদের কাছে ক্লান্তিকর মনে হবে। মোট কথা, আমি এই ফ্ল্যাটে চলে এলাম। তারপর বহু বছর ধরে এখানেই আছি। এই তো গেল ভূমিকা। এবার মূল কথায় আসি।

প্রভাকর চৌধুরী থামলেন। কয়েক চুমুকে পেয়ালা শেষ করে বললেন আবার, কেন জানি না, আমি অন্যরকম মানুষ হয়ে গেলাম। আমার চরিত্র থেকে সংযম বিদায় নিল। এই ফ্ল্যাটে যে কত মহিলার আগমন হল, তার হিসেব আমি রাখিনি। আধুনিক প্রসঙ্গে আসা

যাক এবার। দিল্লীতে এক সুরূপা সিন্ধ্রী মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। প্রস্তাব করার পরই সে রাজী হয়ে গেল আমার সঙ্গে কলকাতায় আসতে। তাকে নিয়েই ক'দিন কাটলো চমৎকার ভাবে। তাই অফিস যাইনি বা কাউকে জানাতে চাইনি যে আমি ফিরে এসেছি।

সেদিন এত রাত্রে আপনি গ্লোবের কাছাকাছি কি করছিলেন?

দিল্লীর মহিলাকে ট্রেনে তুলে দিতে হাওড়া গিয়েছিলাম। ওখান থেকে ফেরার পর সিনেমা দেখার ইচ্ছে হয়ে গেল। ঢুকলাম টাইগারে। শো শেষ হবার পর লিণ্ডসে স্ট্রীট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছিলাম, বিকাশ সেন সেই সময় আমায় দেখে থাকবে।

আচ্ছা, আপনি এই তদন্ত সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড কেন?

মানবিকতা বলতে পারেন।

বাসব নড়েচড়ে বসে বলল, দম্পতিকে তো আপনি অনেকদিন থেকে চেনেন। ওদের সম্পর্কে কিছু বলুন।

অনন্ত আমাদের অফিসে যোগ দিয়েছে বছর আটেক আগে। তখন থেকে ওদের আমি ঘনিষ্ঠ হই। মানুষ হিসেবে ভালই। দুজনেই বেশ মিশুক।

মালা সোমের চরিত্র সম্পর্কে আপনি কি জানেন? অবশ্য কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার চরিত্র নিয়ে আলোচনা করাটা ঠিক শিষ্টাচারসম্মত নয় জানি। কিন্তু এক্ষেত্রে—

মালার চরিত্র—

তাঁর চরিত্র ভাল ছিল না, এই সংবাদ আমরা পেয়েছি। আমার মনে হয়, এই চরিত্রঘটিত দিকটাই এই কেসের মূল সূত্র। আপনি এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারবেন কি?

প্রভাকর চৌধুরী সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। অন্যমনস্ক ভাবে এগিয়ে গেলেন জানলার দিকে। ফিরে এলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। বসলেন না। একটা সোফার পিছন দিকে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন ক্লান্ত গলায়, মালার চরিত্র ভাল ছিল না।

আপনি কিভাবে জানলেন ?

আমি জানি।

প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ আছে ?

প্রভাকর চৌধুরীর মুখে ম্লান হাসি দেখা দিল : আমি মনস্থির করে ফেলেছি মিস্টার ব্যানার্জি। যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে পরিষ্কার ভাবে সমস্ত কিছু বলাই ভাল। তবে আপনাকে কথা দিতে হবে, যা বলতে চলেছি তার একটা শব্দও অন্যের কানে যাবে না।

কথা দিলাম।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি নিজেই।

কি রকম ?

মালা সোম বিচিত্র স্বভাবের মেয়ে ছিল। আলাপের বছর দুয়েক পরে লক্ষ্য করলাম, সে আমাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। আমার স্বভাবের কথা আগেই বলেছি। আমি সুযোগটা গ্রহণ করলাম। বছর তিনেক ধরে লুকিয়ে চুরিয়ে আমাদের পরকীয়া ব্যাপারটা ভালই চলল। তারপর আমি মালা সম্পর্কে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। সেও বোধহয় বুঝতে পেরেছিল। কাজেই আমাদের ওপরের সম্পর্কটাই বজায় রয়ে গেল।

অর্থাৎ উনি আরেকজন বন্ধু যোগাড় করে নিলেন ?

তা বলতে পারব না। তার মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত এ সম্পর্কে আমার কিছুই জানা ছিল না।

ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী। মন খুলে যে আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, এতে আমি খুশি হলাম। আচ্ছা, আপনার কাউকে সন্দেহ হয় ?

কাজটা যে গুণ্ডা দুটোর, এ তো আমরা সকলেই জানি। আপনার বা পুলিশের কর্তব্য হচ্ছে ওদের ধরা। নয় কি ?

ওদের ধরার চেষ্টা তো করতেই হবে। তবে কাজটা ওরা নিজের ইচ্ছেয় করেছে, না কারোর নির্দেশে এই কাজে নেমেছিল—এখন এই প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে, ভুলে যাবেন না।

ভ্রূ কুঁচকে প্রভাকর চৌধুরী বললেন, ব্যাপারটা যদি সত্যি এই ভাবে গড়িয়ে থাকে, তবে তো অমিতাভ দত্ত সামনেই রয়েছে। তাকে

নেড়েচেড়ে দেখুন।

তার স্বার্থ?

স্বার্থ নেই বলছেন?

আপাত দৃষ্টিতে তো মনে হয় ভদ্রমহিলাকে বাঁচিয়ে রাখাটাই তার প্রধান স্বার্থ হওয়া উচিত। যা হোক, এখন আমরা উঠলাম। পরে আবার দেখা হবে।

বাসব আর শৈবাল উঠে দাঁড়াল।

পরের দিন সন্ধ্যার মুখেই অনন্তর ফ্ল্যাটে পৌঁছল বাসব। আগেই ফোনে সময় ঠিক করে রেখেছিল। শৈবাল আজ সঙ্গে নেই। মেডিক্যাল কলেজে আটকে পড়েছে বিশেষ কাজে।

অনন্ত বসালো বাসবকে: কতদূর কি হল মিস্টার ব্যানার্জি?

বাসব মৃদু হেসে বলল, গুটি গুটি পা পা করে এগোচ্ছি। এখন আমি আপনার কাছে কেন এলাম, তাই বলি। আপনার স্ত্রীর জিনিসপত্রগুলো একবার নাড়াচাড়া করে দেখতে চাই।

বেশ তো। আসুন।

অনন্ত বাসবকে শোবার ঘরে নিয়ে গেল। ঘরখানা মোটামুটি বড়ই। ষোলো বাই ষোলো হবে। বিশাল জানলাটার কাছাকাছিই জোড়া খাট। খাটের ওধারে প্রমাণ সাইজের দুটো স্টিলের আলমারি। পুবদিকের দেওয়াল ঘেঁষে সুদৃশ্য ড্রেসিং টেবিল। দামী টয়লেট থরে থরে সেখানে সাজানো। ড্রেসিং টেবিলের হাত কয়েক দূরে, দেওয়াল ঘেঁষে ছোট একটা রাইটিং টেবিল। তার সামনে হাতলহীন ফোল্ডিং চেয়ার।

বাসব ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার দুটো একে একে খুলে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল। কাজে লাগতে পারে, এমন কিছু আছে বলে মনে হল না। টয়লেটগুলো নেড়েচেড়ে দেখল। সবগুলোই কম-বেশি খরচ হয়েছে।

স্টিলের আলমারি দুটোর দিকে এগিয়ে গেল বাসব। বলল,

একটা আপনার, আর একটা আপনার স্ত্রীর বোধহয় ?

হ্যাঁ।

আপনার স্ত্রীর আলমারিটা খুলুন। আমি একবার ভেতরটা দেখে নিতে চাই।

অনন্ত বলল, চাবি তো আমার কাছে নেই।

কোথায় গেল ?

পুলিশ নিয়ে গেছে।

বাসব আক্ষেপসূচক শব্দ করে বলল, দেখুন তো, একথা আগেই আমার খেয়াল করা উচিত ছিল। চাবির জন্যে এখন কিছু সময় নষ্ট হবে। ফোন করি লালবাজারে।

চাবিটা কিন্তু থানা থেকে নিয়ে গেছে।

তা হলেও লালবাজারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। থানা আমার অনুরোধকে পাত্তা দেবে না।

ড্রইংরুমে এসে পুরন্দর সামন্তর সঙ্গে যোগাযোগ করল বাসব। উনি অভয় দান করলেন। আধ ঘন্টার মধ্যে চাবি এসে পৌঁছল। চাবিবাহক স্বয়ং থানার চিত্ত বক্সী। বক্সীমশাই বাসবকে আগে কখনো দেখেননি। তবে তার নাম শুনেছিলেন। এই সঙ্গে তাঁর আরো জানা ছিল, এই ভদ্রলোককে ওপরওয়ালারা বেশ শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন। তিনি বললেন, ভারি ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু কর্তাদের আদেশ তো আর ঠেলা যায় না। চাবি নিয়ে এসেছি।

বাসব ভালই জানে, এই সমস্ত লোকের কিছুটা পরশ্রীকাতরতা থাকে। অবশ্য এতে দোষ দেওয়া যায় না তাদের। বাইরের লোক ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত দায়িত্বের মধ্যে মাথা গলাতে এলে কার বা কাদের ভাল লাগতে পারে ?

বাসব হালকা গলায় বলল, আপনি বোধহয় ভিকটিমের আলমারিটা পরীক্ষা করে দেখেছেন ?

চিত্ত বক্সী নিরাসক্ত ভাবে বললেন, না। দেখে কি হবে ? খুনের কিনারা তো হয়ে গেছে বলা চলে। এখন লোক দুটোকে ধরতে

পারলেই হল ? অকারণ পরিশ্রম করে লাভটা কি বলুন না ?

তা বটে। তবে আমার মত লোক মক্কেলের স্বার্থে নানা দিক বাজিয়ে দেখবার চেষ্টা করবে। কাজে যখন লাগল না, তখন চাবিটা অনন্তবাবুকে ফিরিয়ে দিলেই তো পারতেন।

ভেবেছিলাম, কেসটা ফাইন্যাল হয়ে গেলেই ফেরত দেব। আলমারিটা এবার খুলে দিচ্ছি। আপনি বাজিয়ে দেখুন।

চিত্ত বক্সী পকেট থেকে চাবি বার করে আলমারি খুললেন। বাসব তাঁর বিদ্রুপ বেবাক হজম করে গিয়ে নিজের কাজে মন দিল। ওপরের তাকে ব্লাউজ, সায়া ইত্যাদি ঠাসা। দ্বিতীয় তাকটা হল লকার। তৃতীয় তাকে হ্যাঙ্গারের ব্যবস্থা। সারি সারি শাড়ি ঝুলছে। চতুর্থ তাকটা টুকিটাকি মেয়েলী জিনিসে ভরা। বাসব শাড়ি-জামা নেড়েচেড়ে দেখল না। চাবির সাহায্যে লকার খুলে উঁকি মারল ভেতরে। রূপার একটা বাক্স প্রথমেই চোখে পড়ল। তাতে কিছু খুচরো গয়না।

বাসব অনন্তর দিকে ফিরে বলল, গয়নাগুলো কি আপনার স্ত্রীর ?

একনজর দেখে নিয়ে অনন্ত বলল, হ্যাঁ। শুধু এই আংটিটা মনে হচ্ছে—

আপনি কিনে দেননি।

বাসব আংটিটা তুলে নিল। লাল পাথর বসানো সুদৃশ্য চেহারা। মালাকে কেউ একজন এই আংটি প্রেজেন্ট করেছিল। আংটিটা বাক্সে রেখে দিয়ে বাসব অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরালো। একধারে রাখা রয়েছে ব্যাঙ্কের পাশবই আর চেকবুক। কলেজ স্ট্রীট ব্রাঞ্চের ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের একাউন্ট ছিল মালা সোমের। খুঁটিয়ে দেখল পাশবইটা বাসব। মাস দুয়েক আগে শেষবারের মত হিসেব আপটুডেট করা হয়েছিল। তখন অ্যাকাউন্টে ছিল পঁয়তাল্লিশ হাজারের সামান্য কিছু বেশি।

অনন্তবাবু—

বলুন ?

আপনার স্ত্রীর অনেক টাকা ছিল তো ?

বাপের বাড়ি থেকে ও অনেক টাকা পেয়েছিল।

বাসব আর কিছু না বলে চেকবইটা তুলে নিল। একের পর এক কাটা চেকের ফয়েলগুলো দেখে যেতে লাগল। এতক্ষণ তার কার্য-কলাপ লক্ষ্য করছিলেন চিত্ত বক্সী। তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ছিল। থেকে থেকে কুঁচকে উঠছিল ভ্রূ। বললেন এবার, আপনার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, হত্যাকারী যেন আলমারির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে।

অনেকটা তাই।

কিরকম ?

আলমারির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বাসব বলল, মোটা দাগের ব্যাপার স্যাপারের আপনারা হলেন কারবারী। আপনাদের মত কিছু সংখ্যক ব্যক্তি সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না। আপনি স্বীকার করবেন কিনা জানি না, কিন্তু আপনার ওপরওলারা স্বীকার করেন, এ সমস্ত ব্যাপারে আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে যাই হোক, এই তদন্তের কথাতেই আসা যাক। এই চেকবুকটা নেড়েচেড়ে দেখেছেন কি ?

চেকবুক !

ভুলেই গিয়েছিলাম, আলমারিটা খুলে দেখার প্রয়োজনীয়তা আপনি বোধ করেননি। এখন চেকবুকটা অন্তত দেখুন। খুঁটিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন বিরাট অসঙ্গতি রয়েছে। আমি মনে করি এই অসঙ্গতিই হল বিরাট একটা সূত্র।

চিত্ত বক্সী চেকবইটা হাতে নিলেন। নেড়েচেড়ে দেখলেন খানিক। তারপর ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন বাসবের দিকে।

অসঙ্গতির তো কিছু দেখছি না। ভদ্রমহিলার যখন যেমন টাকার দরকার হয়েছে ব্যাঙ্ক থেকে তুলেছেন।

হাসিতে মুখ ভাসিয়ে বাসব বলল, অবাক কাণ্ড! এত বড় ফাঁকটা আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। আচ্ছা, খুনের ঘটনা ঘটেছিল কোন তারিখে ? এগারো তারিখে নাকি ?

হ্যাঁ।

দশ তারিখে মিসেস সোম বিয়াল্লিশ হাজার টাকার চেক কেটেছেন। লকারের মধ্যে টাকাটা নেই। টাকাটা কোথায় গেল, তার উত্তর ওই চেক বুকেই রয়েছে। ফয়েলে উনি নোট রেখেছেন, এ. ডি. নামে কোন ব্যক্তির যেভাবে চেকটা কেটেছেন। এখন আপনিই বলুন চিত্তবাবু, এই টাকাটা কি খুনের অন্যতম মোটিভ হতে পারে না ?

রুমাল দিয়ে ঘাড় মুছলেন চিত্ত বক্সী। গলা নামিয়ে তারপর বললেন, এই কেসের সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট, তাঁদের মধ্যে অমিতাভ দত্ত, ছাড়া তো আর কেউ এ ডি নেই। আপনি বলতে চাইছেন—

শ্রীমতী টাকাটা অমিতাভকে দিয়েছেন ?

হুঁ। ব্যাপারটা আরো ঘোরালো হয়ে উঠল।

আপনি অমিতাভ দত্তর সঙ্গে কথা বলেছেন ?

বলেছি। মালা সোমের সঙ্গে তার প্রেম ছিল, এ কথা সে অস্বীকার করেনি। আবার তাকে চেপে ধরতে হবে দেখছি। আপনি বলতে চাইছেন, গুণ্ডা দুটো অমিতাভের কাছ থেকে টাকা খেয়ে খুনটা করেছে ?

ঘটনাটা যে এইভাবেই গড়িয়েছে, সহজেই আঁচ করা যায়। ভাল কথা, গুণ্ডা দুটোর কোন খবরাখবর পেলেন ?

এখনো পাইনি। গোবিন্দ ওই অঞ্চলের ছিনতাইবাজদের বস। তাকে লাগিয়েছি।

আমি কিন্তু তাদের আস্তানার সন্ধান পেয়েছি।

চিত্ত বক্সী কিছু বলার আগেই ড্রইংরুম থেকে এ ঘরে এল অনন্ত। সে দুজনকে অনুসন্ধান করার সুযোগ দিয়ে ওখান থেকে চলে গিয়েছিল। অনন্ত বলল, মিস্টার ব্যানার্জি, আপনার ফোন—

এখানে—আমার ফোন ?

বাসব কিছুটা অবাক হয়ে ফোন ধরতে গেল।

শৈবালের গলা পাওয়া গেল : আমি লালবাজারে তোমার খোঁজ

করেছিলাম, সামন্ত বললেন, তুমি অনন্তবাবুর ফ্ল্যাটে রয়েছ—

কি ব্যাপার ?

এনায়েত এসেছে—জরুরি কথা আছে বলছে—

ওকে বসিয়ে রাখ—আমি আসছি—

রিসিভার নামিয়ে রেখে আবার পাশের ঘরে এল। কোন কথা না বলে আবার আলমারি পর্যবেক্ষণে মন দিল। লকারের মধ্যে মেয়েলী প্রয়োজনের অনেক দামী জিনিস ছিল। সেগুলো দেখতে দেখতেই একটা চ্যাপ্টা ধরনের শিশি চোখে পড়ল। তার মধ্যে গোটা পাঁচ-সাত লালচে রঙের ট্যাবলেট রয়েছে। শিশিটা হাতে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল বাসব। ওষুধের নাম শিশির গায়ে লেখা ছিল—ওপেক্স। কয়েক সেকেণ্ড শিশিটার দিকে তাকিয়ে রইল তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, অনন্ত আর চিত্ত বক্সী ঘরের আরেক প্রান্তে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। সুতরাং শিশিটা সহজেই পকেটস্থ করা সম্ভব হল।

আর কিছু দেখার নেই! আলমারিটা বন্ধ করতে পারেন—বাসব বলতে বলতে এগিয়ে এল।

বক্সী বললেন, নতুন কোন সূত্র পেলেন নাকি ?

সূত্র খোঁজার দায়িত্ব আমার পুরোপুরি নয়। আপনি সরকারী লোক। মাথাটাথা যা ঘামাবার আপনি ঘামাবেন। এখন আমি চলি। তবে যাবার আগে বলে যাই, দুটো গুণ্ডা আছে বটে, তবু এই খুনটা সহজ সরল পথ ধরে হয়নি।

মিনিট পঁয়তাল্লিশের মধ্যেই বাসব নিজের বাড়ি পৌছল। শৈবাল তখন এনায়েতের সঙ্গে গল্প করছিল। বাসবকে দেখেই এনায়েত সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে লম্বা একটা সেলাম ঠুকল।

বাসব বসতে বসতে বলল, উঠে দাঁড়ালে কেন ? বসো। তারপর, কোন খবর-টবর আছে নাকি ?

হ্যাঁ, স্যার। কেল্টু বাসায় ফিরেছে বেলা পাঁচটা আন্দাজ সময়।

আর পিকু ?

যতদূর খবর পেয়েছি, পিকুও আজ আসবে। ঘরটার ওপর নজর রাখবার জন্য জগাইকে ওখানে রেখে এসেছি।

সে কে?

এক গাল হেসে এনায়েত বলল, সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করে। আমার আগেকার দলে ছিল। ছোঁড়াটা ভারি কাজের।

এখনই তোমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ব?

এখন নয়। সময় মত আমি আপনাকে ডেকে নিয়ে যাব।

বাসব পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বার করে বলল, এটা রাখ। জগাই না কি যেন নাম বললে, তাকেও তো কিছু দিতে হবে।

সসঙ্কোচে নোটটা নিয়ে এনায়েত বিদায় নিল।

বাসব হাই তুলল। তারপর পাইপে মিক্সচার ঠাসতে লাগল।

শৈবাল বলল, কিছু এগোল?

মানসিক গতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে এখন পাইপ টানা দরকার। অনেকক্ষণ ধোঁয়া ছাড়িনি।

বাজে কথা রাখ। কাজ কতদূর এগোল, তাই বল?

মৃদু হেসে বাসব পাইপ ধরাল। ঘনঘন কয়েকবার ধোঁয়া ছাড়ার পর বলল, এ তো রাগের কথা ডাক্তার। আচ্ছা, তোমাকেই একটা প্রশ্ন করি প্রথমে। ওপেক্স নামে কোন ওষুধের সন্ধান তোমার জানা আছে?

কেন থাকবে না।

কোন অসুখে লাগে ওষুধটা?

ওটা একটা হরমন জাতীয় ব্যাপার। শরীরের আভ্যন্তরীন দুর্বলতায়—মানে, বুঝতেই পারছ—ওসমস্ত ক্ষেত্রেই ওপেক্স ব্যবহার করা হয়। ইউরোপ, আমেরিকায় তো চল্লিশের ওপরের অধিকাংশ লোকই এই ধরনের হরমন পিলস ব্যবহার করে।

অর্থাৎ স্ত্রীলোক ওপেক্স জাতীয় পিল ব্যবহার করে না!

না। ব্যাপারটা কি বল তো? তুমি হঠাৎ হরমনের ওষুধ

নিয়ে মাথা ঘামাতে আরম্ভ করলে। এই তদন্তের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আছে নাকি?

আছে কিনা এই মুহূর্তে বলতে পারছি না ডাক্তার। ওপেক্সের একটা অর্ধেক ব্যবহার করা শিশি আমি মালা সোমের স্টিলের আলমারিতে পেয়েছি। দেখ না—

বাসব পকেট থেকে ওপেক্সের শিশিটা বার করল।

শৈবাল শিশিটা নেড়েচেড়ে দেখে সেণ্টার টেবিলে রাখতে রাখতে বলল, এই ট্যাবলেটগুলো আর কার্যকরী নয়। বছর কয়েক আগেই ডেট এক্সপায়ার করে গেছে।

সেটা দেখেই তো শিশিটা সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। তুমিই বল ডাক্তার, এতে চিন্তার খোরাক আছে কিনা?

নেই, একথা বলা যায় না। ডেট এক্সপায়ার হয়ে যাওয়া একটা ওষুধ মালা সোম যত্ন করে আলমারির মধ্যে বন্ধ করে রেখেছিলেন কেন? এছাড়াও ওষুধটা মহিলাদের ব্যবহার উপযোগী নয়।

তুমি ঠিকই বলছ। তবে বুঝে উঠতে পারছি না, ওপেক্স এই রহস্যের কোন চাবিকাঠি কিনা। ওষুধটা বোধহয় যে কোন দোকানেই পাওয়া যায়?

আমি যতদূর জানি, না বোধহয়। ওপেক্স জার্মানির ওষুধ। যাদের ইম্পোর্ট লাইসেন্স আছে, তারা নিজেদের কাউণ্টার থেকে বোধহয় বিক্রি করে।

কাদের লাইসেন্স আছে, কিভাবে জানা যাবে?

আমি খোঁজ নিয়ে তোমায় বলব।

এর জন্য প্রেসক্রিপসন দরকার হয়?

হওয়া তো উচিত নয়। নানা কোম্পানির হরমন পিলস্ বাজারে প্রচলিত। যে কেউ নিতে পারে। তবে ওপেক্স বিদেশী ওষুধ—সাধারণ মানুষের নাম না জানা থাকাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে ডাক্তাররা প্রয়োজনানুসারে পেসেণ্টকে প্রেসক্রাইব করেছেন, এটাই স্বাভাবিক।

হুঁ। দেখ ডাক্তার, হয়তো ওপেক্সের সঙ্গে এই ব্যাপারের কোন

সম্বন্ধই নেই। তবু মহিলা ওষুধটার প্রতি আগ্রহ কেন দেখিয়েছিলেন, তা না জানা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না।

শৈবাল হেসে ফেলল ঃ সময় সময় তোমার ধ্যান-ধারণা ভারি ঘোলাটে হয়ে পড়ে। এনায়েতের ব্যাপারটা নিয়ে কি স্থির করলে?

কি স্থির করলাম মানে?

সে আমাদের বেলেঘাটায় নিয়ে যাচ্ছে। পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া তো দরকার। গুণ্ডা দুটোকে পেলে—

ওদের ধরিয়ে দেবার ইচ্ছে আমার নেই।

সেকি!

মৃদু হেসে বাসব বলল, ওদের ধরা পড়ে যাওয়ার অর্থ হল, এই কেসের ভেতরের ব্যাপারটা একেবারেই জানা যাবে না। পুলিশ বিশেষ মাথা ঘামাবে না। ওদের চালান করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে। আমি চাই ওদের সঙ্গে কথা বলতে। অর্থাৎ ওদের পেট থেকে কিছু কথা যে কোন ভাবে বার করে নেওয়ার চেষ্টা করা।

লোক দুটো যে খুন করেছে, তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। তুমি ওদের শাস্তি চাও না?

চাই ডাক্তার। পিকু আর কেল্টু দুজনেই মার্কা মারা ক্রিমিনাল। ওদের সন্ধান যখন পাওয়া গেছে, তখন ধরা আজ নয় কাল ওরা পড়বেই। তার আগে আমি শুধু নিজের কাজটুকু গুছিয়ে নিতে চাই।

রাত তখন এগারোটার কাছাকাছি। বেলেঘাটার এইধারটায় তেমন গমগমে ভাব নেই। অল্পবিত্ত কিছু মানুষ আর কিছু গোলমেলে চরিত্রের এখানে বসবাস। লোডশেডিং চলেছে এখন। এমন নিশ্চুপ অবস্থা যে কলকাতার কোন পাড়া বলে মনেই হয় না।

ট্যাক্সি থেকে নেমে বেশ কিছুটা হেঁটে এনায়েতের পিছু পিছু বাসব আর শৈবাল নির্দিষ্ট স্থানে এসে পৌঁছল। জগাই সতর্ক ছিল। দ্রুত এগিয়ে এল সে। এনায়েতের সঙ্গে চাপা গলায় কি সমস্ত কথা হল তার।

দুটোই এখন ঘরে আছে। আমি গিয়ে দরজাটা খোলাচ্ছি। আপনারা আমার পিছু পিছু আসুন।

কথাটা শেষ করেই এনায়েত ভাঙাচোরা ফুটপাথ ধরে গজ দশেক এগিয়ে একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একটু থেমে মৃদু করাঘাত করল। কোন সাড়া নেই। আবার একটু জোরে।

সাড়া পাওয়া গেল এবার : কে ?

এনায়েত সেখ।

টেরেটি বাজারের এনায়েত ?

হ্যাঁ। দরজা খোল। কথা আছে।

দরজা খুলে গেল এবার। পিছনের তিনজন আড়ালে সরে গিয়েছিল। দরজার বাইরে উঁকি মারল পিকু। সন্দেহজনক কিছু চোখে না পড়ায়, এনায়েতকে ভেতরে আসতে ইশারা করল।

ঘরখানা বিশেষ বড় নয়। একটা চৌকি আর হাতলভাঙা খানদুয়েক চেয়ার—এছাড়া আর কোন আসবাব নেই। তাকের ওপর মোটা বেড়ের একটা মোমবাতি জ্বলছে। এনায়েতকে আপাদ-মস্তক একবার ভাল করে দেখে নিল দুই মক্কেল।

রাজাবাজারের বাবুর মুখে শুনলাম—কেল্টু বলল, আপনি আমাদের দিয়ে একটা কাজ করাতে চান ?

রেট জানেন তো—পাঁচ হাজার !

পিকুর কথা শুনে মৃদু হেসে এনায়েত বলল, তার আগে আমি জানতে চাই, তোমরা আমার সম্পর্কে কি শুনেছ ?

কেল্টু বলল, আগে আপনি লাইনের একজন ওস্তাদ ছিলেন। এখন ওসমস্ত ছেড়েছুড়ে ব্যবসা করছেন।

এখনো তোমরা সত্যিকারের কাজের লোক হয়ে উঠতে পারনি। যে লাইনে ছিল, সে নিজের কাজের জন্য দুটো উঠতি গুণ্ডার সাহায্য নেবে কিভাবে তোমরা ভেবে নিলে ! বাবুকে দিয়ে টোপটা ফেলেছিলাম। আসল কাজটা আমার অন্য।

তীক্ষ্ণ গলায় পিকু বললে, বুড়ো বয়সেও মস্তানি ! কি চান—

কথাটা বলেই পিকু এগিয়ে এসেছিল, তার পেটে একটা ওজনদার স্ট্রেটকাট চালিয়ে এনায়েত বলল, চেঁচিও না। কোন যন্ত্রপাতি বার করবার চেষ্টাও কোরো না। আমার কাছে তোমরা নিতান্তই শিশু।

তারপর গলা উঁচিয়ে বলল, আপনারা ভেতরে আসুন।

পিকু তখন পেট চেপে ঘরের একপাশে পড়ে আছে। কাতরাচ্ছে থেকে থেকে।

জগাই ঘরে ঢুকেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় কেল্টুকে সাপটে ধরল। চেপে বসালো একটা চেয়ারে। তারপর তার পকেট হাতড়াতে লাগল।

পকেটে কিছু নেই। বেঁধে ফেলব ওস্তাদ?

ওটাকেও চেয়ারে এনে বসাও।

বাসব বলল, প্রথম দৃশ্যেই নাটকটা তুমি জমিয়ে তুললে এনায়েত।

পানের ছোপ ধরা দাঁত বার করে এনায়েত বলল, অনেকদিন পরে এরকম একটা খেলা খেললাম স্যার। এবার আপনার কাজ আরম্ভ করুন।…শোন রে শালারা, উনি যা জিজ্ঞেস করবেন, ঠিক ঠিক উত্তর দিবি। নইলে তোদের আস্ত রাখব না।

পিকুকে চেয়ারে তখন বসানো হয়েছে।

বাসব বলল, মালা সোমকে তোমরা প্রথমে লোপাট করেছ, তারপর তাকে মেরে ফেলেছ—একথা আমরা জানি। এই মুহূর্তে তোমাদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন কিছু নয়। তবে এ কাজটা করার আগে তোমাদের একটা সুযোগ দিতে চাই। আমি সরকারী লোক নই, বেসরকারী গোয়েন্দা। শর্তটা হল, আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দেওয়া। রাজী?

কেল্টু আমতা আমতা করে বলল, কোন খুনের কথা বলছেন—আমরা ওসব কিছু জানি না।

গর্জে উঠল এনায়েত, হারামি—মিথ্যে কথা বলছিস? আমাদের সাক্ষী আছে। ঠিক করে বল সমস্ত কথা। নইলে হিঁচড়ে নিয়ে যাব লালবাজারে। সেখানে ভালই খাতির-যত্ন হবে।

বলা বাহুল্য, একটা চড় এসে পড়ল কেল্টুর মুখে। এরপর

রাজী না হয়ে উপায় ছিল না। প্রশ্ন উত্তর আরম্ভ হল। উত্তর কখনো পিকু, কখনো কেল্টু দিয়ে যেতে লাগল।

প্রশ্ন : অমিতাভ দত্তর সঙ্গে তোমাদের যোগাযোগ হল কিভাবে।

উত্তর : বলাই বলে একটা লোক আছে। আমাদের দালাল বলতে পারেন। সে আমাদের সঙ্গে দত্তবাবুর যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল।

প্রশ্ন : অমিতাভ বলাইকে চিনল কিভাবে?

উত্তর : তা জানি না স্যার।

প্রশ্ন : অমিতাভ তোমাদের কি করতে বলেছিল?

উত্তর : এক মহিলার সঙ্গে উনি আশনাই করতেন। তার স্বামীকে উচিত মত শিক্ষা দিতে বলেছিলেন।

প্রশ্ন : শিক্ষা মানে—

উত্তর : এমন ব্যবস্থা করতে, যাতে স্ত্রীর ওপর আর কোন আগ্রহ না থাকে। আর তেমনি কিছু করতে না পারলে, লোকটাকে মেরে ফেলতে বলেছিলেন।

প্রশ্ন : তোমরা রাজী হয়েছিলে?

উত্তর : হ্যাঁ, স্যার। পাঁচ হাজার টাকার চুক্তি হয়েছিল।

প্রশ্ন : ভদ্রলোককে চিনিয়ে দেওয়া হয়েছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, স্যার।

প্রশ্ন : কিন্তু তোমরা তো ভদ্রলোককে কিছু করনি। মহিলাকেই খুন করে বসে আছো। এর মানে কি?

উত্তর : দত্তবাবু প্রথমে আমাদের পনেরোশো টাকা দিয়েছিলেন। তারপর টালবাহানা করতে লাগলেন। আমরাও চেপে গেলাম। ভাবলাম, খাটাখাটুনি না করে যা পাওয়া গেল তাই ভাল।

প্রশ্ন : খুনটা তবে করতে গেলে কেন?

উত্তর : বলাই যে আবার এল—

প্রশ্ন : এর মানে?

উত্তর : বলাই এসে সব ব্যবস্থা করে দিল।

প্রশ্ন : কি রকম?

উত্তর : টাকাটা ও এনে আমাদের দিল। বলল, দত্তবাবু প্ল্যানটা একটু পাল্টেছেন। মহিলাকে সরাতে হবে দুনিয়া থেকে। আমাদের উপরি লাভ হবে অনেক টাকার গয়নাগাঁটি।

প্রশ্ন : তোমরা কাজে নেমে পড়লে ?

উত্তর : হ্যাঁ, স্যার।

প্রশ্ন : একবার ভেবে দেখলে না, শেষ সময় প্ল্যানটা পাল্টে গেল কেন ?

উত্তর : আমাদের ব্যবসায় এ সমস্ত নিয়ে মাথা ঘামালে চলে না। পার্টি টাকা দিয়ে দিয়েছে—যেভাবে বলবে, কাজটা সেভাবে করব।

প্রশ্ন : বলাই লোকটা কে ?

উত্তর : আমাদের লাইনের একজন দালাল। মোটা মক্কেল এনে দিলে, তাকে আমরা কমিশন দিই।

প্রশ্ন : তা তো বুঝতেই পারছি। আমি জানতে চাইছি, লোকটার পরিচয় কি ? থাকে কোথায় ?

উত্তর : তা তো জানি না। পরিচয়-টরিচয় জেনে আমাদের কি লাভ ? লোকটার কাছ থেকে মাঝে-মধ্যে কাজ পাই। কমিশন দিয়ে দিই। অন্য ঝামেলায় আমরা মাথা ঘামাতে যাব কেন ?

প্রশ্ন : এনায়েত, তুমি বলাইকে চেনো ?

এনায়েত : নামটা এই প্রথম শুনছি স্যার। অনেক দিন লাইনে নেই। কত নতুন লোক আসছে। তাদের কিভাবে চিনব বলুন ? তবে খোঁজ-খবর যদি নিতে বলেন, সেটা করে দেখতে পারি।

পিকু আর কেল্টুকে আবার প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হল।

প্রশ্ন : বলাইকে কতদিন থেকে চেনো ?

উত্তর : বছর তিনেক থেকে।

প্রশ্ন : লোকটা দেখতে কেমন ? বয়স কত ?

উত্তর : দেখতে বিশেষ সুবিধার নয়। ওজন মোটামুটি ভালই। বয়স মনে হয় পঞ্চাশের কাছাকাছি।

প্রশ্ন : কোথায় তোমাদের সঙ্গে তার দেখা হয়?

উত্তর : কোন বিশেষ জায়গা নেই। কাজের ব্যাপার থাকলে, খুঁজে-পেতে বলাই আমাদের বার করে।

প্রশ্ন : এমন কোন কথা কি তোমরা তার সম্পর্কে বলতে পারো না, যাতে তার সন্ধান পেতে সুবিধা হয়?

উত্তর : আমাদের মনে হয় বলাই বোধহয় কোন অফিসের বেয়ারা-টেয়ারা হবে।

প্রশ্ন : এরকম ধারণা করে নেবার কারণ?

উত্তর : জোর দিয়ে কিছু বলছি না স্যার। আমাদের মনে হয়।

প্রশ্ন : কেন মনে হয়, তাই তো জানতে চাইছি।

উত্তর : আজ পর্যন্ত বলাই আমাদের যত কেস দিয়েছে—মক্কেলরা সব সময় কোন না কোন অফিসের কর্তাব্যক্তি। তাই মনে হয়, বলাই নিশ্চয় কোন অফিসে কাজ-টাজ করে।

প্রশ্ন : অমিতাভ দত্তর সঙ্গে তোমাদের আর দেখা হয়েছে?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : বলাইয়ের হাত দিয়েই টাকা পেয়েছ?

উত্তর : হ্যাঁ, স্যার।

আর কোন প্রশ্ন করল না বাসব। বিদায় নেবার আগে শুধু বলল, তোমাদের থাকার আসল জায়গা হল জেল। তবু আমি তোমাদের ওপর দয়াই করছি। অবশ্য জানি, আজ নয় কাল পুলিশ তোমাদের ধরবেই।

সদলে বাসব বিদায় নেবার পর দুই মক্কেল মুহ্যমানের মত বসে রইল কয়েক মিনিট। তারপর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল কেল্টু। ডান হাত দিয়ে পেট চেপে ধরে চেয়ার ছাড়ল টলমলে অবস্থায় পিকুও। বলল, এরকম অবস্থায় যে আমাদের পড়তে হবে, কে ভেবেছিল। তুমি দেখে নিও দোস্ত, শুয়োরের বাচ্চা এনায়েতকে আমি ছাড়ব না। পেটের ওপর দিয়ে একেবারে রাজধানী এক্সপ্রেস—

পিকুকে কথা শেষ করতে না দিয়ে কেল্টু বলল, ওসমস্ত কথা

পরে ভেবো। এখন এসো, আমরা কেটে পড়ি।

কেটে পড়ব!

কেটে পড়ব না তো কি, এখানে বসে থাকব পুলিশের বালা হাতে পরবার জন্যে? হারামজাদারা এতক্ষণ থানার কাছাকাছি নিশ্চয় পৌঁছে গেছে।

তাই তো। কোথায় যাওয়া যায় বল তো?

ভাবছি, পান্না ওস্তাদের আড্ডাটাই ঠিক হবে। এককালে অনেক উপকার করেছি। আমাদের ফেলতে পারবে না।

কেল্টু ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। পিকুও এল পিছু পিছু।

বেলা প্রায় দশটার সময় বাসব বৌবাজার থানায় পৌঁছল।

চিত্ত বক্সী থানাতেই ছিলেন। বাসবকে তিনি আশা করেননি। তাঁর ভুরু কুঁচকে উঠল। তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলালেন

ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কি সৌভাগ্য। আসুন—আসুন—

একটা চেয়ারে বসতে বসতে বাসব বলল, এই অঞ্চলে গুণ্ডা, ছিনতাইবাজ বা ওই ধরনের এমন কেউ আছে, যার নাম বলাই?

বলাই? একটু চিন্তা করে বক্সী বললেন, যতদূর মনে পড়ছে, আমাদের কাছে যে লিস্ট আছে, তাতে এই নামের কেউ নেই। কি ব্যাপার বলুন তো? ওই লোকটা—

লোকটাকে আমার দরকার। মালা মার্ডার কেসে এই লোকটার একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে বলে আমি মনে করি। আচ্ছা, আপনাদের গোবিন্দ সন্ধান দিতে পারে না?

এই অঞ্চলের কারবারী যদি হয় সে, গোবিন্দ নিশ্চয় তাকে চিনবে। ডেকে পাঠাব?

এখনই দরকার নেই। আপনি পরে একটু খোঁজখবর নেবেন।

তারপর, গুণ্ডা দুটোর সন্ধান পেলেন ?

চিত্ত বক্সী নিরুৎসুক গলায় বললেন, আপনি তো ঠিকানা জানেন বলছিলেন। তাদের সন্ধান করছেন না কেন ?

মৃদু হেসে বাসব বলল, তাদের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। যা জানবার জেনেছি। তাই তো বলাইয়ের খোঁজ করতে হচ্ছে।

অথচ আমাদের খবর দিলেন না! ওদের গ্রেপ্তার করা দরকার, তা আপনার অজানা ছিল না।

আমি সন্ধান দেবো আর আপনারা লোক দুটোকে গ্রেপ্তার করে বাহাদুরী নেবেন, তা হয় না। ওপ্রসঙ্গ এখন থাক। আমি ফোনটা একটু ব্যবহার করছি।

বাসব রিসিভার তুলে নিল। সংযোগ স্থাপিত হবার পর বলল, হ্যালো, লালবাজার···সামন্ত সাহেবকে দেবেন···আমি বাসব ব্যানার্জি --মিস্টার সামন্ত···অসময়ে বিরক্ত করলাম···

পুরন্দর সামন্ত বললেন, একেই বোধহয় বৈষ্ণববিনয় বলে··· প্রয়োজন ছাড়া যোগাযোগ করবার লোক আপনি নন···ঝেড়ে কাশুন···

আপনার একজন লোককে আমার চাই···

একজন সাব ইন্সপেক্টরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি···তাকে নিয়ে কোথায় যাবেন ?

বাড়িতে নয়। আমি বক্সী সাহেবের কাছে রয়েছি·· কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলের একটা ব্যাঙ্কে যেতে চাই···বুঝতেই পারছেন···সঙ্গে পুলিশের লোক না থাকলে ওরা আমায় পাত্তা দেবে না···

তা নাহয় হল···ব্যাপারটা কি--

গুরুগম্ভীর কিছু নয়—একটা চেক সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া। পরে দেখা করে সব বলব···এখন ছাড়ছি···

বাসব রিসিভার নামিয়ে রাখল।

বক্সী বললেন, চেকটা সম্পর্কে আমি খোঁজ নিয়েছিলাম। টাকা তুলতে কেউ যায়নি।

ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন ?

দরকার পড়েনি। কাল ওখানে আমি গিয়েছিলাম। লেজার দেখে অ্যাকাউণ্টেণ্ট বললেন, ওই নম্বরের চেক কাল পর্যন্ত ক্যাশ হয়নি।

বাসব পাইপে মিক্সচার ভরতে ভরতে বলল, এমন কি হতে পারে না যে, চেকটা অ্যাকাউণ্টপেয়ী ছিল। যদি তাই হয়ে থাকে, তবে যার নামে চেক, সে অন্য ব্যাঙ্কে নিজের অ্যাকাউণ্টে এই চেকটা জমা দিয়ে টাকাটা আনিয়ে নিয়েছে। আপনি মহিলার হিসাব চেক করেছিলেন ?

চিত্ত বক্সী এবার একটু কাঁপড়ে পড়লেন। বললেন একটু ইতস্তত করে, তা অবশ্য করিনি। তবে মনে হয়—

তদন্তের ক্ষেত্রে মনে হওয়ার কোন অবকাশ নেই মিস্টার বক্সী। যা হোক, আমি গিয়ে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখছি।—বাসব পাইপ ধরাল।

বক্সী আর কিছু বললেন না।

ব্যাঙ্ক থেকে কাজ শেষ করে বেরোতে বেরোতে বারোটা বেজে গেল। সঙ্গী পুলিশ অফিসারটিকে ছেড়ে দিয়ে বাসব চৌরঙ্গীতে এসে পৌঁছল। ব্যাঙ্কে মোটামুটি মনের মত তথ্যই পাওয়া গেছে। এখান থেকে বাড়ির দূরত্ব অবশ্য বেশি নয়, তবু বাসব দক্ষিণ হাতের কাজ সেরে নিতে একটা অভিজাত রেস্তোরাঁতেই ঢুকল।

খাওয়া দাওয়ার পর পৌঁছল অনন্তর অফিসে। চৌধুরী সাহেব অফিসেই ছিলেন। সহর্ষ অভ্যর্থনা জানালেন। বাসব বলল, লাঞ্চের সময় এসে আপনাকে কিছুটা বিব্রত করলাম। সময় অবশ্য বেশি নেব না। আমি অমিতাভ দত্তর সঙ্গে কথা বলতে চাই। তাঁকে খবর পাঠালে ভাল হয়।

লাঞ্চে যাবার আমার কোন তাড়া নেই। আমি এখনই দত্তকে এখানে ডাকাচ্ছি।—চৌধুরী সাহেব বেল টিপলেন।

এখানে নয় আমি আপনাদের ওয়েটিং রুমে গিয়ে অপেক্ষা করছি। দত্তবাবুকে ওখানেই যেতে বলুন।—বাসব উঠে দাঁড়াল।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই অমিতাভ এসে উপস্থিত হল ওয়েটিং

রুমে। তাকে কিছুটা বিমর্ষ দেখাচ্ছে। ইতিমধ্যেই সে বাসব সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছে। তদন্তের ব্যাপারে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে না চাইলে ঝামেলার সৃষ্টি হতে পারে, তাও তার অজানা নয়।

বাসব বলল, আপনি নিশ্চয় জানেন, মালা মার্ডার কেস বেসরকারী ভাবে আমি তদন্ত করছি। পুলিশ আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। আপনার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চাই বলে, সে স্টেটমেণ্ট আমি দেখিনি। আশা করি, আমার প্রশ্নের উত্তরগুলো আপনি যথাযথ দেবেন।

অমিতাভ ক্লান্ত গলায় বলল, এই কেসটা সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। জানবার কথাও নয়। পুলিশ প্রশ্নের ধাক্কায় চোখে অন্ধকার দেখিয়ে দিয়েছিল। এখন আপনি এসেছেন। বলুন, কি জানতে চান?

মালা সোমের সঙ্গে আপনার—

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। একথা তো আমি পুলিশকেও বলেছি।

ভদ্রমহিলা কিন্তু বিবাহিতা ছিলেন।

তবু আমরা ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলাম। এইরকম ঘটনার তো অজস্র নজির আছে।

তা আছে যাক, ওকথা। পিকু বলে কাউকে চেনেন?

না।

কেণ্টু?

না। এরা কারা?

বাসব ভারি গলায় বলল, অমিতাভবাবু, আপনি মিথ্যা কথা বলছেন। এই দুই গুণ্ডাকে আপনি ভালভাবেই জানেন। অর্থের বিনিময়ে তাদের আপনি নিযুক্ত করেছিলেন বিশেষ একটা কাজের জন্যে।

আমি অপমান বোধ করছি। বললাম তো, কোন গুণ্ডাকে আমি চিনি না।

চেনেন। অনন্তবাবু লাইট হাউসের সামনে ওদের সঙ্গে আপনাকে কথা বলতে দেখেছেন। তাছাড়া গুণ্ডাদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

তারা বলেছে আমাকে সব কথা। কেন অকারণে মিথ্যার জাল বুনছেন। সত্যি কথা বলুন। তদন্তের সুবিধা হবে।

একটু থেমে অমিতাভ বলল, মালার সঙ্গে আমার মধুর সম্পর্ক ছিল। তাকে আমি কেন খুন করতে যাব?

কথা তো সেখানেই। কিন্তু পরিস্থিতি এমন যে আপনিই হলেন এক নম্বর সন্দেহভাজন। পুলিশ অন্তত তাই মনে করে। এখনো যে গ্রেপ্তার হননি, তা ভাগ্য বলে মনে করতে পারেন। তাই বলছিলাম, যদি সন্দেহমুক্ত হতে চান—যদি নিজেকে বাঁচাতে চান, তাহলে আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিন।

থমথমে মুখে অমিতাভ কয়েকবার নিজের চুলে আঙুল চালাল। তারপর বলল কাঁপা গলায়, আপনি বোঝার চেষ্টা করুন, মালা বেঁচে থাকলেই আমি সুখী হতাম। তাকে তো আমি নিজের করেই পেতে চেয়েছিলাম। গুণ্ডা দুটোকে নিয়োগ করেছিলাম ঠিকই—আমি জানতাম, কাজটা আইনসম্মত নয়। কিন্তু বিশ্বাস করুন, মালাকে খুন করার কোন পরিকল্পনা ছিল না।

পরিকল্পনাটা কি ছিল?

অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, আমরা দুজন আর অনন্তবাবুকে সহ্য করতে পারছিলাম না। তখন একটা পরিকল্পনা খাড়া করা হল। গুণ্ডারা অনন্তবাবুকে আতান্তরে ফেলবে। কিডন্যাপ করে নিয়ে যাবে মালাকে। পরের দিন ছেড়ে দেবে। গুণ্ডা-লাঞ্ছিত মালাকে অনন্তবাবু হয়তো স্ত্রীর মর্যাদা আর দিতে চাইবেন না। ডাইভোর্স হবে। সেরকম যদি তিনি না করেন, তবে মালাই এগোবে। গুণ্ডা ধরে নিয়ে গিয়েছিল বলে, স্বামী তার ওপর নিয়মিত অত্যাচার চালাচ্ছে। সে এরকম জীবন আর বয়ে বেড়াতে চায় না—ডাইভোর্স চায়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এক মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটে গেল।

হুঁ। পিকু আর কেলটু আপনি আবিষ্কার করলেন কিভাবে?

বলাই ঘোষ ওদের সন্ধান দিয়েছিল।

বলাই ঘোষ কে?

ক্লাইভ বিল্ডিংয়ের কোন অফিসের বেয়ারা-টেয়ারা হবে। কয়েক বছর আগে আমাদের পাড়ার দিকে থাকত। ওকে তখন থেকেই চিনতাম।

তাকে আপনি হঠাৎ বলে বসলেন, দুজন গুণ্ডা ফিট করে দিতে?

লোকটা বাঁকা লাইনে থাকে, আমি আগে থাকতেই জানতাম। একদিন দেখা হয়ে গেল ধর্মতলার মোড়ে। একথা সেকথার পর আমি বলেছিলাম, খুব ঝামেলায় পড়েছি। একটা লোক দিতে পার? ও বলল, দুটো লোক দিতে পারি। টাকা একটু বেশি নেবে। তবে যা বলবেন, সে কাজ ওরা করে দেবে।

এতক্ষণ পরে বাসব পাইপ ধরাল। বলল, বলাইয়ের সঙ্গে আবার আপনার দেখা হয়েছিল?

হ্যাঁ।

কবে?

অমিতাভ সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, ওদের সঙ্গে দেখা হবার পরের দিন। যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবার জন্য মজুরি বা কমিশন যাই বলুন—চাইতে এসেছিল। আমি ওকে একশো টাকা দিয়েছিলাম।

আর দেখা হয়নি।

না।

ঘনঘন কয়েকবার পাইপ টানার পর বাসব বলল, এদিকটা যা হোক মিটল। এবার ব্যাঙ্কের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা যাক। মিসেস সোম আপনাকে বিয়াল্লিশ হাজার টাকার একটা চেক দিয়েছিলেন?

না।

ওঁর চেকবুকের কাউণ্টার ফয়েলে কিন্তু আপনার নাম মেনসন রয়েছে।

চেকটা দেবার কথা ছিল। নিশ্চিত দিত। কিন্তু তার আগেই দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

উনি হঠাৎ এত টাকা আপনাকে দিতে চেয়েছিলেন কেন ?

আমাদের দুজনের ভবিষ্যতের জন্যে।

চেকটা আপনার কাছে নেই, নিশ্চিত তো ?

বিশ্বাস করুন, আমার কাছে নেই।

আগে কোন চেক তাঁর কাছ থেকে আপনি পেয়েছিলেন ?

না।

বাসব উঠে দাঁড়াল : আপাতত আর কোন প্রশ্ন নেই। ভবিষ্যতে আপনাকে আমার দরকার পড়তে পারে, আবার নাও পারে।

গলা নামিয়ে অমিতাভ বলল, পুলিশকে আমার ভীষণ ভয়। ওরা আমাকে অ্যারেস্ট করে না বসে। আমি কিন্তু এতক্ষণ যা বললাম, সত্যি কথাই বললাম। আপনি যদি ওদের একটু সামলান—

কথা দিতে পারছি না। তবে এটা ঠিক, আপনি সত্যি যদি দোষ না করে থাকেন, তবে আশঙ্কার কোন কারণ নেই।

বাসব আবার প্রভাকর চৌধুরীর অফিসে ফিরে এল। তিনি তখন একা নন, অনন্তও রয়েছে। দুজনের মধ্যে কথা হচ্ছিল। হয়তো অফিস সংক্রান্ত কোন প্রয়োজনীয় কথা।

বাসবকে দেখেই সচকিত চৌধুরী বললেন, অমিতাভর সঙ্গে কথা হয়ে গেল ?

হ্যাঁ। অনন্তবাবু রয়েছেন, ভালই হল। ওঁকে একটা প্রশ্ন করার ছিল।

বলুন ?

আপনার স্ত্রীর ফিজিসিয়ান কে ছিলেন ?

অনন্ত বলল, মালার আলাদা কোন ফিজিসিয়ান ছিল না। ডাক্তার মণিময় দস্তিদার আমাদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান।

ডাক্তার দস্তিদারের চেম্বার কোথায় ?

বিবেকানন্দ রোডে। নামকরা ফিজিসিয়ান। বিধান সরণীর মোড়ে পৌঁছবার পর, যে কেউ আপনাকে চেম্বার দেখিয়ে দেবে।

ধন্যবাদ। চলি এখন।

ক্রুদ্ধগলায় চৌধুরী বললেন, সে কি, কফি না খেয়ে যাবেন কিরকম ?

তাড়া আছে। আজ থাক।

কলকাতায় গরমকালে সন্ধ্যা একটু বিলম্বে হয়। তখন পৌনে সাতটা। শৈবাল দৈনিকের পাতা ওলটাচ্ছিল।

পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বাসব বলল, দিন পনেরো ছুটি তুমি পেতে পারো ?

বিস্মিত গলায় শৈবাল বলল, অনেক ছুটি পাওনা আছে। স্বচ্ছন্দে পেতে পারি ব্যাপারটা কি ?

কলকাতা আর ভাল লাগছে না। ভাবছি কিছুদিন পাহাড়ে গিয়ে বসে থাকি। মুসৌরী কেমন হবে ?

তার চেয়ে উটি ভাল। দক্ষিণ ভারতের দিকে তো আমরা যাই নি। কিন্তু কেসটার কি হবে ?

কেস তো সল্‌ভ হয়ে গেছে তাই তো যেতে চাইছি।

শৈবাল অবাক : সল্‌ভ করে ফেলেছো ?

হ্যাঁ।

পুলিশকে জানিয়েছো সব ?

এখনও জানাইনি। যিনি এই তদন্তে আমাকে নিয়োগ করেছেন, তাঁকে আগে জানানো দরকার। চৌধুরী সাহেবকে আসতে বলেছি। মনে হয় কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি এসে পড়বেন।

বাসব আর কিছু না বলে সেণ্টার টপের ওপর থেকে একটা পত্রিকা তুলে নিয়ে সোফায় আড় হয়ে বসল। শৈবালের বুঝতে বাকি নেই, ওর মুখ খোলানো এখন আর যাবে না

আধ ঘণ্টাটাক এরপর কেটেছে বোধহয়, কলিংবেলের মিষ্টি আওয়াজ ভেসে এল। তারপরই বাহাদুরের সঙ্গে সপ্রতিভ ভঙ্গিতে ঘরে প্রবেশ করলেন প্রভাকর চৌধুরী। বলতে বলতে [illegible] দেরী করে ফেলিনি বোধহয়।

ঠিক সময়েই এসেছেন।—মৃদু হেসে বাসব বলল, কিছু জরুরি কথা বলার ইচ্ছে আছে। অনন্তবাবু এখনই এসে পড়বেন। তারপর—

অনন্ত আসছে নাকি ?

হ্যাঁ, তাঁকেও ডেকেছি। আপনারা আমাকে তদন্তে নিযুক্ত করেছিলেন। জরুরি কথা অর্থে আপনাদের দুজনকে তদন্ত সম্পর্কে কিছু বলতে চাই।

তদন্তের ব্যাপারে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছেন মনে হচ্ছে ?

বরং বলতে পারেন শেষ করে ফেলেছি।

চৌধুরী সাহেব অবাক হয়ে গেলেন : আপনি বলতে চাইছেন—

হ্যাঁ। পুলিশকে কিছু বলার আগে প্রসঙ্গটা আপনাদের কাছে উত্থাপন করা আমি বেশি প্রয়োজনীয় মনে করছি।

এই সময় বাহাদুরের সঙ্গে অনন্তকে আসতে দেখা গেল।

প্রাথমিক কথাবার্তার পর পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বাসব বলল, এই কেসটার বৈশিষ্ট্য হল, অপরাধী ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়েছে। পরিকল্পনাটা সে বেশ ভেবে চিন্তে এমন ভাবে খাড়া করেছিল যে তাকে সন্দেহ করার কোন অবকাশই থাকবে না। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, যথা নিয়মে একটা ফাঁক থেকে গিয়েছিল। বলা বাহুল্য, আমি অভিজ্ঞতার জোরে সেই ফাঁকটা আবিষ্কার করতে পেরেছি। মনে রাখতে হবে, যে কোন বড় কাজ একটা বেসকে নির্ভর করে এগোবার প্রয়াস পায়। এই কেসের বেস হল, এক বিতর্কিত চরিত্র বলাই ঘোষ—সে কমিশনের বিনিময়ে গুণ্ডা দুটোকে আমদানী করেছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মালা সোমকে খুন করিয়ে কে লাভবান হল ? আপাতদৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে, স্ত্রীকে খুন করে অনন্তবাবুর কোন লাভ নেই। চৌধুরী সাহেব, আপনাকেও হিসাব থেকে বাদ দিতে হচ্ছে, বিকাশবাবুও বাদ পড়ে গেলেন। বাকি থাকছেন অমিতাভ দত্ত। গুণ্ডা দুটোকে বলাই ঘোষের সহযোগিতায় তিনিই আমদানী করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতে হয় মালা সোমকে মেরে অমিতাভ কোন লাভেরই মুখোমুখি

হচ্ছেন না। বরং মহিলাকে বাঁচিয়ে রাখলেই তাঁর স্বার্থসিদ্ধি হত বেশি। ইতিমধ্যে হত্যাকারী আরেকটা কাজ করেছে, বিকাশ সেনকে ফোনে জানিয়েছে, মিসেস সোম আর অমিতাভের অবৈধ সম্পর্কের কথা। এ আর কিছুই নয়, পারিস্থিতিকে জটিল করে তোলা।—বাসব থামল।

ঘরের বাকি তিনজন একাগ্র মনে তার কথা শুনে যাচ্ছিলেন।

আবার ও বলতে আরম্ভ করল, বিয়াল্লিশ হাজার টাকার চেকটা যদি অমিতাভ দত্ত ভাঙাতে পারতেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে একটা জোরালো মোটিভ পাওয়া যেত। আমি ব্যাঙ্কে খোঁজ নিয়ে দেখেছি, মহিলা ম্যানেজারকে গিয়ে বলেছিলেন, বিরাট অঙ্কের একটা চেক কেটেছেন, তাকে যেন কোন রকম অস্বস্তির মধ্যে না ফেলে ক্যাশ করে দেওয়া হয়। কিন্তু কেন জানা যায়নি, শেষ পর্যন্ত মালা সোম চেকটা অমিতাভকে দেননি। কাজেই টাকাটা আর ক্যাশ হয়নি। তাঁর অ্যাকাউন্টেই রয়ে গেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই মর্মন্তুদ হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত মোটিভ কি? মোটিভ বুঝতে গেলে, মালা সোমের মনস্তত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করতে হবে। আমি বিকাশবাবুর স্ত্রীর মুখ থেকে জেনেছি, তিনি মা হবার জন্যে বিশেষ ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন। প্রথমে একজন বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটল। তাতে ফল না পাওয়ায় তিনি অমিতাভকে প্রশ্রয় দিলেন। এতে উপকৃত হয়েছিলেন। কারণ আমরা জেনেছি পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট বলছে, মৃত্যুর সময় তিনি প্রেগনেন্সির স্টার্টিং পয়েন্টে ছিলেন।

অনন্ত তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল, এ সমস্ত কি বলছেন? পরপুরুষের সহযোগিতায় মালা মা হতে চাইবে কেন?

তাই তিনি চেয়েছিলেন মিস্টার সোম। এছাড়া তাঁর সামনে আর কোন উপায় ছিল না। কারণ—কারণ তিনি আপনার অসামর্থের কথা জানতে পেরেছিলেন।

প্রত্যেক ব্যাপারের একটা সীমা আছে। আপনি [illegible]

আমি আপনাদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান মণিময় [illegible]

সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তাঁর মুখ থেকে শুনলাম, আপনার অক্ষমতাকে কাটিয়ে তোলার জন্যে তিনিই ওপেক্স খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। মিসেস সোমও যে একথা জানতে পেরেছিলেন, তার প্রমাণ হল, তাঁর আলমারি থেকে একটা ওপেক্সের শিশি পাওয়া গেছে। মিস্টার চৌধুরী—

প্রভাকর চৌধুরীর যেন চটকা ভাঙল : বলুন ?

আপনি এবার নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, অনন্তবাবুই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে নিজের স্ত্রীকে খুন করেছেন ?

অনন্ত প্রায় চিৎকার করে উঠল, আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল ? কি সমস্ত পাগলের মত বলছেন ?

মাথা আমার ঠিকই আছে। দেরিতে হলেও, আপনি স্ত্রীর কাণ্ডকারখানা শেষ পর্যন্ত জানতে পারলেন। আপনার মনে আগুন ধরে উঠল। এ সমস্ত ক্ষেত্রে অক্ষম পুরুষরা যে সিদ্ধান্ত নেয়, আপনিও তাই নিলেন। লাইট হাউসের সামনে গুণ্ডা ছুটোকে আপনি দেখেছিলেন বলাই ঘোষের সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ করেছিলেন জানি না। তার সাহায্যে গুণ্ডাদের এমনভাবে খবর পাঠালেন, যাতে ওরা মনে করল, টাকা পাঠিয়ে দিয়ে কাজে নামবার নির্দেশ দিচ্ছে অমিতাভ

আপনার কথাই শেষ কথা নয়। আমি আমার স্ত্রীকে খুন করেছি প্রমাণ করতে পারবেন ?

প্রমাণ সংগ্রহ করার দায়িত্ব পুলিশের। মনে হয়, তারা বলাই ঘোষকে খুঁজে বার করতে পারবে। মিস্টার চৌধুরী, আমার কাজ শেষ হয়েছে। আশা করি, আপনি পেমেণ্টের ব্যাপারে রেডি আছেন তার আগে অবশ্য লালবাজারে ফোন করে দিই। ওঁরা এখানে এসে পড়ুন।

বাসব উঠে দাঁড়াল। তারপর এগিয়ে গেল ফোনস্ট্যাণ্ডের দিকে

দুই

কেতু বর্মা রিস্টওয়াচের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে তখন ইস্টকোস্ট এক্সপ্রেস সবেমাত্র হাওড়া স্টেশনের এগারো নম্বর প্ল্যাটফর্মে থেমেছে। সুদীর্ঘ যাত্রা শেষ করতে এই যন্ত্রযানের সময় লেগেছে পঁয়ত্রিশ মিনিট বেশি।

মধ্যবয়স্ক কেতু বর্মা বলশালী ব্যক্তি। কুলি ডাকাটা তিনি পছন্দ করলেন না। নিজের কাজ নিজ হাতে করার মধ্যে যে একটা আনন্দ আছে, তা তিনি স্বীকার করেন। ত্রিশ ইঞ্চি লম্বা সুটকেশটা অবহেলায় হাতে তুলে নিয়ে কামরা থেকে নামলেন। অন্য হাতে বড় সাইজের ব্রিফকেস

একটা কুলি ছুটে এসেছিল। হাতের ইশারায় তাকে বাতিল করে দিয়ে, ভিড়ের মধ্যে পথ করে এগিয়ে চললেন কেতু বর্মা। গেট পেরিয়ে বাইরে আসতে প্রায় দশ মিনিট সময় লেগে গেল। ভিড়ের চাপে ত্রাহি ত্রাহি করা এই জনপদ সত্যিই অস্বস্তিকর। তবু এখানে না এসে উপায় নেই কেতু বর্মার। কাজ কারবারের চাবিকাঠি যে এখানেই।

বুকস্টলের পাশ দিয়ে এগিয়ে চললেন। একবার মনে হল ক্যান্টিনে ঢুকে এক কাপ কফি খেয়ে নিলে মন্দ হয় না। ইচ্ছেটা অবশ্য দমন করতেই হল। কারণ ফোনে একজনের সঙ্গে কথা বলে নেওয়া এখন সবচেয়ে জরুরি ব্যাপার।

আরো একটু এগিয়ে যাওয়ার পর সারি সারি ফোনবুথ দেখতে পাওয়া গেল। একটার মধ্যে ঢুকে পাল্লা টেনে দিলেন কেতু। ভ্রূ কুঁচকে মনের মধ্যে ফোন নম্বরটা ঝালিয়ে নিলেন। তারপর রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করলেন। ওপাশ থেকে সাড়া পাওয়ার পর পয়সা ফেললেন বাক্সে।

হ্যালো···বাসুদেব নাকি—

ওপাশ থেকে উত্তর এল, কথা বলছি—আপনি—

বর্মা—

তোমার তো সোমবার দিন আসবার কথা ছিল—বিশেষ কোন ব্যাপার ঘটল নাকি?

বিশেষই বলতে পারো। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আমাদের যে মিটিংটা হবার কথা ছিল, ওটা বাতিল করে দাও—আজই রাত ন'টায় আমি তোমাদের সঙ্গে বসতে চাই·—

আজই—ব্যাপারটা কি—

কেতু বর্মার গলা ভারি হয়ে উঠল, ফোনে সব কথা বলা যায় না। এখন আমি হাওড়া স্টেশন থেকে কথা বলছি। এবার তোমার ফ্ল্যাটে কিন্তু আমি উঠছি না—

কেন—আমার অপরাধ—

একটু একা থাকতে চাইছি—জটিল এক পরিকল্পনা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। ওই কথাই রইল তাহলে···রাজেনকে মিটিংয়ের সময় নিশ্চয় করে জানিয়ে দিও।

নিশ্চয় জানিয়ে দেব। কিন্তু আসল কথাটাই তো বললে না—তুমি এবার আস্তানা গাড়ছ কোথায়?

পার্ক ভিউ হোটেলে।

কেতু বর্মা রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

পার্ক ভিউ হোটেল কিন্তু পার্ক স্ট্রীটে নয়। ক্যামাক স্ট্রীটের পরিচ্ছন্ন পরিবেশে এই হোটেলের অবস্থান। আধুনিক কেতায় তৈরি ছ'তলা বাড়ি। অবস্থানকারীরা এক বাক্যে স্বীকার করেন, এখানকার সার্ভিস এবং অন্যান্য ব্যবস্থা প্রথম শ্রেণীর।

কেতু বর্মার অধিকারে এখন একশো দশ নম্বর ঘর।

জানলার কাছ থেকে সরে এসে উনি সোফায় বসলেন। ড্রেসিং গাউনের পকেট থেকে ফোর স্কোয়ারের প্যাকেট বার করে রাখলেন

সেণ্টার টপের ওপর। অন্যমনস্ক ভাবে তাকালেন রিস্টওয়াচের দিকে। পৌনে ন'টা। রাজেন আর বাসুদেবের আসবার সময় হয়ে এসেছে।

ডানহিলের সাহায্যে কেতু সিগারেট ধরালেন। আগামী ব্যবসার সাফল্য সম্পর্কে অবিরাম চিন্তা-ভাবনার পর যে সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হয়েছেন, তাতে হতাশ হবার কিছু নেই। তবে প্রতিটি পদক্ষেপই মেপে মেপে ফেলতে হবে। একটু এধার ওধার হলেই বিপদের আর সীমা থাকবে না। অবশ্য এ ব্যাপারে পার্টনার দুজনকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করাতে হবে। নইলে পুরো পরিকল্পনাটাই বাতিল করে দিতে হবে।

দরজায় মৃদু করাঘাত হল।

খোলা আছে। চলে এস।

বাসুদেব সোম আর রাজেন হাজরা ঘরে প্রবেশ করল।

কেতু বর্মা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদের খবর ভাল তো? আসল আলোচনায় আসবার আগে কিছু খেয়ে নেওয়া যেতে পারে। রুম সার্ভিসকে কি পাঠাতে বলব বল?

বাসুদেব বললে, কিছুক্ষণ আগেই আমরা খেলাম। তুমি ইচ্ছে করলে বরং—

না। আমার তেমন তাগিদ নেই। তাহলে এবার মূল কথায় আসা যাক। তোমরা নিশ্চয় গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছ?

তা করছি বৈকি।—রাজেন বলল, নির্দিষ্ট দিনের কয়েকদিন আগেই চলে এসেছ। এরকম বড় একটা হয় না। তারপর—

সমস্ত কিছুই কেমন রহস্যময়—, মুখে হাসি টেনে কেতু বর্মা বললেন, তা বলতে পারো। রহস্যটা এখনই আমি ফাঁস করব। তার আগে জানতে চাই, কোন পরিচিত লোক তোমাদের হোটেলে ঢুকতে দেখেনি তো। ত্রিমূর্তি এখানে জড়ো হয়েছি, একথা কেউ জেনে ফেলুক, আমি চাই না।

বাসুদেব বলল, তুমি কি রাহুল সেনকে মিন করছ?

ঠিক তাই। আমাদের কাজে বাগড়া দেবার জন্যেই যেন তার জন্ম।

বাসুদেব আক্ষেপের সুরে আবার বলল, গতবার তো মুখের গ্রাস প্রায় ছিনিয়ে নিল। মিরানীকে আমরা প্রায় খেলিয়ে তুলেছিলাম। শেষ সময় রাহুল সেন লোকটাকে সতর্ক করে দিল। মাঝ থেকে—পাঁচ লাখ টাকা আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেল।

কথাটা বলেই হাসলেন কেতু বর্মা।

লোকটার বাহাদুরি আছে স্বীকার করতেই হবে। যা হোক, রাহুলকে নিয়ে আলোচনা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। এবার আর আমাদের ব্যাপারে নাক গলানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজের কথায় এবার আসা যাক।

কাজের কথায় আসার আগে তিন শ্রীমানের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়ে রাখার বোধহয় অন্যায় হবে না। আগরতলার কাছাকাছি এক গ্রামে কেতু বর্মা জন্মেছিলেন প্রায় একান্ন বছর আগে। তখন অবশ্য তিনি কার্তিক বর্মণ হিসাবেই চিহ্নিত ছিলেন। পড়তির দিকে হলেও বর্মণ পরিবারের খ্যাতি তখনও ছিল ওই অঞ্চলে। কার্তিক আর দশটা সাধারণ মেধার ছেলের মতই স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করলেন। তারপর ভাগ্যের জোরে কাজও পেয়ে গেলেন এক ব্যাঙ্কে।

তাঁর প্রতিভার প্রকৃত বিকাশ ঘটল ওখানেই। তৎপরতার সঙ্গে একদিন হাজার দশেক টাকা সরিয়ে ফেললেন। কাজটা বেশ নিখুঁত হয়েছে ভেবে নিয়ে যখন নিশ্চিন্ত, পুলিশ তখনই তাঁকে অ্যারেস্ট করে বসল। তাঁর চোখ থেকে পিছলে যাওয়া একাধিক সূত্র, বলা বাহুল্য পুলিশের হাতে। চাকরি তো গেলই, জেল হল দু' বছর।

জেল থেকে বেরিয়ে কার্তিক বর্মণ বুঝলেন, পৃথিবীটা আর আগের মত নেই। কাজেই পরিচিত গণ্ডীর বাইরে তাঁকে পা বাড়াতে হল। করিৎকর্মা লোক। কলকাতা পৌঁছেই সুযোগ করে নিলেন। তারপর বম্বে। রিস্কের কথা মনে না রাখলে, স্মাগলিংয়ের কারবারই যে অতি মাত্রায় লাভজনক, একথা পাঁচ বছরের বাচ্চাও বোঝে। তিনি তো আরো ভালভাবে বুঝলেন। এ ব্যাপারে তাঁকে বিশেষ ভাবে সাহায্য

করল, অভিজাতদর্শন চেহারা, মন মাতানো স্বাস্থ্য আর বাক্‌পটুতা। ইতিমধ্যে নিজের নামেরও কিছু কাটছাঁট করেছেন, কার্তিক বর্মণ থেকে হয়েছেন কেতু বর্মা।

দশটা বছর কেটে গেছে তারপর। কেতু বর্মা রোজগার করেছেন প্রচুর, খরচও করেছেন মাত্রা বজায় না রেখে। বিয়ে করেননি। ইচ্ছে করেই যেতে চাননি দায়দায়িত্বের মধ্যে। অবশ্য ধারাবাহিক ভাবে নারীসঙ্গ তিনি পেয়ে এসেছেন। ইদানিং কাজ কারবারের ব্যাপারে কিছুটা ক্লান্তি এসে গিয়েছিল। আরব আমীর শাহী, দুবাই, আবুধোবি—আরব সাগরের উপকূলবর্তী এই সমস্ত দেশের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক রাখাটা ক্রমেই ঝামেলাজনক হয়ে উঠছে। পুলিশ এখনও তাঁকে চিহ্নিত করতে পারেনি। তাই বলে কখনও পারবে না, তার নিশ্চয় কোন মানে নেই।

এই রকম মনের অবস্থায় দোল খেতে খেতেই কেতু বর্মা জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রবেশ করলেন। মেল নাগপুর পার হবার পর উনি ডাইনিং কারে গিয়ে ঢুকলেন। সামান্য কিছু খেয়ে নেবার তাগিদ অনুভব করছিলেন।

ওখানেই আলাপ হয়ে গেল দুজনের সঙ্গে। রতনে রতন চেনে। বাসুদেব সোম আর রাজেন হাজরা অচিরেই কেতু বর্মার সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে ফেলল। এই ধরনের দুজন সহকারীর যেন প্রয়োজন ছিল বর্মার। হাজরা আর সোম বছর পনেরো লাইনে আছে। নানা অসুবিধা এবং সাহসের অভাবেই এতদিন বড় জায়গায় ঘাই মারতে পারেনি। ছিনতাই বা ওই ধরনের কাজ কারবারের মধ্যে দিয়েই নিজেদের সচল রেখেছিল।

এদের দুজনকে পেয়ে কেতু খুশি হলেন। স্মাগলিংয়ের কারবার থেকে সরে এসে কি করা যায়, তাই স্থির করার জন্যই উনি কলকাতা যাচ্ছিলেন। পথে এদের পেয়ে যেতেই বুঝলেন, আগামী দিনগুলি অনায়াস সাফল্যের মুখে।

এর পরের তিন বছর সত্যি ভাল কাটল।

কেতু বর্মা পরিকল্পনা খাড়া করেন বেশ ভেবেচিন্তেই। বাসুদেব আর রাজেনকে বুঝিয়ে দেন তাদের করণীয়গুলি। দুজনে কাজে নেমে পড়ে। তারপর আসে সাফল্য। অর্থাৎ গোছা গোছা টাকা।

ধারাবাহিক সাফল্য যখন আত্মপ্রত্যয়ে রূপান্তরিত হতে চলেছে, তখনই ঘা খেলেন কেতু বর্মা। বড় একটা পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল। বলতে গেলে ছ' লক্ষ টাকা হাতে আসতে আসতে ফসকে গেল। এর জন্য দায়ী বিচিত্র এক মানুষ।

সেই দিনই কেতু ফোন পেয়েছিলেন—

হ্যালো···বর্মা সাহেব—

হ্যাঁ। আপনি—

রাহুল সেন···মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য দুঃখিত—

ননসেন্স···কে আপনি ?

বললাম তো—রাহুল সেন। ব্যবসাপত্র গুটিয়ে ফেলুন—কলকাতায় আর সুবিধা করতে পারবেন না···এখানে আমি আছি—

আর কিছু শুনতে চাননি, সজোরে রিসিভার নামিয়ে রেখেছিলেন কেতু বর্মা। কিন্তু রাহুল সেনের দম্ভ যে অসার ছিল না, তা অচিরেই প্রমাণিত হল।

পর পর তিনবার ব্যর্থ হলেন বর্মা। বলা বাহুল্য, প্রতিবারই এর জন্য দায়ী রাহুল সেন। হয় সে টাকাটা পকেটস্থ করেছে, নয়তো সতর্ক করে দিয়েছে পার্টিকে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও কেতু বর্মা হদিস করে উঠতে পারেননি, লোকটা কে? কিভাবে তাঁর কাজ-কারবারের অন্ধিসন্ধি বুঝে ফেলছে।

হতাশায় ভুগতে আরম্ভ করলেন কেতু বর্মা। শেষে রাজ্যের বিরক্তি আছড়ে পড়ল কলকাতা শহরটার ওপরই। খোলা মনে ব্যবসা করার জায়গা এটা নয়—এই মহানগরীকে তালাক দিতে হবে তাকে। সহকারী দুজনকে বললেন মনের কথা।

স্বাভাবিক কারণেই তারা কাতর হয়ে পড়ল। এরকম দুজন কর্মঠ সহকারীকে ভাসিয়ে দিয়ে চলে যেতে মনের মধ্যে যে একটা অস্বস্তি

বোধ করছিলেন না, তা নয়। কিন্তু উপায় কি? অবশ্য বললেন শেষে, হতাশ হবার মত কিছু নয়। তেমন কোন বড় কাজ পেলে আসবেন কলকাতায়। কিংবা প্রয়োজন হলে জুজনকে ডেকে পাঠাবেন বম্বেতে।

কেতু চলে গেলেন।

কিন্তু বম্বেতে গিয়েও আগেকার অবস্থায় নিজেকে ফেলতে পারলেন না। অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অনেক নতুন লোক বসে আছে আরব সাগরের দিকে হাত বাড়িয়ে। তাদের সকলের কাছেই কেতু অচেনা। যা হোক, কাজে নামলেন।

দুটো বছর চালিয়ে গেলেন কোন রকমে।

হঠাৎই সেদিন সংবাদটা চোখে পড়ে গেল। দৈনিক পত্র নিয়মিত পড়েন না। দাদার স্টেশনে দাঁড়িয়েছিলেন ট্রেনের অপেক্ষায়। একসময় চোখ পড়ল এক ভদ্রলোকের ওপর। নিশ্চয় বাঙালী। বেঞ্চে বসে বাংলা দৈনিক পড়ছিলেন। কেতু পায়ে পায়ে এগোলেন। বসলেন গিয়ে পাশে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নজর পড়ল সংবাদটার ওপর। আকর্ষণীয় হেডিং। সংবাদটা পড়ার জন্যে তাঁকে ব্যগ্র করে তুলল। কিন্তু পড়া গেল না। ভদ্রলোক কাগজ মুড়ে কোলের ওপর রাখলেন। তারপর সিগারেট ধরিয়ে টেনে যেতে লাগলেন নির্বিকার মুখে।

অগত্যা বললেন, কাগজটা একবার দেখতে পারি?

ভদ্রলোক ঘাড় বেঁকিয়ে তাকালেন: দেখুন।

দৈনিক পত্র হাতে নিয়ে কেতু বর্মা বিভিন্ন স্তম্ভে দৃষ্টি বুলিয়ে চললেন। ভদ্রলোককে বুঝতে দিতে চান না বিশেষ এক সংবাদ সম্পর্কে তিনি আগ্রহশীল।

এই সময় কল্যাণগামী এক লোক্যাল এসে থামল। জনাকীর্ণ হয়ে উঠল প্ল্যাটফর্ম। ভদ্রলোক দ্রুত উঠে পড়লেন।

ভিড়ের মধ্যে তিনি মিশে যাবার আগেই কেতু বললেন, শুনছেন, আপনার কাগজটা—

থাক। পড়া হয়ে গেছে।

কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়েই তিনি হারিয়ে গেলেন। কেতু বর্মার আর ভিটি যাওয়া হল না। দৈনিক পত্রটা হাতের মুঠোয় চেপে ফিরে এলেন বাসায়। সেই বিশেষ সংবাদ বেশ কয়েক ঘণ্টা তাঁকে চিন্তিত করে রাখল। তারপর পরিকল্পনা ছকে ফেললেন।

লাভজনক এক কাজ হাতে নিয়ে অমুক তারিখে কলকাতা পৌঁছবেন, এই সংবাদ পাঠালেন দুই সাগরেদকে। বলা বাহুল্য, রাহুল সেনের চোখ ও কান বাঁচিয়ে সাক্ষাত-পর্ব কিভাবে হবে, সেকথা জানাতেও ভুললেন না।

কেতু বর্মা নড়েচড়ে বসলেন। বললেন আবার, যা বলছিলাম তোমাদের। যে কাজটা আমরা হাতে নিতে চলেছি, সাফল্যের সঙ্গে করে উঠতে পারলে, আমাদের চিন্তা-ভাবনা বলে কিছু থাকবে না।

বাসুদেব দ্রুত গলায় বলল, আসল কথাটা তো ভাঙছেন না?

অধৈর্য হও না। সবই বলব। আগে এই সংবাদটা পড়ে নাও।

কেতু বর্মা দৈনিক পত্রর একটা কাটিং এগিয়ে দিলেন।

বাসুদেব আর রাজেন ঝুঁকে পড়ল কাটিংটার ওপর।

রাজকীয় নীলাম

"নয়াদিল্লী, ২৬শে অক্টোবর। উচ্চ আদালত আজ ছত্রিশগড় এস্টেটের চল্লিশটি জহরত নীলাম করার আদেশ দিয়েছেন। সর্বনিম্ন দর ধার্য হয়েছে দশ কোটি টাকা। আগামী ২০শে নভেম্বর সুপ্রীম কোর্টের চত্বরে নীলাম পরিচালিত হবে। ইচ্ছুক ক্রেতারা আগামী ১০ই নভেম্বর কলিকাতাস্থিত ছত্রিশগড় প্যালেসে জহরতগুলি দেখার সুযোগ পাবেন। নীলাম পরিচালনা করবেন জুয়েলারী ট্রাস্টের চেয়ারম্যান শ্রী পি. কে. চাওলা। তাঁকে সাহায্য করবার জন্য উপস্থিত থাকবেন বিচার বিভাগের একজন পদস্থ আমলা। বর্তমানে জহরতগুলি প্যালেসের এক বিশেষ ধরনের ভল্টে রাখা রয়েছে।

গত বছর জুন মাসে এই জহরতগুলি বিক্রির ব্যাপারে যে আইনগত বাধা দেখা দিয়েছিল, তা এখন দূর হয়েছে। বর্তমানে

সম্ভাব্য ক্রেতারা হলেন, মার্কিনবাসী ডিগ ক্যালওয়ে, সৌদি আরবের রসিদ আমন আল পাশা এবং ভারতের ইন্দ্রপ্রতাপ জেঠানী। এঁরা প্রত্যেকেই আগাম দশ কোটি করে টাকা জমা দিয়েছেন। ওই অঙ্কের টাকা যাঁরা সরকারের কাছে জমা করবেন, শুধুমাত্র তাঁরাই নীলামের আগে অর্থাৎ ১০ই নভেম্বর জহরতগুলি দেখার সুযোগ পেতে পারেন।"

কি বুঝলে ?

দুই সাগরেদ গুরুর দিকে বোকার মত চেয়ে রইল।

কেতু বর্মা আবার বললেন, কোটি কোটি টাকার ব্যাপার। স্যাকরার ঠুকঠাক তো অনেক হল, এবার কামারের এক ঘা দিয়েই অপরাধ জগৎ থেকে আমরা চিরকালের মত বিদায় নেব।

বাসুদেব বলল, কিন্তু আমরা এর মধ্যে আসছি কিভাবে ?

ঠিকই আসছি। তবে ঢাকঢোল বাজিয়ে নয়। বুঝতে পারছ না .কন, ওই চল্লিশটা হীরা পকেটস্থ করার পরিকল্পনা এখন আমার হাতে।

সত্যি, বুঝতে পারছি না তোমার কথা। রাজেন বলল, কড়া সিকিউরিটির মধ্যে রয়েছে ওগুলো। পকেটস্থ করা দূরের কথা আমরা হীরেগুলোর ধারে কাছেও পৌঁছতে পারব না।

কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণু ভাবে কেতু বর্মা বললেন, তোমরা কি মনে কর, একটা রূপকথা শোনাবার জন্য আমি বম্বে থেকে ছুটে এসেছি ? এতদিনেও আমাকে চিনতে পারলে না ? হীরেগুলোর কাছে পৌঁছবার চাবিকাঠি হাতে নিয়েই কলকাতায় এসেছি।

তবুও বাসুদেব ও রাজেন কোন ভরসা পেল না। কোন সোনার দোকান লুঠ করার ব্যাপার হলে না হয় কথা ছিল। এ তো অনেক অনেক গুণ কঠিন। কি ধরনের চাবিকাঠি গুরু সঙ্গে এনেছেন, তা জানবার জন্য দ্বিধাজড়িত ঔৎসুক্য নিয়ে দুজনে অপেক্ষা করতে লাগল।

সাগরেদদের মনের ভাব কেতু বর্মা সহজেই বুঝলেন। বললেন মৃদু হেসে, তোমরা আমার ওপর আস্থা রাখতে পারছ না। অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। তোমাদের জায়গায় আমি থাকলে আমার মনেও অবিশ্বাস জাগত। যা হোক, আসল কথাটা এবার বলি।

ইন্দ্রপ্রতাপ জেঠানী আমাদের পৃষ্ঠপোষকতা করবেন।

তুমি বলতে চাইছ—

বিস্মিত বাসুদেব কথাটা শেষ করতে পারল না।

ঠিকই আন্দাজ করেছ। একমাত্র যে ভারতীয় ভদ্রলোক নীলামে ডাক দেবার জন্য টাকা দিয়েছেন, তাঁর কথাই বলছি। জেঠানীকে বম্বেতে সবাই জানে। বৈধ ও অবৈধ ভাবে টাকা রোজগারের নানা পন্থা তাঁর জানা আছে। ভাগ্যক্রমে তাঁর সেক্রেটারি অমৃত চৌহানের সঙ্গে আমার চেনাজানা ছিল। বার-কয়েক দেখা করলাম তাঁর সঙ্গে। পরিকল্পনাটা শুনিয়ে দিলাম তাক বুঝে।

কেতু বর্মা একটু থেমে সিগারেট ধরালেন। এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ার পর বললেন, এক সপ্তাহ পরে জেঠানী ডেকে পাঠালেন আমাকে। খোলাখুলি কথা হল। শেষে আমার পরিকল্পনা উনি অনুমোদন করলেন।

রাজেন বলল, কাজটা হবে কিভাবে?

সে কথায় পরে আসছি। আগে শোন, জেঠানীর সঙ্গে কি রফা হল। কাজটা সাফল্যের সঙ্গে উতরে গেলে, উনি আমাদের পাঁচ কোটি টাকা দেবেন। পাথরগুলোর দাম অবশ্য অনেক অনেক বেশি। তবে আমরা বেচতে পারব না। ঝামেলা প্রচুর। জেঠানীর অনেক সুবিধা। উনি সহজেই মাল বিদেশে নিয়ে গিয়ে চড়া দামে বেচতে পারবেন।

এই সময় টেলিফোনের ঝনঝনানি শোনা গেল।

কিছুটা বিরক্ত হয়েই রিসিভার তুলে নিলেন কেতু। হ্যালো—

বর্মার সঙ্গে কথা বলতে চাই—

কথা বলছি—

আমি রাহুল সেন—

বুকের মধ্যে রক্ত ছলাৎ করে উঠল। শয়তানদের সঙ্গে এই লোকটার কি কোন সম্পর্ক আছে? এত সতর্কতার পরও কিভাবে তার কলকাতায় অবস্থানের কথা ওর জানা হয়ে গেল? আর কিছু

শোনার প্রতীক্ষায় না থেকে কেতু বর্মা ভারি বিমর্ষভাবে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

দুই সাগরেদের চোখে ঔৎসুক্য।

কেতু বর্মা তেতো মুখে বললেন, শনি আবার আমাদের পিছু নিয়েছে।

ওদিকে—

অ্যাসট্রেতে দেশলাইয়ের কাঠিটা ফেলে দিয়ে, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কাউন্টারের ওধারে রাহুল তাকাল। পার্ক ভিউ হোটেলের লাউঞ্জে এখন সে দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই টেলিফোন। রিসিভার নামিয়ে রেখেই সিগারেট ধরিয়েছিল। কেতু বর্মা যে কনেকসন কেটে দেবেন, এ তো জানা কথা।

রাহুলের বয়স এখন পঁয়ত্রিশ ছাড়িয়ে যায়নি। উচ্চতা ও স্বাস্থ্য, দুই মানানসই। খুঁটিয়ে বিচার না করলে স্বীকার করতেই হয়, সে একজন প্রিয়দর্শন পুরুষ। কথাবার্তায় ভারি পটু। পরিচিতরা সকলেই একরকম স্থির নিশ্চিন্ত, এমন বেপরোয়া যে, একদিন না একদিন সে গুরুতর কোন বিপদে পড়বেই।

কাউন্টারের ওধারে দিলীপ চৌধুরী দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সিগারেটের ছাই ঝেড়ে নিয়ে রাহুল বলল, লোকটাকে দারুণ ভয় পাইয়ে দিয়েছি।

তা নাহয় দিয়েছ—, কাউন্টারের দিকে একটু হেলে দাঁড়িয়ে দিলীপ চৌধুরী বলল, কিন্তু লোকটার পেছনে এমন আদা-জল খেয়ে লেগেছ কেন বল তো?

আদা-জল খেয়েই তো লাগতে চাই। কিন্তু সে সুযোগ পাচ্ছি কই? আমার ভয়ে কিনা জানি না, লোকটা বম্বেতে গিয়ে ঠেকেছে। বুঝলে চৌধুরী, যেমন তেমন করে হোক, ওকে একদিন না একদিন চরম দুর্দশার মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলব।

আমার প্রশ্ন তো ওখানেই। কেন তুমি লোকটার দুর্দশার কারণ

হবে ? গুরুতর কোন ক্ষতি করেছে নাকি ?

জোর কয়েক টানেই সিগারেটটা ছোট করে এনেছিল রাহুল। অ্যাসট্রেতে টুকরোটা গুঁজে দিয়ে বলল, আছে বৈকি। নইলে ওই লোকটার জন্যে অকারণে আমি পরিশ্রান্তই বা হব কেন ? বলব তোমাকে সব। তবে এখন নয়। পরে।

দিলীপ বলল, ধৈর্য অবশ্য আমার কম। তবুও সাগ্রহে আসল কথাটা শোনার অপেক্ষায় থাকলাম।

ভাল কথা, এই লোকদুটো ছাড়া আর কেউ এসেছিল, কেতু বর্মার কাছে ?

আর কেউ আসেনি।

ফোন-টোন—

তা তো বলতে পারব না ভাই।

তোমাদের অপারেটারের কাছে রেকর্ড থাকে নিশ্চয়। ওকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখ না।

দিলীপ রিসিভার তুলে নিল। হোটেলের অপারেটারের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে চাইল, একশো দশ নম্বর ঘরের কেতু বর্মার সঙ্গে কেউ সন্ধ্যা আটটার আগে ফোনে কথা বলেছে কিনা ?

অপারেটার রেজিস্ট্রার দেখে জানাল, ফোন এসেছিল একটাই। তখন চারটে পঁচিশ, জেঠানী নামে একজন মিঃ বর্মার সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

জেঠানী কি জানিয়েছিলেন, কোথা থেকে কথা বলছেন ?

হ্যাঁ। কোহিনুর বিল্ডিং থেকে।

সমস্ত শুনে রাহুল বলল, কোহিনুর বিল্ডিংটা কোথায় ?

নামটা শোনা শোনা। পার্ক স্ট্রীট বা তার কাছাকাছি কোথাও হবে। ঠিক বলতে পারছি না।

চিন্তিত গলায় রাহুল বলল, আমার মনে হয় অন্য কোথাও। নামওয়ালা পার্ক স্ট্রীটের প্রত্যেকটা বাড়ি আমি চিনি। যা হোক, খুঁজে আমি বার করবই। একটু দৌড়ঝাঁপ করতে হবে এই যা।

কেতু বর্মাকে ছেড়ে কোহিনুর বিল্ডিং নিয়ে পড়লে কেন বল তো?

বর্মা কি ধরনের দাও মারার তালে আছে, বুঝতে গেলে সমস্ত রকম আসপেক্ট খতিয়ে দেখতে হবে। জেঠানী লোকটা কে? পদবী শুনে তো মনে হচ্ছে সিন্ধী। হয়তো বড়লোক। হয়তো—

চৌধুরী হেসে উঠল।

তোমার মাথায় যে কি ঘুরছে, ভগবান জানেন। আমি অবশ্য অপেক্ষা করে রইলাম সমস্ত ব্যাপারটা শোনবার জন্যে।

তাই থাক। আমি এখন চলি।

রাহুল হোটেল থেকে বেরিয়ে এল। ট্রাফিক এড়িয়ে রাস্তার অপর পারে পৌঁছতে কয়েক মিনিট সময় লেগে গেল। পেলগ্রিন রঙের ফিয়েট পার্ক করা ছিল গাছতলায়। ড্রাইভিং সীটে বসে একজন সিগারেট টানছিল। রাহুল তার পাশে বসতে বসতে প্রশ্ন করল, বিকাশ, কোহিনুর বিল্ডিংটা কোথায়, তুমি জান?

চটপটে চেহারার বিকাশের বয়স ত্রিশের ওপরই হবে। বলল এই নামে একটা বাড়ি থিয়েটার রোডে আছে। ওধারে গেলেই চোখে পড়বে, নিয়ন সাইন দিয়ে লেখা। আপনি কি ওই বাড়িটার কথা জানতে চাইছেন?

জোর দিয়ে বলতে পারছি না। চল, একবার দেখে আসি।

বিকাশ ফিয়েটে স্টার্ট নিল।

থিয়েটার রোডের মাঝ বরাবর যাবার পর অভিজাতদর্শন ছ'তলা বাড়িটার দেখা পাওয়া গেল। নীল রঙের নিয়ন সাইন দিয়ে লেখা কোহিনুর বিল্ডিং।

ফুটপাথের গা ঘেঁষে গাড়ি পার্ক করে দুজনে নেমে পড়ল। তিন থাক সিঁড়ি পেরিয়ে একফালি বারান্দা। ডান ধারে লিফট। লোকজন কেউ নেই। নিচের তলার ফ্ল্যাটগুলোতে তালা মারা। শুধু বারান্দার একপ্রান্তের একটা ঘরের দরজা খোলা আছে। আলো জ্বলছে ভেতরে। রাহুল বিকাশকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেল সেদিকে। কাছাকাছি যাবার পর দেখা গেল, দরজার পাল্লায় চৌকো এনামেলের

একটা প্লেট আঁটা। তাতে লেখা রয়েছে, কেয়ারটেকার।

গোলগাল চেহারার মাঝবয়সী একজন লোক টেবিলে পা তুলে দিয়ে বই পড়ছে। দরজার কাছে শব্দ পেয়েই তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসল। তাকাল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

রাহুল বলল, আমি একজনের সন্ধানে এসেছি।

নাম বলুন?

মিস্টার জেঠানী।

ইন্দ্রকুমার জেঠানীর কথা বলছেন?

বোধহয়।

কেয়ারটেকার বিলক্ষণ অবাক হল। বলল, আপনি যাকে খুঁজছেন, তার নাম জানেন না?

কেন জানব না!

সেকেণ্ড ফ্লোরে চলে যান। ফ্ল্যাটের নম্বর হল, বি, ফিফটিন।

উনি এখানকার বাসিন্দা, না বাইরে থেকে এসেছেন?

এত কথার উত্তর দিতে পারব না।

রাহুল একটা কুড়ি টাকার নোট টেবিলের ওপর রাখল। দৃষ্টি সরু করে নোটের দিকে তাকাল কেয়ারটেকার। কিছুটা চনমনে হয়ে উঠল যেন। নড়েচড়ে বসতেই পুরনো চেয়ারের মৃদু আর্তনাদ শোনা গেল।

আরো দশটা টাকা হবে স্যার আপনার কাছে?

হবে।

রাহুল দশ টাকার একটা নোট এগিয়ে দিল।

কি বলছিলেন? দ্রুত গলায় কেয়ারটেকার বলল, উনি এখানে থাকেন কিনা?...না স্যার, থাকেন বম্বেতে। মাঝে-মধ্যে আসেন। বিরাট বড়লোক। কি সমস্ত কারবার আছে যেন।

বি ফিফটিন ফ্ল্যাটটা কার?

ওঁরই। অন্য সময় বন্ধ থাকে।

কবে এসেছেন কলকাতায়?

আজই দুপুরে। প্লেনেই যাওয়া-আসা করেন। বড়লোক হলে হবে কি স্যার, ভারি মাক্কিচুষ।

মাক্কিচুষ! সেটা আবার কি?

এক মুখ হেসে কেয়ারটেকার বলল," বুঝলেন না, কৃপণ। কথাটা অবাঙালীদের কাছ থেকে শিখেছি।

রাহুল আর কোন প্রশ্ন না করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। লিফট এখন ব্যবহার করা চলবে না। বন্ধ। লিফটের একপাশ থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে। সিঁড়ির মুখে এসে রাহুল থামল। পিছনে বিকাশ।

বিকাশ, একটা কাজ করতে হবে।

বলুন?

ফোনের কানেকসন নষ্ট করতে পারবে?

দেখছি চেষ্টা করে।

অবশ্য তার আগে জেঠানীকে একটা ফোন করে নিতে চাই। কেয়ারটেকারের কাছ থেকে নম্বরটা নিয়ে এস। সামনের ড্রাগ হাউস থেকে চান্স নেব।

ওদিকে—

সোফায় হেলে বসে পানের জাবর কাটছিলেন ইন্দ্রকুমার জেঠানী। তামাটে রঙের মেদবহুল চেহারা। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। সাদামাটা মুখের ওপর ধূর্ত্ততার ছায়া বিরাজ করছে।

ঘরখানা ভালভাবেই সাজানো। বেশ বড়সড়। দু' হাজার স্কোয়ার ফুটের চেয়ে কম কোন ফ্ল্যাট কোহিনুর বিল্ডিংয়ে নেই। ইন্দ্রকুমার অবশ্য একা ঘরে নেই। যৌবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছেছে এমন একজন বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে অদূরে।

জাবর কাটা থামিয়ে ইন্দ্রকুমার বললেন, কাজটা ভালয় ভালয় মিটে গেলে, ভাবছি কিছুদিন বিশ্রাম নেব।

উটিতে আমার জানা একটা চমৎকার বাংলো আছে স্যার। বলেন তো ওখানে—

ওখানে নয় ছুলালবাবু। আমি সুইজারল্যাণ্ড যাব। জেনিভাতে কিছুদিন থাকতে চাই। কাগজপত্র সব রেডি। এখন কথা হচ্ছে, কেতু বর্মা কাজটা ঠিক মত করতে পারবে কিনা।

ছুলাল বলল, আমার তো মনে হয় পারবে স্যার। লোকটার সাহস আছে। তাছাড়া লোভে একেবারে পাগল হয়ে উঠেছে।

ওই ভরসাতেই আছি। তোমার দায়িত্বও কম নয়। কেতু বেরোবে প্যালেসের পেছন দিক থেকে। স্টার্ট নেওয়া একটা গাড়িতে তুমি থাকছ। কেতুকে তুলে নিয়ে সোজা মেটিয়াবুরুজে তোমার আস্তানায় চলে যাবে। পথে গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে, ট্যাক্সি ধরতে পার। আমার মনে হয়, সেটাই ঠিক কাজ হবে।

গাড়িটার সূত্র ধরে যদি—

ইন্দ্রকুমার মৃদু হেসে বললেন, আমি কাঁচা কাজ করি না ছুলাল-বাবু। বম্বে থেকে একটা চোরাই গাড়ি কালকের মধ্যেই এসে পড়বে। যা বলছিলাম, আমি তোমার আস্তানায় উপস্থিত থাকব। কেতুকে শেষ করে ফেলা হবে ওখানেই। তারপর—

কথা শেষ করার আগেই ঝনঝন শব্দে ফোন বেজে উঠল। ইন্দ্রকুমার রিসিভার তুলে নিলেন, জেঠানী কথা বলছি—

কেতু বর্মা···আপনাকে একটু বিরক্ত করছি—

কি হল আবার—তোমার তো সকালে আসবার কথাই ছিল—নতুন কিছু ঘটল নাকি—

সকালে যেতে পারব না···হোটেলেই আটকে পড়তে হবে বিশেষ কাজে···এখন যে যাব তার উপায় নেই···শরীর ভাল ঠেকছে না···

বলতেটা কি চাও···

আমার সহকারীকে পাঠাচ্ছি···ওর সঙ্গে যদি দয়া করে কথা বলে নেন, কাজটা একটু এগিয়ে থাকত···

বেশ···পাঠিয়ে দাও···

রওনা হয়ে গেছে···আপনার ওখানে পৌছল বলে···ছাড়ছি এখন—

লাইন কেটে গেল। ভ্রূ কুঁচকে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন ইন্দ্রকুমার। বিলক্ষণ বিরক্ত হয়েছেন তিনি। লোকটার সাহস আছে। নিজে না এসে সহকারীকে পাঠাচ্ছে এখানে। নেহাত কাজ আদায় করতে হবে, নইলে এই ধরনের বেয়াদব লোককে বরদাস্ত করে যাওয়া তার স্বভাব নয়।

দুলাল একতরফা কথা শুনে বিশেষ কিছু আঁচ করতে পারেনি। তবে কর্তার মুখের অবস্থা দেখে বুঝতে পেরেছিল, তিনি বেশ বিরক্ত হয়েছেন।

ইন্দ্রকুমার খানকয়েক পান মুখে চালান করে দিয়ে কয়েক মিনিট চর্বন-সুখ উপভোগ করার পর দুলালকে বললেন সব কথা।

দুলাল বলল, লোকটাকে ক্ষমা করুন স্যার। ক'দিন আর বাঁচবে।

তা বটে। গুলিটা করবে ওর ডান চোখে।

মৃদু ছন্দে কলিংবেলটা বাজল কয়েকবার

ইঙ্গিত পেয়ে দুলাল গিয়ে খুলে দিল দরজা।

আগন্তুক বলল, কেতু বর্মা আমাকে পাঠিয়েছেন।

আসুন।

আগন্তুককে খুঁটিয়ে দেখলেন ইন্দ্রকুমার। স্বীকার করতেই হবে, মনে দাগ কাটার মত চেহারা কেতু বর্মার সহকারীর। রাহুলও সব কিছু দেখেশুনে নিচ্ছিল। ইন্দ্রকুমারকে চিনে নিতে কোন অসুবিধা হয়নি। এখন সামনে তার কঠিন পরীক্ষা।

বর্মাকে বলবেন—ইন্দ্রকুমার বললেন, এই ধরনের ব্যবহারে আমি অভ্যস্ত নই। যা হোক, এসে পড়েছেন যখন, কাজের কথা সেরে নেওয়া যেতে পারে।

উনি নিজেই আসতেন, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমায় পাঠিয়ে দিলেন।

তাই তো শুনলাম।···দুলাল, প্যালেসের প্ল্যানটা এখানে নিয়ে এস।—বসুন আপনি।

দুলাল স্টিল আলমারির ভেতর থেকে বড় আকারের ভাঁজ করা

কাগজ বার করে সেণ্টার টপের ওপর এনে রাখল।

রাহুল ততক্ষণে বসে পড়েছে সামনের সোফায়।

ইন্দ্রকুমার নিজের শরীর কিছুটা ঝুঁকিয়ে আনলেন সেণ্টার টপের দিকে। পার্চমেণ্ট কাগজের ওপর আঁকা প্ল্যানটার দিকে আঙুল নির্দেশ করে বললেন, অনেক কষ্টে, অনেক খরচ করে এই প্ল্যানটা তৈরি করানো সম্ভব হয়েছে। আমার কাজের পদ্ধতিই হল, যা কিছু কর, নিখুঁত ভাবে কর।

বিনীত ভঙ্গিতে রাহুল বলল, আমরা সেকথা জানি। বস্ তো আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

শুনে খুশি হলাম। এবার কাজের কথায় আসা যাক। প্ল্যানটা ভাল ভাবে দেখে নিন। উত্তর দিকের এই যে দরজাটা—এই দরজা দিয়েই পালাতে হবে। বারান্দা আর বাউণ্ডারী ওয়ালের মধ্যে এক চিলতে বাগান আছে। বাগান পেরোতে আধ মিনিটও সময় লাগবে না। মনে রাখতে হবে, এই অংশটা হল প্যালেসের পেছন দিক।

বাউণ্ডারী ওয়াল পার হওয়া যাবে কিভাবে ?

সেই কথাতেই এবার আসছি। ব্যবস্থা থাকবে। নাইলনের একটা মই ওধার থেকে নামিয়ে দেওয়া হবে। পাঁচিলের ওধারে স্টার্ট-করা মোটর থাকছে। ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন তো ?

· চিন্তিত গলায় রাহুল বলল, ওধারে কি কোন শান্ত্রী থাকবে না ?

মৃদু হেসে জেঠানী বললেন, নিশ্চয় থাকবে। কম করেও জনা চারেক রাইফেলধারী থাকবেই। ওরা কিছু বোঝার আগেই ব্যবস্থা নিতে হবে।

তা কি করে সম্ভব ? একটা লোক ভেতরে যাবে, আবার কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে আসবে—অথচ শান্ত্রীরা দেখতে পাবে না ?

এমনও তো হতে পারে, ওরা দেখেও দেখবে না।

অর্থাৎ—

এরপর কিছুটা ভারি গলায় জেঠানী বললেন, সমস্ত কিছু এক্সপ্লেন করে বলার কোন প্রয়োজন দেখি না। যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু

আপনাদের জানা থাকলেই হল। এই প্ল্যানের পেছনে আমার লাখ দুয়েক টাকা খরচ হচ্ছে, এটা কেতু বর্মা জানে।

রাহুল আর অহেতুক কৌতূহল প্রকাশ করল না। এর পর প্ল্যানের পরবর্তী অংশ নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা চলল।

রাহুল ওখান থেকে যখন বিদায় নিল, রাত তখন এগারোটা। বিকাশ গাড়িতে বসে, স্টিয়ারিংয়ে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিল। রাহুল ওকে তুলল।

বিকাশ ফিয়েটে স্টার্ট দিল। বলল, কোন দিকে যাবেন?

আমাকে এলগিন রোডে নামিয়ে দিয়ে, তুমি গাড়ি নিয়ে বাড়ি চলে যাও।

ফিয়েট গতি নিল। সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে রাহুল আবার বলল, এখন মনে হচ্ছে, কাজটা আমি ভাল করলাম না।

কোন কাজটা?

জেঠানীর সঙ্গে দেখা করাটা আমার ঠিক হয়নি। গভীর ভাবে চিন্তা-ভাবনা না করে কাজ করতে গেলে, এই রকমই হয়।

বিকাশ বলল, আপনি ভেতরের কথা নিশ্চয় জানতে পেরে গেছেন। আপনি তাই তো চাইছিলেন।

তা ঠিক। জেনেছি অনেক। ব্যাপারটা যে এমন দুরন্ত আকারের, ভাবতেও পারিনি! ওরা সত্যি যদি কাজটা সাফল্যের সঙ্গে করতে পারে, তবে আমাদের দেশের অপরাধ জগতে যুগান্তর আসবে। কিন্তু—

ব্যাপারটা যখন জানা হয়ে গেছে, তখন তো ওদের হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছেন। এরপর আপনার পক্ষে পরের চালটা দেওয়া সহজ হবে।

আমার কি মনে হচ্ছে জানো, অন্যমনস্কতার দরুণ পাকা গুটিটা কাঁচিয়ে দিয়েছি। কাল সকালেই নিশ্চিত ভাবে জেঠানীর সঙ্গে কেতু বর্মার দেখা হবে। তখনই জানাজানি হয়ে যাবে একটা উটকো লোক ভেতরের ব্যাপার জেনে নিয়ে কেটে পড়েছে।

একটা লরীকে পাশ কাটিয়ে বিকাশ বলল, লোকটা যে কে, কেতু বর্মা ঠিক বুঝতে পারবে।

বলা বাহুল্য, সাবধান হয়ে যাবে ওরা। প্ল্যান পাল্টে ফেলতে পারে। যাক, যা হবার হয়ে গেছে! এখন দেখতে হবে, ওরা নিজেদের কতটা গুটিয়ে নেয়।

বিকাশ ফুটপাথ ঘেঁষে গাড়ি থামাল।

সামনেই আধুনিক ধাঁচের চারতলা একটা বাড়ি। রাহুল কিছু না বলে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। ওই বাড়ির তেতলায় যখন গিয়ে পৌঁছল, এগারোটা বেজে গেছে। চারটে ফ্ল্যাট আছে এই তলায়। সিঁড়ির ডান ধারের ফ্ল্যাটের কলিং পুশে চাপ দিল রাহুল। একটু বিরতি—আবার চাপ দিল

দরজা খুলে গেল এবার। দরজার ওপাশে মিষ্টি হাসিতে মুখ ভাসিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে প্রগাঢ়যৌবনা এক যুবতী। সুন্দরীর শ্রেণীতে তাকে ফেলা না গেলেও, ভারি সুশ্রী। রাহুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর এগিয়ে গিয়ে সবলে জড়িয়ে ধরল তাকে।

এই—কি হচ্ছে কি? দরজাটা খোলা রয়েছে না!

এত রাতে আমাদের ফ্ল্যাটে উঁকি মারবার জন্য কে আসবে বল তো।

অনেকের আবার সময় জ্ঞান থাকে না।

দেখে ফেললেই বা কি এল গেল?

বাঃ, অসভ্য ভাববে না?

তাই তো!

রাহুল ওকে ছেড়ে দিয়ে সোফায় এসে বসল।

রুমা দরজা বন্ধ করে দিয়ে ওর পাশে বসতে বসতে বলল, তাড়াতাড়ি আসতে পারো না?

ইচ্ছে ছিল। কিন্তু হঠাৎ এমন একটা কাজে জড়িয়ে পড়লাম যে—

কাজ আর কাজ—রুমা উঠে পড়ল।

উঠলে যে?

খাবে তো। আমি গিয়ে ব্যবস্থা করি। তুমি ডাইনিং স্পেসে এস।

রাহুল সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, আমি খাব না। না ভেবে চিন্তে একটা কাজ করে ফেলায়, মন এমন খিঁচড়ে গেছে যে কি

বলব। খেতে একেবারেই ইচ্ছে করছে না।

রুমা ওর হাত ধরে টান দিয়ে বলল, ইচ্ছে না করলে তো চলবে না। তোমার অপেক্ষায় আমি যে না খেয়ে বসে আছি! এস বলছি—

রাহুল উঠে পড়ল। ডাইনিং স্পেসের দিকে এগোতে এগোতে বলল, তোমার ব্যাপার-স্যাপার দেখলে কে বলবে, আমাদের বিয়ে হয়নি।

বিয়েটা আমাদের হচ্ছে না কেন?

প্রশ্নটা ভাল। ব্যাপারটা কি জান, যখন তখন হতে পারে বলেই আমাদের বিয়েটা হচ্ছে না।

রুমা রাহুলের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, আমার কিন্তু আর অপেক্ষা করতে ভাল লাগছে না। কালই কাজটা মিটিয়ে ফেললে কেমন হয়?

মন্দ হয় না। তবে আমি তোমার কাছ থেকে ক'দিন সময় চাইব।

কেন?

যে কাজটা হাতে আছে, তার হেস্তনেস্ত হয়ে গেলে, সব দিক দিয়ে ফ্রি হতে পারি। মনে হয় হপ্তাখানেকের মধ্যেই মিটে যাবে। তারপরই—

কাজটা কি?

কেতু বর্মাকে আবার হাতে পেয়েছি। এবার ওকে এমন অবস্থার মধ্যে ফেলব যে বাছাধন আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না।

কথা বলতে বলতে দুজনে খাবার টেবিলের কাছে এসে পড়ল। রুমা দ্রুত হাতে দুটো প্লেটে খাবার সাজিয়ে নিল। ছিমছাম মেনু। রাহুলের এই ধরনের কোর্সই পছন্দ। গেলাসে জল ঢালতে ঢালতে রুমা প্রশ্ন করল, তুমি ওই লোকটার পেছনে আদাজল খেয়ে লেগে আছ কেন বল তো?

লোকটা আমার সর্বনাশ করেছে।

আমি তো দেখছি, তুমিই ওর সর্বনাশ করে চলেছ।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাহুল বলল, সে অনেক কথা। তোমাকে

বলা হয়নি। তুমি জান, আমি নর্থ বেঙ্গলের লোক। কেতু বর্মা ওখানেই থাকত। কাজ করত একটা ব্যাঙ্কে। আমার বাবা ছিলেন সেই ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার। আমার বয়স তখন বছর আটেক। মা ছিলেন না। বিধবা পিসিমার হাতে মানুষ হচ্ছিলাম। এই সময় ব্যাঙ্কে মোটা টাকার গোলমাল হল। নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও বাবা ফেঁসে গেলেন। পরে অবশ্য জানা গিয়েছিল, কাজটা কেতু বর্মার। কিন্তু ততদিনে আইনের হাত অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল।

তারপর?

বাবার জেল হয়ে গেল। কেতু বর্মারও। দুঃখের ব্যাপারটা ঘটল তারপরই। জেলের একটা ওয়ার্ডের খাঁজ কাটা দেওয়ালের সাহায্যে বাবা ছাদে উঠে লাফিয়ে পড়লেন নিচে। মারা গেলেন কুড়ি ঘণ্টা পরেই। এরপর অসহায়া পিসিমা দারিদ্র্যের স্রোতে আমাকে নিয়ে ভেসে গেলেন। কি কষ্টের মধ্যে যে আমি বড় হয়েছি রুমা তোমাকে বোঝাতে পারব না। ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন আমার ভেঙে গেলেও একটা ব্যাপারে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলাম, কেতু বর্মাকে শান্তিতে থাকতে দেব না। তারপর ওকে আমি কিভাবে খুঁজে বার করেছি, সে আরেক ইতিহাস।

রুমা রাহুলের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। আলতো ভাবে ওর চুলের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে বলল, তোমার মনের মধ্যে যে অনেক ব্যথা, তা তো আমি জানি। আমারই অন্যায় হয়েছে, এখন কথাটা না পাড়লেই ভাল করতাম।

কোন অন্যায় হয়নি। তোমার সব কথা জানা দরকার রুমা। তবে তোমাকে কথা দিচ্ছি, কেতু বর্মাকে এবারই শেষ চোট দেব। তারপরই তোমাকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাব। এই বিশাল দেশের অন্যত্র কোথাও আমাদের বাকি জীবনটা চমৎকার ভাবে কাটবে। ও সমস্ত কথা এখন থাক। এস, এবার খাওয়া-দাওয়াটা সেরে ফেলি। তারপর —

আবার তারপর কি?

রাহুল হেসে ফেলল। বাঃ, তারপর রাতটা রঙিন করে তুলতে হবে না!

বেশ ভোরেই পার্থ সমাদ্দারের ঘুম ভেঙে গেল। নিজের ঘরে, নিজের বিছানায় থাকলে ঘুম ভাঙতে আরো অন্তত তিন ঘণ্টা সময় লাগত এখন আছেন হোটেলে। গতকাল দুপুরে বর্ধমান থেকে এসে পার্কভিউ হোটেলে উঠেছেন। আড়মোড়া ভেঙে বিছানায় উঠে বসলেন সমাদ্দার। বালিশের পাশে সিগারেটের প্যাকেট ছিল। লাইটারের সাহায্যে সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ঘনঘন টান দিলেন কয়েকবার। বাসিমুখে সিগারেট টানা একটা ঝকমারি, তবু নেশার হাতছানি উপেক্ষা করতে পারেন না।

সমাদ্দার এজেন্সির ব্যবসা করেন। কয়েকটা বড় বড় কোম্পানির মাল নিয়ে তাঁর কারবার। সেই সূত্রেই কলকাতায় আসতে হয় মাঝে মাঝে। সমাদ্দার মনে মনে সারা দুপুর কিভাবে কাজ করবেন তারই ছক কাটতে লাগলেন। একসময় সিগারেট ছোট হয়ে এল। টুকরোটা অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিয়ে বিছানা ছেড়ে জানলার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

সূর্যের নরম আলোয় রাস্তাঘাট, গাছপালা সমস্তই ভারি পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে। সাড়ে ছ'টার বেশি এখন হবে না। বাথরুম যাবার তাগিদ অবশ্য ছিল না। তবু একবার ঘুরে আসার বাসনা তিনি বাতিল করতে পারছিলেন না।

জানলার কাছ থেকে সরে এসে কয়েক পা এগিয়ে তাঁকে থামতে হল। ড্রেসিং টেবিলের ওপর একটা লাইটার রাখা রয়েছে। তাঁর থেমে পড়ার কারণই হল ওই সুদৃশ্য লাইটারটা। সমাদ্দারের ওটা নয়। গতরাত্রে পাশের ঘরের বিশাল চেহারার ভদ্রলোক ভুল করে ফেলে গেছেন। পার্থ সমাদ্দার ভ্রূ কুঁচকে ভদ্রলোকের নামটা মনে করবার চেষ্টা করলেন। উপাধি বর্মা—নামটা মনে পড়ল না। ডিনার সেরে সবে ঘরে ফিরেছেন, এমন সময় ভদ্রলোক এলেন। সঙ্কোচের

সঙ্গে জানতে চেয়েছিলেন, ইস্টার্ন রেলওয়ের টাইম টেবল আছে কিনা।

টাইম টেবল ছিল না—ছিল ব্র্যাডশ। সেখানাই সমাদ্দার বাড়িয়ে দিলেন। নেড়েচেড়ে কি সমস্ত দেখে নিয়ে ভদ্রলোক ধন্যবাদ সহকারে ব্রাডশটা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর মিনিট কুড়ির সৌজন্যসূচক কথাবার্তা হয়েছিল দুজনের মধ্যে। মনে হচ্ছে, তখনই লাইটার ফেলে রেখে বর্মা নিজের ঘরে ফিরে গেছেন।

বাথরুমে যাওয়া আর হল না। বালিশের পাশ থেকে রিস্টওয়াচ তুলে নিয়ে দেখলেন, ঘড়ির কাঁটা আরো কিছুটা সরেছে। বর্মা বোধহয় ঘুম থেকে উঠেছেন, ধূমপানের তাগিদ অনুভব করলেও ইচ্ছাপূরণ হচ্ছে না, কারণ লাইটারটা এঘরে।

লাইটারটা হাতে নিয়ে পার্থ সমাদ্দার নিজের ঘর থেকে বেরোলেন। পাশের ঘরে নক করতেই দরজাটা নড়ে উঠল। অর্থাৎ ভেতর থেকে বন্ধ নয়। সমাদ্দার পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন।

ওদিকে—

বাসুদেব সোম আর রাজেন হাজরা লিস্টের সাহায্য না নিয়েই তিনতলায় এসে উপস্থিত হল। কিছুটা হাঁপিয়ে পড়েছে দুজনেই। সাত সকালে হোটেলে আসার উদ্দেশ্য হল, কেতু বর্মার এই রকমই নির্দেশ ছিল।

বর্মা সাগরেদ দুজনকে সঙ্গে নিয়ে জেঠানীর সঙ্গে সকাল সকাল দেখা করতে চান। পরিকল্পনা অনুসারে কাজ আরম্ভ করার মুখেই রাহুল সেনের উপস্থিতি মঙ্গলজনক নয়। ব্যাপারটা জেঠানীকে ভালভাবে বুঝিয়ে বলা দরকার লোকটার পয়সা আছে, পরিষ্কার মাথা আছে—রাহুলকে ফাঁকি দেবার একটা পথ নিশ্চয় বার করবে।

রাজেন, গুরুর ঘর থেকে এ লোকটা আবার কে বেরোল?

বাসুদেবের কথায় রাজেন সচকিত হল। একজন মাঝবয়সী লোক কেতু বর্মার ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে গেল। দুজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করার পর খোলা দরজার পাল্লা ঠেলে গুরুর ঘরে

ঢুকে পড়ল। কেউ নেই। এগিয়ে গিয়ে বাথরুমে উঁকি মারল রাজেন, সেখানেও কেউ নেই।

ব্যাপার কি? বাসুদেব বলল, আমাদের সকাল সকাল ডেকে গুরু নিজেই গায়েব।

দরজা খোলা থাকাটাও আমার কেমন কেমন লাগছে।

রাজেনের কথায় যুক্তি ছিল। কেতু বর্মা অতি সাবধানী লোক। হঠাৎ কোথাও গেলেও নিজের ঘরের দরজা খোলা রেখে যাবেন, একথা ভাবাও যায় না। এখন তো আরো সাবধান হওয়া দরকার। আগামী অপারেশনের প্রস্তুতি সম্পর্কে কাগজপত্র হয়তো আছে।

চিন্তিত গলায় বাসুদেব বলল, আচ্ছা, ওই লোকটা কে?

পাশের ঘরে গিয়ে যে ঢুকল?

হ্যাঁ। লোকটাকে আগে কখনো দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। রাজেন বলল, লোকটার কাছে যাওয়া যাক। ওর কাছ থেকে জানা যেতে পারে, গুরু এখন কোথায়।

দরজায় করাঘাত শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন পার্থ সমাদ্দার। বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন দুই অপরিচিতের দিকে!

বাসুদেব প্রশ্ন করল, বর্মাসাহেব কোথায় গেছেন, বলতে পারেন?

পাশের ঘরের ভদ্রলোকের কথা বলছেন? আমি তো তাঁর সন্ধানেই গিয়েছিলাম। ঘরে নেই।

আমরা বর্মাসাহেবের সহকারী। কিন্তু আগে আপনাকে তাঁর কাছে দেখেছি বলে তো মনে হয় না?

সমাদ্দার বললেন, ভদ্রলোককে আমি চিনি না। কালই প্রথমবার দেখলাম। আমার ঘরে এসেছিলেন টাইম টেবলের ব্যাপারে। যাবার সময় লাইটার ফেলে গিয়েছিলেন। সেটাই ফেরত দিতে গিয়েছিলাম। দেখলাম, ভদ্রলোক ঘরে নেই।

কেউ আর কিছু বলার আগে ওই করিডরের বেয়ারা এসে উপস্থিত হল। তার হাবভাবে একটা ভারিক্কি চাল রয়েছে। যদিও তার বয়েস খুব একটা বেশি নয়। বছর পঁচিশ হবে হয়তো। সে সকলের

পাশ কাটিয়ে চলে যেতে যেতে থামল। বলল, কি হয়েছে স্যার?

বেয়ারার প্রশ্ন শুনে রাজেন বলল, তুমি কি এই তলাতে কাজ কর? বর্মাসাহেব কোথায় গেছেন, বলতে পারো?

বেয়ারা ঘাড় নাচিয়ে বলল, এ তলার কথা কি বলছেন স্যার সারা হোটেলের খবর আমার নখদর্পণে।

ভারি গলায় পার্থ সমাদ্দার বললেন, বেশি কায়দা মেরো না। বর্মাসাহেব এখন কোথায় আছেন জানা থাকলে, সেটাই বলে ফেলো।

সেই কথাই তো বলতে যাচ্ছিলাম স্যার। রাত সাড়ে এগারোটার পর ভদ্রলোককে নিচে নেমে যেতে দেখেছিলাম। পরে উনি ঘরে ফিরে এসেছিলেন কিনা বলতে পারব না।

বেয়ারার কথা শুনে রাজেন আর বাসুদেব চিন্তায় পড়ে গেল। রাত্রে নিচে নেমে যাবার পর তিনি যে আর ফিরে আসেননি, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ঘর এখনো খালি। কিন্তু এত রাত্রে কেতু বর্মা গেলেন কোথায়? জেঠানীর সঙ্গে দেখা করতে চলে যাননি তো?

তুমি জেঠানীর ঠিকানা জানো?

রাজেনের প্রশ্ন শুনে চিন্তিত গলায় বাসুদেব বলল, আমি জানলে, তুমি জানতে না? গুরু রাতভোর গায়েব—ভাবনার কথা হল। এখন কি করা যায় বল তো?

কিছুক্ষণ আরো অপেক্ষা করে দেখা যাক। তারপর—

বেয়ারা আগেই সরে পড়েছিল। এ ব্যাপারে পার্থ সমাদ্দারের আর কি করার থাকতে পারে। তিনি নিজের ঘরে চলে গেলেন। রাজেন আর বাসুদেব নেমে এল নিচে। ওয়েটিং হলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করাই ওদের উদ্দেশ্য।

ভোর তখন সাড়ে পাঁচটা। নির্জন রেড রোডের মোড়ের মাথায় ফুটপাথ ঘেঁষে জীপ থামালেন রঞ্জন ঘোষাল। ঘণ্টাখানেক হল থানা থেকে বেরিয়েছেন। নিজের এলাকাটা ভালভাবে রাউণ্ড দিয়ে তবে ফিরবেন। আজকাল অপরাধের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে প্রায়

চব্বিশ ঘণ্টাই এলাকায় কোন না কোন ভাবে দৃষ্টি রাখতে হয়। স্থানীয় থানার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা রঞ্জন ঘোষাল সিগারেট ধরালেন। তিনি অবশ্য জীপে একা নেই। এ-এস-আই নির্মল সেন আর জনচারেক কনস্টেবল রয়েছে। রাউণ্ডের সময় সঙ্গে কিছু লোকজন থাকা দরকার। কখন কি রকম প্রয়োজন দেখা দেবে, আগে থেকে বলা তো যায় না।

নির্মল সেন বলল, আপনাকে স্বীকার করতেই হবে, অন্যান্য এলাকার চেয়ে আমাদের এলাকাটা অনেক শান্ত।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে ঘোষাল বললেন, কারণ আছে। একে তো অঞ্চলটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা। জনবসতির চেয়ে অফিসের সংখ্যাই বেশি। তাছাড়া মস্তানদের আড্ডা নেই বললেই চলে।

কথাটা ঠিক। তবে—

দেখ নির্মল, চুরি, ছিনতাই, মারামারি—এই ধরনের ক্রাইম হতে থাকলে ঘাবড়াবার কিছু নেই। ঠিক কণ্ট্রোলে এসে যায়। ঝামেলা বাধে খুন বা ডাকাতি হলে।

খুনের ব্যাপারটাও আজকাল সরল হয়ে আসছে স্যার। আমরা কিছু করার আগেই কোন পার্টি থেকে জানানো হয়, ভিকটিম আমাদের দলের লোক। যদি রুলিং পার্টির দাবী হয়, তবে তো কথাই নেই। তদন্তের দফারফা হয়ে গেল ওখানেই।

মৃদু হেসে রঞ্জন ঘোষাল বললেন, বলেছ ঠিক। যা দিনকাল চলেছে সম্মান বজায় রেখে চাকরি করা একটা ঝকমারি। আশার কথা এইটুকুই যে, সময় প্রায় কাটিয়ে এনেছি।

আপনার রিটায়ার হতে তো—

বছর আড়াই আর আছে।

সিগারেটের টুকরোটা ছোট হয়ে এসেছিল। টুকরোটা আঙুলের টোকায় দূরে ফেলে দিয়ে জীপে স্টার্ট নিলেন ঘোষাল। খিদিরপুর ব্রীজ পর্যন্ত এখন যাবেন, তারপর ফিরবেন থানায়। রেড রোডের আধাআধি যাবার পর ওঁকে সচকিত হতে হল।

রাস্তার দু'ধারে সুদৃশ্য পাঁচিল চলে গেছে। মাঝে মাঝে কিছুটা

কাটা। লোকজনের রাস্তা পারাপার করবার জন্যই এই ব্যবস্থা। এই রকমই এক জায়গায় কিছু লোক ভিড় করে কিছু দেখছে। তাদের হাবেভাবে উত্তেজনা বিদ্যমান। ঘোষাল জীপ থামালেন।

পুলিশ দেখেই কয়েকজন দ্রুত এগিয়ে এল। একজন দ্রুত গলায় বলল, স্যার, একজন লোক মরে পড়ে আছে।

মরে পড়ে আছে।

হ্যাঁ, স্যার। দেখুন না।

ঘোষাল সদলবলে জীপ থেকে নামলেন। এগিয়ে যেতেই ভিড় সরে গেল। একজন লম্বা-চওড়া লোক আধ-শোয়া অবস্থায় ঘাস-জমির ওপর পড়ে রয়েছে। পোশাক-আশাক বেশ দামী। ঘোষাল ঝুঁকে দেহটা নিরীক্ষণ করলেন।

কোন ক্ষতচিহ্ন চোখে পড়ল না। দেখা যাচ্ছে না এমন জায়গায়, অর্থাৎ তলপেট বা ওধরনের আর কোথাও গুলি বা ছোরা লাগলে রক্ত চুঁইয়ে পড়ত কিন্তু সেরকম কিছু চোখে পড়ল না। অথচ ঘোষালের পুলিশী মন বলছে, মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়। উনি বডিটা নেড়েচেড়ে দেখলেন এবার। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছোট মাপের নিশ্বাস ফেললেন। ফিরলেন সহকারীর দিকে। বললেন, বুঝলে সেন, অন্তত ঘণ্টা পাঁচেক আগে মারা গেছে লোকটা। রাইগার মর্টিস সেট ইন করে গেছে।

সেন বলল, লোকটা হার্টফেল করে মারা গেছে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। আপনি কি বলেন?

আমিও সন্দেহ করছি। অবশ্য পোস্টমর্টেমের রিপোর্টের পরই সমস্ত কিছু সরল হবে। তুমি থানায় চলে যাও। লোকজন নিয়ে ফিরে এস—এখনকার বিলি ব্যবস্থাটা সেরে ফেলি। তারপর বডি পাচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

সেন দ্রুত জীপের দিকে এগোল। ঘোষাল এবার ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর দিকে ফিরলেন।

রঞ্জন ঘোষাল ক্লান্তভাবে নিজের চেয়ারে বসে পড়ে ঘড়ির দিকে তাকালেন, ন'টা কুড়ি। রেড রোডের ধারে পাওয়া মৃতদেহ পোস্ট-মর্টেমের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার আগে অবশ্য মৃতের জামা-কাপড় খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। টাকা-পয়সা বা অন্য কোন দামী জিনিস পাওয়া যায়নি। হত্যাকারী সে সমস্ত নিয়ে সরে পড়েছে, বলাবাহুল্য। সুতরাং মৃত ব্যক্তির পরিচয় রয়েছে এখনো অন্ধকারে। জামা-প্যান্টের লেবেল দেখে শুধু এইটুকু বোঝা যায়, বম্বের দর্জির তৈরি। ঘোষাল হাই তুলতে তুলতে সেনের দিকে তাকালেন।

সেন বলল, এটা স্যার রাজনৈতিক খুন নয়।

আমারও তাই মনে হচ্ছে। নইলে এতক্ষণ কোন পার্টির দাদারা নিশ্চয় এসে উপস্থিত হতেন।

লোকটার চেহারা কিন্তু ক্রিমিনালদের মত। ওই দলের ঝগড়াতে লোকটা হয়তো মারা গেছে।

সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ঘোষাল বললেন, হতে পারে। তবু লোকটার পরিচয় পাওয়া তো দরকার। অন্যান্য থানায় খোঁজ-খবর নিতে হবে। মিসিং পার্সনে রিপোর্ট হয়ে থাকতে পারে।

ওদিকে—

রাহুল বিছানায় উঠে বসে আড়মোড়া ভাঙল। ঘুমটা ভালই হয়েছে। সাইড পিসের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই তুলে নিতে গিয়ে রিস্টওয়াচের ওপর চোখ পড়তেই সে হতবাক। সাড়ে ন'টা। দ্রুত বিছানা থেকে নেমে সে কুকিং স্পেসের দিকে এগোল।

রুমা গ্যাস রেঞ্জের ওপর ফ্রাই প্যান চাপিয়ে ডিম ভাজছিল। সকালে উঠেই স্নান করেছে। ভিজে চুল ছড়িয়ে রয়েছে পিঠের ওপর। পেছন থেকেও ভারি মনোরম লাগছে ওকে। ধীর পায়ে এগিয়ে এসে ওর ঘাড়ের কাছে মুখ গুঁজলো রাহুল।

এই, কি হচ্ছে—

ততক্ষণে রাহুলের দু'হাত রুমার কোমরকে বেড় দিয়েছে। বলল, কি আবার হবে? আদর করছি তোমায়।

রুমা ফ্রাই প্যানটা নামিয়ে রেখে হাসল। বলল, তোমার আদরের জোয়ার কাল ছুটো পর্যন্ত আমাকে জাগিয়ে রেখেছিল। সকালে উঠেই আবার—

মুখে হাসি টেনে রাহুল সরে এল। বলল, এখন সকাল নয় ম্যাডাম। মধ্যাহ্ন।

রুমা ওর দিকে ফিরে বলল, তা না হয় হল। তাই বলে—

আমার এক এক সময় কি মনে হয় জানো?

কি মনে হয়?

মনে হয়, আর সময় নষ্ট না করে সমস্ত ছেড়েছুঁড়ে তোমাকে নিয়ে কোথাও পালিয়ে যাই। এমন কোথাও, যেখানে আমাদের কোন পরিচিত জন নেই—বিরক্ত করার লোক নেই। শুধু আমি আর তুমি।—রুমা দু'হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরল রাহুলের। বলল ভারি মিষ্টি গলায়, চল না। আজই চল!

রাহুল উত্তর দেবার আগেই ঝনঝন শব্দে কলিংবেল বেজে উঠল। দুজনে সরে এল দুজনের কাছ থেকে। এ সময় আবার কে এল! রাহুল এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতেই চৌকাঠের ওধারে বিকাশকে দেখতে পেল। বলল, তোমার তো এখন পার্ক-ভিউ হোটেলের কাছাকাছি থাকবার কথা।

বিকাশ ঘরে প্রবেশ করে বলল, কেতু বর্মার ওপর দৃষ্টি রাখবার জন্যে আমি সময় মতই হোটেলের সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। ঘোরাঘুরি করছি, এমন সময় খবরটা পেলাম।

কোন খবর?

কেতু বর্মাকে পাওয়া যাচ্ছে না। লোকটা বেবাক উবে গেছে।

বিস্মিত গলায় রাহুল বলল, বল কি! কখন থেকে পাওয়া যাচ্ছে না, কিছু শুনলে?

ব্যাপারটা অবশ্য জানা গেছে কিছুক্ষণ আগে। তবে সে গায়েব

হয়েছে রাত্রেই। ঘরের দরজা খোলা ছিল। তার মালপত্র অবশ্য আছে।

ব্যাপারটা কোন দিকে মোড় নিচ্ছে বলে তোমার মনে হয়?

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

চিন্তিত গলায় রাহুল বলল, লোকটা গা ঢাকা দিয়েছে বলে মনে হয় না। গা ঢাকা দিলে মালপত্র ঘরে পড়ে থাকত না। ওর সাগরেদ দুটোর সন্ধান পেয়েছ?

ওরা হোটেলে আসার পরই ব্যাপারটা জানাজানি হয়েছে। দিলীপবাবু পুলিশে খবর দেওয়ার কথা ভাবছেন।

রুমা চা আর ফ্রেঞ্চ টোস্ট নিয়ে উপস্থিত হল। প্লেটগুলো রাখল সেণ্টারপিসের ওপর। ভ্রূ কুঁচকে বিকাশ আর কিছুটা অন্যমনস্ক ভাবে রাহুল খাওয়া শেষ করল। ব্যাপারটা কোন পথ ধরে এগোচ্ছে, না জানা পর্যন্ত আগাম কিছু স্থির করা এখন সম্ভব হবে না।

রুমার দিকে তাকিয়ে রাহুল বলল, কেতু বর্মাকে পাওয়া যাচ্ছে না। লোকটা আমার হাত থেকে বেরিয়ে যাবার কোন পরিকল্পনা খাড়া করেছে কিনা কে জানে। খোঁজখবর নেওয়া দরকার। বিকাশ, তুমি পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করো। আমি তৈরি হয়ে আসছি।

গৌতম সরকার লম্বায় যেমন, চওড়াতেও সেই অনুপাতে যথাযথ। গোল, ভরাট মুখ। আধুনিক কায়দায় গোঁফের দুপাশ কিছুটা ঝুলে পড়েছে। স্বাভাবিক কারণেই, পুলিশী পোশাকে তাঁকে দেখাচ্ছেও ভারি জমকালো। ভ্রূ কুঁচকে তিনি এখন দাঁড়িয়ে রয়েছেন পার্ক-ভিউ হোটেলের তেতলার করিডরে। ঘণ্টাখানেক আগে হোটেল থেকে স্থানীয় থানাকে জানান হয়েছিল, একজন বোর্ডার নিখোঁজ হয়েছে। এই ধরনের কেস এলে ভারি বিরক্ত হন গৌতম সরকার। রহস্যময় খুনটুন হলে উৎসাহ পাওয়া যায়। কিন্তু উপায় নেই, তদন্তে আসতেই হল।

করিডরে তিনি একলা নন। তেতলার বেয়ারা পান্নু বেরা একধারে দাঁড়িয়ে আছে ভীতভাবে। আর আছেন পার্থ সমাদ্দার,

বাসুদেব সোম, রাজেন হাজরা এবং দিলীপ চৌধুরী। সকলেরই মুখের ওপর অস্বস্তির ছাপ।

গৌতম সরকার এতক্ষণ পান্নুকে জেরা করছিলেন। এবার মাঝারি ধরনের হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, এতরাত্রে একজন বোর্ডার নিচে নেমে যাচ্ছে দেখেও তুমি জানতে চাইলে না, তিনি কোথায় যাচ্ছেন ?

চাপা গলায় পান্নু বললে, বোর্ডাররা কে কোথায় যাচ্ছে, তা নিয়ে আমি কিভাবে প্রশ্ন করতে পারি স্যার : ধমক তো খাবই, ম্যানেজারকে বলে দিলে চাকরিও যেতে পারে।

হুঁ। নিচে নামার পর তিনি কোথায় গেলেন ?

তা তো জানি না স্যার। আমি শুধু সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখেছিলাম।

তারপর তুমি কি করলে।

আর তো কাজ ছিল না। আমি খাওয়া দাওয়া সারতে চলে গিয়েছিলাম।

গৌতম সরকার এবার দিলীপ চৌধুরীর দিকে ফিরলেন। বললেন, আপনার সঙ্গে ভদ্রলোকের শেষ কখন দেখা হয় ?

দিলীপ বলল, দুপুরে। ডাইনিংরুমে দেখা হয়েছিল।

কোন কথা হয়েছিল ?

সামান্যই। উনি বলেছিলেন, এরপর থেকে খাবার যেন ঘরেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমি সম্মতি জানিয়েছিলাম।

আপনি কাল কতক্ষণ ডিউটিতে ছিলেন ?

রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত। তারপর কোয়ার্টারে চলে গিয়েছিলাম।

আপনার কোয়ার্টার কোথায় ?

হোটেল কম্পাউণ্ডেই। পিছন দিকে তিন কামরার একটা কোয়ার্টার মালিকপক্ষ ম্যানেজারের জন্য তৈরি করিয়ে দিয়েছেন।

একটু থেমে গৌতম সরকার প্রশ্ন করলেন, নিখোঁজ ভদ্রলোক এই প্রথমবার হোটেলে উঠেছিলেন, না আগেও এসেছেন ?

আগেও কয়েকবার এসেছেন।

আপনার সঙ্গে কিরকম আলাপ ছিল ?

বিস্ময়ের সুরে দিলীপ বলল, আলাপ ! একজন বোর্ডারের সঙ্গে ম্যানেজারের যেটুকু সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক, সেটুকুই ছিল।

করতেন কি ভদ্রলোক ?

কোন ব্যবসা-ট্যবসা ছিল বোধহয়, সঠিক বলতে পারব না। তবে—

বলুন—

একটু ইতস্তত করে দিলীপ বলল, কানাঘুষো শুনেছিলাম, বম্বেতে নাকি উনি স্মাগলিং জগতের সঙ্গেও জড়িত।

হুঁ। আচ্ছা, কিভাবে ধরে নেওয়া হল, উনি নিখোঁজ হয়েছেন ? এমনও তো হতে পারে, কাউকে না জানিয়ে বিশেষ কোন কাজে হঠাৎ কোথাও চলে গেছেন ?

ঘরের দরজা খোলা রেখে চলে যাবেন, তা বোধহয় সম্ভব নয়। তাছাড়া মিস্টার বর্মার দুই বন্ধু একেবারে নিশ্চিত যে তাঁর কোন বিপদ হয়েছে।

বন্ধু-যুগলকে আগে কখনো দেখেছেন ?

হ্যাঁ। মিস্টার বর্মা যখনই এখানে উঠেছেন, বন্ধু দুজনকে আসা-যাওয়া করতে দেখেছেন।

গৌতম সরকার দিলীপের সঙ্গে কথা শেষ করে অন্যান্যদের নিয়ে পড়লেন। কিন্তু আরো ঘণ্টা দুয়েক পরিশ্রমের পরও লাভের লাভ কিছুই হল না। অর্থাৎ বোঝা গেল না, কখন এবং কিভাবে কেতু বর্মা অদৃশ্য হয়েছেন। অথবা সত্যি সত্যি অদৃশ্য হয়েছেন কিনা।

দুশো একচল্লিশের কে হ্যাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীটের ড্রইংরুমে তখন সম্পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করছে। শৈবাল সেন্টার টপের ওপর তাস বিছিয়ে পেসেন্স খেলে চলেছে। বাসব ভীষণ ভাবে ব্যস্ত ভিডিও গেম নিয়ে। এই খেলার সেটটা কিছুদিন হল সংগ্রহ করেছে। সময় পেলেই এখন ব্যস্ত হয়ে পড়ছে এই বিজ্ঞান বিচিত্রায়।

দেওয়াল ঘড়িতে সশব্দে ছ'টা বাজল। শৈবাল একপাশে তাস

সরিয়ে রেখে গলা খাঁকারি দিল। তারপর বলল, কি অবস্থায় রয়েছে?

আমার দল পিছিয়ে পড়েছে।—কথা শেষ করেই বাসব সেটটা সরিয়ে রাখল। পাইপে মিক্সচার ভরতে ভরতে আবার বলল, বেশ সময় কেটে যায় কিন্তু। আবার মাথা খাটাবার অবকাশও রয়েছে।

শৈবাল অবশ্য এরপর কিছু বলার অবকাশ পেল না, অভাবনীয় ভাবেই ঘরে প্রবেশ করলেন হোমিসাইডের বড়কর্তা পুরন্দর সামন্ত। মুখের অবস্থা তাঁর বিশেষ সুবিধার নয়। মনে হচ্ছে কিছুটা শ্রান্তও। উচ্চবাচ্য না করেই সোফায় গা এলিয়ে দিলেন।

মৃদু হেসে বাসব বলল, এ তো আগমন নয়, রীতিমত আবির্ভাব। পাহাড়ে না সমুদ্রের ধারে কোথায় যেন গিয়েছিলেন, ছুটি কাটিয়ে ফিরলেন কবে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সামন্ত বললেন, সবে কাল ফিরেছি। এসেই এক ঝামেলার মুখোমুখি হতে হয়েছে। একটু এধার ওধার দেখলেই থানার বাবুরা স্থির নিশ্চিত হয়ে পড়েন, কাজটা তাঁদের দ্বারা হবে না। চাপাও হোমিসাইডের ঘাড়ে।

ঘাড় কাত করে জব্বর একটা কেস নিয়েছেন মনে হচ্ছে। ঘটনাটা কোন অঞ্চলের?

এই অঞ্চলেরই। পার্ক-ভিউ হোটেলে লোকটা উঠেছিল আমাদের জ্বালাবার জন্যে। মরেছে অবশ্য রেড রোডের ধারে।

এরপর ঘটনাটা বিস্তারিত ভাবেই বললেন সামন্ত। মিসিং পার্সন স্কোয়ার্ডের কানে কথাটা উঠিয়ে দেওয়ার দরুণই রেড রোডের ধারে পাওয়া মৃতদেহটা কেতু বর্মার, তা বুঝতে পারা গিয়েছিল পরে। সোম আর হাজরা—বর্মার দুই সাগরেদ সনাক্তও করেছে।

বাসব পাইপ দাঁতের ফাঁক থেকে নামিয়ে এনে বলল, বেশ জট পাকানো ব্যাপার। আচ্ছা, রাত্রে হোটেলে পাহারা থাকে না? আমি জানতে চাইছি কোন দারোয়ান বা ওই জাতীয় কেউ পাহারায় থাকে কিনা?

হোটেলের আভ্যন্তরীন নিরাপত্তার ব্যবস্থা এত ভাল যে বাইরে

পাহারাদার রাখার কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় না। তবে দিনের বেলা দুজন উর্দি-পরা দরোয়ান সেলাম-টেলাম ঠোকার জন্যে থাকে বটে।

ক'টায় হোটেলের দরজা বন্ধ হয়?

সাড়ে দশটা।

তার মানে, ওই সময়ের আগেই কেতু বর্মা হোটেল থেকে বেরিয়েছিল। সেসময় কাউন্টারে যারা ছিল, তাদের তো দেখার কথা?

কাউন্টারে সেসময় কেউ ছিল না। এগারোটা বেজে যাওয়ায় কর্মচারিদের ডিউটি অফ হয়ে গিয়েছিল। বেয়ারা পান্নু বেরা শুধু দেখেছিল বর্মাকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে।

ভ্রূ কুঁচকে বাসব বলল, হোটেলের ভূগোলটা ভাল করে দেখেছেন? আর কোন পথ নেই বেরোবার? ফায়ার স্কেপ আছে?

আছে। হোটেলের পেছন দিকে যেমন থাকে আর কি। তবে বর্মাকে তো প্রধান সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে দেখা গেছে।

হুঁ। মালপত্র ঘেঁটে কিছু পেয়েছেন?

কাজে লাগে এমন কিছুই পাওয়া যায়নি। বড় স্যুটকেশটা তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে। তবে—

একটু থেমে সামন্ত আবার বললেন, স্যুটকেশে বা ঘরের আর কোথাও একটা কানাকড়িও ছিল না।

বলেন কি! লোকটা স্মাগলার বলছিলেন না? ভাল রকম মালকড়িই কাছে থাকা উচিত ছিল।

খুঁজে পেতে একটা দু'টাকার নোটও পাওয়া যায়নি।

বাসব নিভে যাওয়া পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, কেতু বর্মা কেন কলকাতায় এসেছিল, তা জানা দরকার। বন্ধু দুজন কি বলছে?

তাদের বক্তব্য হল, মাঝে মধ্যে বর্মা হাঁফ ছাড়তে কলকাতা চলে আসতেন। এবারও এসেছিলেন কয়েকদিন বিশ্রাম নিতে।

আমার বিশ্বাস হয় না। ওদের ভালভাবে বাজিয়ে দেখা দরকার। কাজকর্ম কি করে লোক দুটো?

ব্রোকার!

ভারি সন্দেহজনক।

বাহাদুর চা নিয়ে উপস্থিত হল।

পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে সামন্ত বললেন, ওদের হাবভাব একটু 'ফিসি' সন্দেহ নেই! লোকদুটোকে আপনার হাতে ছেড়ে দেব বলছেন?

মৃদু হেসে বাসব বলল, বেগার খাটতে খাটতে তো কাহিল হয়ে পড়লাম। চলুন তাহলে, ঘটনাস্থলে যাওয়া যাক।

এত হতাশ হবেন না। পুলিশের ওপর আস্থা রাখ তো, লোকে ক্রমে ছেড়েই দিচ্ছে। হোটেলের মালিক আপনাকে দেখলে হয়তো হাতে চাঁদ পাবে। তখন—

অনুপম ঘোষাল সবে সত্তর অতিক্রম করেছেন। তবে শরীর ঝুলে পড়েনি। বেশ আঁটসাঁট। পার্ক-ভিউ হোটেলের 'বার' কাউণ্টারের সামনে ভ্রূ কুঁচকে তিনি বসে আছেন। হাতে অবশ্য বিয়ারের ক্যান। দিলীপ দাঁড়িয়ে আছে হাতকয়েক দূরে। ভারি বিনীত ভাব।

হাতের ক্যান সরিয়ে রেখে অনুপম ঘোষাল আগের কথার জের টানলেন, তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে, হোটেলের সুনাম বেশ ধাক্কা খেয়েছে? রেট অফ অ্যাডমিশন কম করেও ত্রিশ পার্সেণ্ট কমে গেছে। এই ভাবে চলতে থাকলে তো ব্যবসা লাটে উঠবে।

নরম গলায় দিলীপ বলল, এখন ব্যাপারটা তাজা আছে। সামলে যাবে। অনেক বড় বড় হোটেলে খুনজখম প্রায়ই হয় স্যার।

সামলে গেলেই ভাল। পুলিশের লোকেরা ওধারে কার সঙ্গে কথা বলছে?

একজন বেয়ারার সঙ্গে স্যার।

আমি এখন নিজের ঘরে যাচ্ছি। পুলিশ যদি আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়, জানিও।

ঘোষাল প্রোপ্রাইটার চেম্বারের দিকে এগোলেন।

ওদিকে—

বাসব এতক্ষণ পান্নু বেরাকে নেড়েচেড়ে দেখছিল। কিন্তু কাজে লাগে, এমন বিশেষ কিছু তার কাছ থেকে জানা গেল না। তার সেই এক কথা, রাত সাড়ে এগারোটা আন্দাজ সময় কেতু বর্মাকে সে নিচে নেমে যেতে দেখেছে।

সামন্ত বললেন, সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে আমরা মোটেই পৌঁছতে পারছি না।

হুঁ। বাসব বলল, চলুন, ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলি। এই হোটেলের প্ল্যানটা একবার দেখা দরকার।

হোটেলের প্ল্যান—

হ্যাঁ। প্ল্যান দেখলে হয়তো বর্মা কিভাবে হোটেল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল বুঝতে পারা যাবে।

অনুপম ঘোষাল নিজের চেম্বারে চলে যাবার পর, দিলীপ বিব্রত মন নিয়ে অফিসঘরে এসে বসেছিল। কাউণ্টারের পেছনেই ছোট্ট অফিসঘর। সামন্ত বাসবকে সঙ্গে নিয়ে ওখানে পৌঁছলেন।

ভাগ্যক্রমে হোটেলের প্ল্যানটা পাওয়া গেল। বাসব খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। সামনের দরজা ছাড়া বোর্ডারদের বাইরে বেরোবার আর কোন পথ নেই। হোটেলের পেছন দিকে খানিকটা খালি জমির পর বাউণ্ডারি ওয়াল। খালি জমির একধারে, বাউণ্ডারি ওয়াল ঘেঁষে ম্যানেজারের কোয়ার্টার এবং গ্যারেজ। এধারে একটা গেট আছে—গাড়ি যাওয়া-আসা করার। নিম্নশ্রেণীর কর্মচারিরাও এই পথ ব্যবহার করে। ফায়ার স্কেপও আছে এধারে।

কি বুঝলেন?

সামন্তর প্রশ্নে বাসব বলল, এখনও কিছু বুঝে উঠতে পারিনি। আপনিই তো হোটেলের ম্যানেজার?

হ্যাঁ। দিলীপ চৌধুরী আমার নাম। আপনার সুনামের সঙ্গে

পরিচয় আমার অনেক দিনের। এই কেসে ইন্টারেস্ট নেবেন ভাবতেও পারিনি।

ধন্যবাদ। আপনাকে গোটাকয়েক প্রশ্ন করতে পারি?

নিশ্চয়ই।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, আপনার স্টেটমেণ্ট আমি পেয়েছি। রাত সাড়ে দশটার পর আপনিও কাউণ্টারের কর্মচারির কাজ থেকে অবসর নেন। ধরুন, তারপর যদি কেউ আসে, তখন কি হবে?

রাত সাড়ে দশটার পর কোন ক্ষেত্রেই আমরা বোর্ডার নিই না। নিয়মটা বিশেষ ভাবে মেনে চলা হয়।

কোন বোর্ডার নাইট শো সিনেমা দেখতে গেছেন বা অন্য কোন কাজে ফিরতে দেরি হল, তখন—

দুজন নাইট গার্ড থাকে। তারা খুলে দেয়।

অর্থাৎ রাত সাড়ে দশটার পর কেউ বাইরে থেকে এলে বা ভেতর থেকে বাইরে গেলে নাইট গার্ডের দৃষ্টি এড়ান যাবে না।

ঠিক তাই।…আপনাদের জন্য কফি আনতে বলি।

দিলীপ কথা শেষ করেই ইণ্টারকামের নব টিপে কফির অর্ডার দিল। সামন্ত চেয়ারে একটু হেলে বসে সিগারেট ধরালেন।

বাসব বলল, নাইট গার্ডরা বর্মাকে হোটেল থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেনি। এমন তো হয়নি, আপনাদের ব্যবহার করা প্যাসেজ দিয়ে বেরিয়ে লোকটা হোটেলের পেছন দিকে গেছে, তারপর গেট পেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়?

তা হয়নি মিস্টার ব্যানার্জি।

কেন?

কাউণ্টারের তিনজন সামনের দরজা দিয়েই বাড়ি চলে যায়। তারপর আমি প্যাসেজ দিয়ে বাইরের বারান্দায় পৌঁছে, প্রতিদিনের মত প্যাসেজের দরজায় তালা মেরে দিই।

বুঝলাম। কিন্তু প্রশ্নটা রয়েই যাচ্ছে। লোকটা বাইরে গেল কিভাবে?

এতক্ষণ পরে সামন্ত কথা বললেন, এক্ষেত্রে সমাধানের একটা সূত্রই আমাদের সামনে রয়েছে। কেতু বর্মা ফায়ার স্কেপ দিয়ে নেমে, খোলা জমি মাড়িয়ে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

দিলীপ বলল, গেটে রাত্রে তালা দেওয়া থাকে। ওপথ দিয়েও বেরোবার উপায় নেই।

কফি এসে পড়ল। পেয়ালায় ছোট একটা চুমুক দিয়ে বাসব বলল, ও ব্যাপারটা নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে। এবার কেতু বর্মা সম্পর্কে কিছু বলুন। দুই সাগরেদ ছাড়া আর কেউ দেখা করতে আসেনি শুনলাম। এমন কাউকে আপনি জানেন, যে লোকটার সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছিল বা আগ্রহ প্রকাশ করেছিল।

একটু ইতস্তত করে দিলীপ বলল, এ সম্পর্কে আমার কিছু বলাটা কতদূর সঙ্গত হচ্ছে জানি না। তবে—

কেসটা খুনের, মনে রাখবেন। হোটেলের সম্মানও এ ব্যাপারে জড়িত। ইতস্তত করবেন না, বলুন পরিষ্কার ভাবে।

আমার একজন পরিচিত আছেন, রাহুল সেন। সে কেতু বর্মা সম্পর্কে ভারি আগ্রহশীল ছিল।

কি রকম ?

দিলীপ সেদিন, রাহুল তাকে যা বলেছিল, বলে গেল একে একে। কেতু বর্মাকে ফোন করেছিল কাউণ্টার থেকে, তাও জানাতে ভুলল না।

কি করেন ভদ্রলোক ?

ঠিক কি যে করে জানি না। তবে এধার ওধার থেকে শুনেছি, বাঁকা পথ দিয়েই তার রোজকারপাতি হয়।

কোথায় থাকেন তিনি ?

এলগিন রোডে।

ঠিকানাটা আমায় লিখে দিন।

সামন্ত বললেন, এতক্ষণে তদন্ত আগে বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা সূত্র পাওয়া গেল। রাহুল সেন একটা ফিসি ক্যারেক্টার। ওকে নেড়েচেড়ে আপনি প্রথমে দেখুন। তারপর নাহয়—

ঠিক আছে।—বাসব আবার পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল মিস্টার চৌধুরী, কেতু বর্মার সঙ্গে কেউ ফোনে কথা বলেছিল বা সে কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল—বলতে পারেন ?

মৃদু হেসে দিলীপ বলল, ঠিক এই ধরনের প্রশ্ন আমাকে করেছিল, রাহুল। অপারেটারের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছিল, জেঠানী নামে একজন ওঁর সঙ্গে কথা বলেছিল।

ঠিকানা পাওয়া গিয়েছিল ?

কোহিনুর বিল্ডিং থেকে ফোন এসেছিল। এই বাড়িটা কোন রাস্তায়, তা অবশ্য জানা যায়নি।

হুঁ। সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। আজ এই পর্যন্ত।

বাসব ও সামন্ত আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন।

চিন্তিত রাহুল সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে সিগারেট টেনে যাচ্ছিল। কেতু বর্মা এইভাবে ফাঁকি দিয়ে যাবে, কে জানত ? সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন তালগোল পাকিয়ে গেছে। ওই সময় ডাইনিং স্পেসের দিক থেকে রুমা এসে ওর পাশে বসল। বসল গা ঘেঁষেই। বলল, কি এত ভাবতে থাকো বল তো ?

রাহুল রুমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কেতু বর্মার ব্যাপারটা জানো তো। কেমন সমস্ত গোলমাল হয়ে গেল না ?

হতে দাও। তোমার তো ভালই হল। পরিশ্রম আর ঝামেলার হাত থেকে বেঁচে গেলে। আবার এত ভাবছ কি ?

এক দিক থেকে অবশ্য তুমি ঠিকই বলছ। তবু ভাবতে হচ্ছে। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাসটা কে খেল বল তো ?

রুমা হেসে ফেলল। বলল, খেতে দাও কাউকে। এবার আসল কথায় এস। আমরা যাচ্ছি কবে ?

কোথায় ?

বাঃ, কেতু বর্মার একটা ব্যবস্থা হয়ে গেলে আমরা এখান থেকে হারিয়ে যাব, তুমি বলেছিলে না ?

রাহুল রুমাকে কাছে টেনে নিল। বলল, বলেছিলাম। এখনো সেই পয়েন্ট স্ট্যাণ্ড করে আছি। তবে—

ডোর বেল-এর মিষ্টি ধ্বনি ভেসে এল।

রুমা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুলল।

হ্যাঁ। আসুন।

বাসব ঘরে প্রবেশ করে দ্রুত চারিধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

রাহুল উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক-পা এগিয়ে এল অপরিচিত ব্যক্তির দিকে। বাসব নিজের কার্ড এগিয়ে দিয়েছে তৎক্ষণে। কার্ডের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে কেমন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বলল, কি সৌভাগ্য। বসুন—বসুন। আমি তো ভেবেছিলাম পুলিশ আসবে। এলেন আপনি—

বাসব সোফায় বসতে বসতে বলল, পুলিশ আসবে কেন ভেবেছিলেন ?

পার্ক ভিউ হোটেলের ব্যাপারে এসেছেন তো ? ওখানে প্রায়ই যাই। কেতু বর্মা সম্পর্কে আবার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলাম। তাই আর কি। হোটেলের মালিকপক্ষ নিশ্চয় আপনাকে নিযুক্ত করেছেন ?

না। আমি পুলিশকে সাহায্য করছি। কেতু বর্মার সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল ?

রুমা, চা'টার ব্যবস্থা কর !—তারপর বাসবের দিকে ফিরে রাহুল বলল, ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। তবে লোকটার পেছনে আমি লেগে ছিলাম। কলকাতা এলেই ওর কাজ পণ্ড করে দেবার চেষ্টা করতাম।

বিস্মিত গলায় বাসব বলল, কেন ? পরিচয় ছিল না অথচ লোকটার ক্ষতি করবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন কেন ?

সে অনেক কথা—

বলতে আপত্তি না থাকলে, আমি তদন্তের খাতিরে শুনতে চাই।

আপত্তির কি আছে।

কেতু বর্মার পেছনে কেন লেগে ছিল, রাহুল তার কারণ বর্ণনা করল। কেতু কলকাতায় কোন পরিকল্পনা হাতে নিয়ে এসেছিল, তা বলতেও ভুলল না। জেঠানীর কথাটাও এই প্রসঙ্গে এসে পড়ল। এবং কোহিনুরের বিল্ডিং কোথায় অবস্থিত, তাও জানা হয়ে গেল।

কোটি কোটি টাকার রত্ন সরিয়ে ফেলার এই ষড়যন্ত্রের কথা শুনে বাসব স্তম্ভিত হয়ে গেল। অবশ্য মুখে সেভাব প্রকাশ করল না। দিনকাল সত্যি বদলে গেছে। এখন লোকে অল্পে সন্তুষ্ট নয়।

রুমা চা আর ফ্রায়ান্স ভর্তি প্লেট নিয়ে এসে উপস্থিত হল।

রাহুল আবার বলল, আসুন, দক্ষিণ হাতের কাজটা আমরা সেরে ফেলি। রুমা, তুমিও বস। এঁর সঙ্গে আপনার এখনও পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি, মিস্টার ব্যানার্জি। রুমা, আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। আমাদের এখনো বিয়ে হয়নি। তবে যে কোন মুহূর্তে হয়ে যাবে।

বাসব মচমচে গোটাদুয়েক ফ্রায়েন্স মুখে পুরে বারকয়েক চিবিয়ে নিয়ে বলল, আপনার স্পষ্ট কথা শুনতে বেশ ভাল লাগছে। এবার নিজের সম্পর্কে কিছু বলুন?

বিস্তারিত ভাবে বলে সময় নষ্ট করতে চাই না। এইটুকু জেনে রাখুন, বাঁকা পথে হেঁটে প্রচুর রোজগার করেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবশ্য চোরের ওপর বাটপাড়ি! তবে মজার কথাটা কি জানেন, এখনো পর্যন্ত পুলিশের খাতায় আমার নাম ওঠেনি।

আপনি ভাগ্যবান ব্যক্তি। এই ভাবেই তাহলে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবেন?

না। আর আমি আয় বাড়াবার পথে যাব না। এবার রুমাকে নিয়ে আমার অবসর জীবন আরম্ভ হবে। একটা কথা বলে নেওয়া ভাল, আমি যা কিছুই করে থাকি না কেন, খুনটুনের ঝামেলায় কখনো জড়িয়ে পড়িনি।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর বাসব ওখান থেকে উঠল। রাস্তার ধারে পার্ক করা ওল্ডস মোবাইলে যখন গিয়ে বসল, তখন ওকে

বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছে গাড়িতে স্টার্ট নেবার পর ভাবতে লাগল তার পরবর্তী করণীয় কি ?

বড় আকারের ডিবে থেকে খানকয়েক সাজা-পান তুলে নিয়ে মুখের মধ্যে চালান করে দিলেন ইন্দ্রকুমার জেঠানী। মিনিট খানেক চোখ বন্ধ করে চর্বণ সুখ উপভোগ করার পর তাকালেন বিনীত ভঙ্গিতে সামনের সোফায় বসে থাকা তুলাল ঘোষের দিকে। জেঠানী বললেন, সুযোগ ভালই পেয়েছিলাম। কাজ উদ্ধার হয়ে যেত সহজেই। ভাগ্যের ফের। সব ভেস্তে গেল।

আমি বলছিলাম স্যার,—তুলাল বলল, আপনার এখানে আর থাকাটা ঠিক হচ্ছে না।

কেন ?

পুলিশ যদি একবার আঁচ পায়—

আঁচ ! এলই বা পুলিশ। কে কেতু বর্মা—আমি তাকে চিনি না। ভাল কথা, পরিকল্পনার খসড়ার কাগজগুলো নষ্ট করে ফেলেছ তো ?

হ্যাঁ, স্যার। সেদিনই জ্বালিয়ে দিয়েছি।

মৃদু শব্দ তুলে ডোর বেল বাজল।

তুলাল ঘোষ এগিয়ে গিয়ে দরজার ল্যাচ সরিয়ে দিল। পাল্লা খুলে যেতেই চমকে উঠল বেচারা। কয়েকজন পুলিশ কর্মচারি কিছুটা অস্থিরতা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

মিস্টার জেঠানী আছেন ?

আছেন। আসুন।

পুলিশ কর্মচারিরা ভেতরে এলেন। জেঠানী নিজের বিশাল বপু সামাল দিয়ে সোজা হয়ে কোন রকমে বসলেন। মনের মধ্যে যে কিছুটা ভাবান্তর এল না, তা নয়। বললেন, কি ব্যাপার ? আপনারা—

একজন বললেন, লালবাজার থেকে আসছি। একটা তদন্ত হাতে নিয়েই আমাদের এখানে আসতে হয়েছে।

আকাশ থেকে পড়লেন ইন্দ্রকুমার, আমার কাছে তদন্ত। কিছুই

বুঝতে পারছি না। খুলে বলুন তো সব?

পুলিশ কর্মচারিরা অনুরোধ ছাড়াই বসলেন একে একে। তারপর তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, কেতু বর্মার খুন সম্পর্কে আমরা এখানে এসেছি। তার সঙ্গে আপনার ভাল পরিচয় ছিল। তাই—

কেতু বর্মা—সে আবার কে? পরিচয় থাকা দূরের কথা, এই নাম আমি জীবনে শুনিনি।

চেনেন না? মিস্টার জেঠানী, আপনি অকারণে নাটকের অবতারণা করছেন। আমরা খোঁজখবর নিয়েই এসেছি। শেষবারের মত জানতে চাইছি, সহযোগিতা করবেন কি করবেন না?

জেঠানী বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, এ তো রীতিমত জুলুম। বম্বে পুলিশ কিন্তু এরকম করে না। আপনাদের অফিসারের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।

বম্বে পুলিশের গুণকীর্তন শুনতে এখানে আমরা আসিনি। বেশ, তাহলে হেড কোয়ার্টারেই চলুন। ডি সির সঙ্গে কথা বলবেন।

নাচার জেঠানীকে এবার উঠে দাঁড়াতে হল।

বেলা তখন খুব বেশি হয়নি। দিনটা রবিবার। বাসব দাঁতে পাইপ চেপে চিন্তার সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছিল। শৈবাল প্রবেশ করল ঘরে। কাজের চাপ থাকায় দিন দুয়েক এধারে আসতে পারেনি। বসতে বসতে এক ঝলক দেখে নিল বাসবকে। বলল, ভাবনার পুকুরে খাবি খাচ্ছ মনে হচ্ছে? নতুন কোন তদন্ত ইতিমধ্যে হাতে এসেছে নাকি?

পাইপ মুখ থেকে নামিয়ে বাসব বলল, বেগার খাটছি বলতে পার। মিস্টার সামন্তর অনুরোধ। সে যা হোক। কাজটা তো ভালভাবে শেষ করতে হবে। কিন্তু ভারি ভাবনায় পড়ে গেছি।

কি রকম?

প্রথম থেকেই তোমাকে বলি ব্যাপারটা।

ঘটনাটা শোনার পর শৈবাল বলল, কেতু বর্মা কিভাবে হোটেল

থেকে অদৃশ্য হল—এটাই এখন তোমার কাছে বড় সমস্যা, কি বল ?

এই সঙ্গে হত্যার কি মোটিভ ছিল, তাও জানা দরকার। কিন্তু দুটো প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না। জেঠানীকে লালবাজারে ভাল মতই চেপে ধরা হয়েছিল কেতু বর্মার সঙ্গে আলাপ ছিল, এর চেয়ে বেশি আর তার কাছ থেকে কিছু জানা যায়নি।

জেঠানী বর্মাকে খুন করতে যাবে কেন ? পরিকল্পনা বাস্তব রূপ নেবার পর একটা কথা ছিল, আগে কখনই নয়।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, তুমি ঠিকই বলছ ডাক্তার। কেতু বর্মার দুই সাগরেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দেখি, তারপর হয়তো একটা ধারণা খাড়া করার অবকাশ পাওয়া যাবে।

পুলিশে তো ওরা স্টেটমেণ্ট দিয়েছে। পড়নি ?

পড়েছি। অন্য ধরনের গোটাকতক প্রশ্ন ওদের করতে চাই।

কখন যাবে ওদের কাছে ? কফি খেয়ে তো আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে পারি।

দরকার হবে না। সামন্তকে বলা আছে। উনি ওদের এখানে পাঠাবেন। কফির কথাটা ভাল মনে করিয়ে দিয়েছ। দেখ তো, বাহাদুর কিচেনে কোন মহাযজ্ঞে ব্যস্ত আছে।

শৈবাল উঠে গেল।

কফি পর্ব শেষ হবার কিছুক্ষণ পর হাজরা আর সাহা এসে উপস্থিত হল। ভারি বিচলিত দেখাচ্ছে তাদের। একেই দু'নম্বরী ব্যক্তিরা একটু সন্ত্রস্ত হয়েই থাকে। গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া, খুনের কেসে জড়িয়ে পড়েছে—বিচলিত থাকারই কথা।

বাসব দুজনকে বসাল। প্রাথমিক দু'চার কথার পর বলল, এবার যা প্রশ্ন করব, ভেবেচিন্তে উত্তর দেবেন। চিন্তার কিছু নেই। এখনই আপনাদের কাউকে হত্যাকারী আমি ভাবছি না।

হাজরা বলল, কি জানতে চান বলুন ?

বাসব ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, কেতু বর্মা এখানে এলে টাকা-পয়সা কিরকম সঙ্গে রাখত ?

বিস্তর টাকা থাকত গুরুর কাছে। গতবার বাধা আসায় কোন লাভের কাজ করা সম্ভব হয়নি। তবু গুরু আমাদের দুজনকে দশ হাজার টাকা করে দিয়ে গিয়েছিল।

টাকাটা হয়তো ব্যাঙ্ক থেকে তোলা হয়েছিল?

এবার সাহা বলল, না, স্যার। আমাদের যা কারবার, তাতে মোটা টাকা ব্যাঙ্কে রাখা সম্ভব নয়। অনেক প্রশ্ন উঠবে। বাণ্ডিল বাণ্ডিল নোট গুরু সুটকেসে ভরে নিয়ে আসত।

সুটকেস থেকে কিন্তু একটা দশ টাকার নোটও পাওয়া যায়নি।

তাই তো শুনলাম। মনে হয়, গুরুকে যে খুন করেছে, টাকাটা হাতিয়ে নিয়েছে সেই।

হতে পারে। আপনাদের কাউকে সন্দেহ হয়?

হাজরা বলল, সন্দেহ করার মত তেমন কোন লোক তো দেখছি না।

ইন্দ্রকুমার জেঠানীকে আপনারা চিনতেন?

দুজনেই মাথা নাড়ল।

ইন্দ্রকুমারের কাজ নিয়েই বর্মা এখানে এসেছিল, জানতেন?

সাহা বলল, জানতাম। পরের দিন সকালেই গুরুর জেঠানীর সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য, সব ওলোট-পালট হয়ে গেল। ওঁর মত লোক আমরা আর পাব না।

হুঁ। বম্বে থেকে কেতু বর্মা এই বিরাট সুটকেসটা ছাড়া আর কিছু সঙ্গে এনেছিল?

হাজরা আর সাহা দুজনেই ভাবিত হয়ে পড়ল। শেষে সাহা বলল, একটা বড় সাইজের ব্রিফকেসও ছিল।

ওটা কিন্তু পাওয়া যায়নি।

মনে হয় হত্যাকারী ব্রিফকেসটা সরিয়েছে।

বাসব চিন্তিত গলায় বলল, হতে পারে। আচ্ছা, ওই ব্রিফকেসে কি ছিল, আপনারা বলতে পারেন?

হাজরা চুপ মেরে গেল। সাহা বলল, ঠিক বলতে পারব না। মনে হয়, ওতে দরকারী কাগজপত্র ছিল—টাকাও থাকতে পারে।

আপনাদের পুলিশের খাতায় নাম আছে ?

আজ্ঞে, নাম তো থাকবেই। বারকয়েক ধরা পড়ে গেছি। অবশ্য মেয়াদ প্রতিবারই বেশি দিন হয়নি।

আপনারা ভাগ্যবান ব্যক্তি। আর কোন প্রশ্ন নেই। আসুন তাহলে। প্রয়োজন পড়লে আবার ডেকে পাঠাব।

হাজরা আর সাহা বিদায় নেবার পর বাসব বলল, শুনলে তো সব। কোন মন্তব্য আছে ?

শৈবাল বলল, ব্রিফকেসের ব্যাপারটা আমাকে খোঁচা মারছে। ওই পয়েন্টে চিন্তাভাবনা করলে কিছু সুফল পাওয়া যাবে কি ?

তুমি সঠিক জায়গায় ঘা দেবার চেষ্টা করেছ। তবে—

আবার কি হল ?

ভাবছি ব্রিফকেসটা গেল কোথায় ? যে বেয়ারা কেতু বর্মাকে রাত্রে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখেছিল, সে একবারও বলেনি, ব্রিফকেসটা হাতে ছিল।

হয়তো খেয়াল করেনি।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, পুলিশ তাকে প্রশ্ন করেছিল, বর্মার হাতে কিছু ছিল কিনা। উত্তরে সে জানিয়েছিল, তাঁর হাতে কিছু ছিল না।

এমনও তো হতে পারে, বর্মা ব্রিফকেসটা অনেক আগেই কোথাও রেখে এসেছিল ?

সে সম্ভাবনাও একেবারে নেই ডাক্তার।

কেন ?

পুলিশ খোঁজ নিয়ে দেখেছে, হাওড়া স্টেশন থেকে কেতু বর্মা সেই যে হোটেলে ঢুকেছিল, আর বাইরে যায়নি। শুধু—

কথাটা শেষ না করেই বাসব ঝটিতে উঠে দাঁড়াল।

আমাদের ধারণা ওই ব্রিফকেসে প্রচুর টাকা ছিল—

বিস্মিত গলায় শৈবাল বলল, তাই তো থাকার কথা। কিন্তু তুমি এত উত্তেজিত হয়ে পড়লে কেন ?

অন্ধকার হাতড়ে চলেছি। অথচ একটা সহজ সত্য হাতের কাছেই ছিল আমি লক্ষ্য করিনি। এভাবে চলতে পারে না ডাক্তার। এবার আমার গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

তুমি তাহলে—

হ্যাঁ, ভাই। ব্রিফকেস নিয়ে কথা বলতে বলতেই আসল সত্যটা চোখের ওপর ভেসে উঠল। কিভাবে কি হয়েছে বুঝতে পেরেছি। ভারি সহজ তদন্ত, অথচ আমি আকাশপাতাল ভেবে চলেছি।

লোকটা কে?

সে একমাত্র লোক যার পক্ষে কাজটা করা সম্ভব। অবশ্য তাকে বড় রকম রিস্ক নিতে হয়েছে। কি জানো ডাক্তার, টাকা এমন একটা বস্তু, মানুষকে সব করাতে পারে।

বাসব কথা শেষ করেই ফোন-স্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে গেল।

বেলা তখন পাঁচটা। পার্ক ভিউ হোটেলের সামনে জীপ এসে থামল। পুরন্দর সামন্ত, বাসব, শৈবাল ও কয়েকজন পুলিশ কর্মচারি নামলেন জীপ থেকে। দরজার সামনেই দেখা হয়ে গেল রাহুল সেনের সঙ্গে। বাসবের সঙ্গে হাসি বিনিময় হল।

হোটেলের ওনার ঘোষাল সাহেব তখন অফিসরুমে ছিলেন। ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে কথাবার্তা বলছিলেন ম্যানেজার দিলীপ চৌধুরীর সঙ্গে। পুলিশের এক কর্তাকে সদলবলে আসতে দেখে কিছু বিরক্ত হলেন ঘোষাল সাহেব। বর্তমান ক্ষেত্রে অবশ্য বিরূপতা প্রকাশ করার অবকাশ নেই।

সামন্ত বললেন, কিছু কথা ছিল আপনাদের সঙ্গে। কোয়ারি বলতে পারেন। ঘরটা ছোট, অন্য কোথাও বসলে সুবিধে হবে।

আসুন, ওয়েটিং হলে গিয়ে বসা যাক।

মালিকের কথায় দিলীপ সকলকে পথ দেখিয়ে নির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে গেল। রাহুল যেতে চাইছিল না। তার এ সমস্ত ব্যাপারে থাকার কি দরকার। বাসবের কথায় ওকে যেতে হল ওখানে।

ঘোষাল বললেন, বলুন এবার।

সামন্ত বললেন, মিস্টার ব্যানার্জি, আপনিই আরম্ভ করুন।

নড়েচড়ে বসে বাসব বলল, আমি পুলিশের লোক নই। এই তদন্তের ব্যাপারে আমার মাথা গলানোটা অনধিকার চর্চার সামিল। তবু ইন্টারেস্ট নিতে হয়েছে পুরনো বন্ধু মিস্টার সামন্তর অনুরোধেই। যা হোক, আপাত দৃষ্টিতে জটিল এই ব্যাপারে আমরা বিস্তর মাথা ঘামিয়েছি। ফলস্বরূপ কেসটা একরকম শেষমুখো বলা যেতে পারে। এই সূত্রেই গুটিকয়েক প্রশ্ন আমাদের সামনে দেখা দিয়েছে। উত্তরের খোঁজেই এই অসময়ে এখানে আসা বলতে পারেন।

কি জানতে চান বলুন?

হোটেলের নিয়মকানুন সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল। এখানে লকার বা ভল্ট আছে?

ভল্ট আছে। বোর্ডাররা দামী কিছু রাখতে চাইলে, ওখানে জমা রাখা হয়। সুরক্ষার ব্যাপার আর কি।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, মাল জমা রেখে বোর্ডারকে নিশ্চয় রসিদ দেওয়া হয়?

ঘোষাল বললেন, নিশ্চয় দেওয়া হয়। ব্যাপারটা কি? খুনের সঙ্গে এই ধরনের প্রশ্নের কি সম্পর্ক বুঝতে পারছি না।

গভীর সম্পর্ক আছে। আমরা জানি, কেতু বর্মা প্রচুর টাকা এনেছিল সঙ্গে করে। সেই টাকা ভর্তি ব্রিফকেস জমা রেখেছিল হোটেলের ভল্টে!

আপনি জোর দিয়ে কথাটা কিভাবে বলছেন?

রসিদ বইটা আনিয়ে নিলেই আমার কথা ঠিক কিনা বুঝতে পারা যাবে। ও কি, দিলীপবাবু—আপনি কোথায় চললেন মশাই?

দিলীপ দরজা পর্যন্ত গিয়ে পড়েছিল. বাসবের কথায় থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমতা আমতা করে বলল, না···মানে···

রসিদ বইটা আনতে যাচ্ছিলেন নাকি? থাক, এখন দরকার হবে না। পুলিশ পরে সিজ করবে। অবশ্য এতক্ষণে মনে হয়,

স্থানীয় থানার ও-সি আপনার কোয়ার্টার সার্চ করা শেষ করেছেন। টাকা-ভর্তি ব্রিফকেসটা অবশ্যই পাওয়া গেছে।

বিস্মিত ঘোষাল সাহেব বললেন, কি সব বলছেন! চৌধুরী···

হ্যাঁ, মিস্টার ঘোষাল। যথা নিয়মে অর্থই এখানে সমস্ত অনর্থের মূলে রয়েছে। আপনার ম্যানেজার দিলীপ চৌধুরী লোভ সামলাতে না পেরেই রক্তে হাত ডুবিয়েছেন। তবে চালাকিটা যে এইভাবে কেঁচে যাবে, ভাবতে পারেননি। আসল কথা হল, পেশাদার নন তো। যা হোক, মিস্টার সামন্ত, এবার আমার ছুটি। হাতকড়া নিয়ে কাউকে এবার এগিয়ে আসতে বলুন।

দিলীপ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। দরজার মুখেই বসে পড়েছে। থেকে থেকে শরীর গুলিয়ে উঠছে। প্রবল ঘাম যেন ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। পার্ক ভিউ হোটেলের সত্ত্বাধিকারী ঘোষাল সাহেব নিজের বিশ্বাসী কর্মচারির দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকালেন। রাহুলও কম অবাক হয়নি। একজন পুলিশ কর্মচারি এই সময় এগিয়ে গেলেন দিলীপের দিকে। তাঁর হাতে হাতকড়া।

দিনদুয়েক পরের কথা। সন্ধ্যা হয় হয়। দুশো একচল্লিশের কে হ্যাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীটের ড্রইংরুমে তখন আলস্যের আমেজ বিরাজ করছে। সোফায় আড় হয়ে বসে ঘনঘন কয়েকবার টান দেবার পর, মুখ থেকে পাইপ খসিয়ে আনল বাসব। হাই তুলল তারপর। দিন দুয়েক থেকে শৈবালের দেখা নেই। হাসপাতালে বোধহয় হঠাৎ কাজের চাপ পড়ে গেছে। এরকম হয় মাঝে মাঝে। একবার কফি খাওয়া হয়ে গেছে। বাহাদুরকে ডেকে আবার এককাপ আনতে বলবে কিনা বাসব ভাবছিল। এই সময় শৈবাল রাহুলকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল।

শিস্টাচার বিনিময়ের পর রাহুল বসল সোফায়।

শৈবাল বলল, মোড়ে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তোমার এখানেই আসছিলেন।

নতুন কিছু ঘটল নাকি ?

বাসবের কথার উত্তরে রাহুল বলল, কিছু ঘটেনি। অনেক আগ্রহ নিয়ে আপনার কাছে এলাম। কেতু বর্মার মার্ডার কেসের নেপথ্য কাহিনী শোনার ইচ্ছে রয়েছে। ভাল কথা, আমার সম্পর্কে পুলিশকে কিছু বলেননি তো ?

অন্ধকার জগৎ থেকে বিদায় নিচ্ছেন বললেন, ওদের তাই আর কিছু জানাইনি।

ধন্যবাদ। কয়েক দিনের মধ্যেই রুমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি এখান থেকে চলে যাব। উত্তরপ্রদেশের কোন একটা শহরে বাসা বাঁধার ইচ্ছে আছে।

মৃদু হেসে বাসব বলল, অর্থাৎ শহরের নামটা বলবেন না। যাক ওকথা। এদিকে এক কাণ্ড ঘটে গেছে, শোনেননি বোধহয় ?

কি হয়েছে ?

দিলীপ চৌধুরী মারা গেছে।

শৈবাল এবং রাহুল, দুজনেই অবাক।

বাসব আবার বলল, আত্মহত্যা করেছে। মারকিউরিক ক্লোরাইড। পকেটেই ছিল। লালবাজারে যাবার পথে শিশিটা মুখে উজাড় করে দিয়েছে। কেতু বর্মাকেও মারকিউরিক ক্লোরাইড দিয়েই মারা হয়েছিল। অর্ধেক ছিল আর কি। সেটাই কাজে লাগানো হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, একদিক দিয়ে ভালই হল। দিলীপ চৌধুরী টাকা হাতিয়েছে এটা সহজেই প্রমাণ করা যেত, কিন্তু খুন করেছে প্রমাণ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হত। কোর্টে পুলিশ বা সরকারী পক্ষের উকিল হালে পানি পেত না।

কফি এসে পড়ল। শৈবাল বলল, এবার বল, কিভাবে তুমি দিলীপ চৌধুরীকে সন্দেহ করলে ?

কেতু বর্মা কি চরিত্রের লোক ছিল জানবার পরই আমার সন্দেহ ঘুরছিল তার চারপাশের লোকের ওপরই। নানা ধরনের স্বার্থের হানাহানি থাকে, হয়তো তাদের মধ্যেই কেউ মেরে ফেলেছে

কেতুকে। তবে একটা জায়গায় খটকা লাগল পরে। কেতু কোন পথ দিয়ে হোটেল থেকে বাইরে বেরিয়েছিল? সামনের বা পেছনের, দুটো পথই সুরক্ষিত—তবে? এই সময় ক্ষীণ সন্দেহ আমার মনে দেখা দিল। ম্যানেজারের কোয়ার্টার হোটেলের পেছন দিকে। সে সহজেই পারে কাউকে সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে যাবার সুযোগ করে দিতে। তবে কি দিলীপ চৌধুরীর হাত আছে, এই খুনোখুনির ব্যাপারে?

যদি হাত থেকে থাকে, তবে কেন? কিসের স্বার্থে চৌধুরী একজনকে খুন করার রিস্ক নিল? এই সমস্ত চিন্তা-ভাবনায় যখন হাবুডুবু খাচ্ছি, তখনই ডাক্তারের সঙ্গে কেতু বর্মার ব্রিফকেস নিয়ে আমার কাছে আলোচনা হল। বলতে গেলে এই আলোচনাই আমাকে সমাধানের কূলে পৌঁছে দিয়েছে। ব্যাপারটা এইভাবে দাঁড়াল—১ঃ কেতু বর্মার সুটকেসে বা ঘরের আর কোথাও টাকা পয়সা পাওয়া গেল না। ২ঃ ব্রিফকেসের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। ৩ঃ কেতু সব সময় প্রচুর টাকা সঙ্গে করে নিয়ে আসত। ৪ঃ রাত সাড়ে এগারোটার সময় যখন বেয়ারা কেতুকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখেছিল, তখন তার সঙ্গে ব্রিফকেস ছিল না। ৫ঃ কেতু সুটকেস ও ব্রিফকেস নিয়ে হোটেলে আসার পর একবারও রাত সাড়ে এগারোটার আগে হোটেল থেকে বাইরে যায়নি। ৬ঃ কাজেই ব্রিফকেস হোটেলেই আছে।

এই পয়েন্টগুলোর সমাধান আমি এইভাবে করলাম, ১ঃ সুটকেস বা ঘরের আর কোথাও টাকা না পাওয়া যাওয়াটা বিশেষভাবে সন্দেহজনক। ২ঃ ব্রিফকেস আগেই সরিয়ে রাখা হয়েছে। ৩ঃ স্মাগলাররা সঙ্গে প্রচুর টাকা রাখবে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। টাকা ব্রিফকেসের মধ্যেই ছিল। ৪ঃ বেয়ারা ঠিকই দেখেছিল, সিঁড়ি দিয়ে রাত সাড়ে এগারোটার সময় কেতু যখন নামছিল, তখন তার হাতে ব্রিফকেস ছিল না। ৫ঃ এবং ৬ঃ কেতু হোটেলে আসার পর একবারও বাইরে যায়নি অথচ তার ব্রিফকেস অদৃশ্য। সুতরাং

সে টাকা সমেত ব্রিফকেস হোটেলেরই কোন সুরক্ষিত জায়গায় রেখেছিল। বোর্ডারদের পক্ষে সুরক্ষিত জায়গা একটাই—হোটেলের ভল্ট।

এবার পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। যদিও রুল অব থ্রির সহযোগিতা নিতে হয়েছে, তবু ব্যাপারটা ঠিক ওইভাবেই ঘটেছিল। কেতু বর্মা বিশাল অঙ্কের টাকাটা নিজের ঘরে রাখতে সাহস করেনি। কারণ পরের দিন অপারেশনের ব্যাপারে বাইরে ছুটোছুটি করতে হবে। নিশ্চয় আগেও সে হোটেলের ভল্টে দামী মালপত্র জমা রেখেছে। কাজেই তার নিয়মটা জানা ছিল। এবারও ব্রিফকেসটা জমা করে রসিদ নিয়ে নিল দিলীপ চৌধুরীর কাছ থেকে। হোটেলের ম্যানেজারদের লোক চরিয়েই চলতে হয়। কাজেই দিলীপ সহজেই বুঝতে পারল, ব্রিফকেসে প্রচুর টাকা আছে। এবং যে কোন কারণেই হোক, লোভ তাকে সাপটে ধরল। দ্রুত পরিকল্পনা খাড়া করে ফেলল দিলীপ। টোপটা ছিল নিশ্চিত ভাবে রাহুল সেন।

একটানা এতক্ষণ বলার পর বাসব থামল।

বিস্মিত রাহুল বলল, আমি টোপ ছিলাম কি রকম?

দিলীপ কথায় কথায় জানিয়ে দিল রাহুল সেনকে সে চেনে, কোথায় থাকে, তাও জানে। কেতু বর্মা হাতে চাঁদ পেয়েছিল নিশ্চয়। এই রাহুল সেনের জন্যই কলকাতায় তার কাজকর্ম করা দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। সুতরাং দিলীপের সাহায্যে তার সন্ধান নিতে সে ব্যগ্র হয়ে পড়ল। এতদিন পরে পথের কাঁটা সরাবার একটা সুযোগ এসে পড়েছে। সমস্ত কিছু ঠিক হয়ে গেল। কেতু রাত সাড়ে এগারোটার সময় নিচে নেমে এসে ম্যানেজারের কোয়ার্টারে এসে পৌঁছল। ড্রিঙ্কের প্রস্তাব এল এরপর। স্বাভাবিক ব্যাপার। দু' পেগ গলায় ঢেলে দিয়েই দুজনে রাহুল সেনের আস্তানার দিকে রওনা হবে। আর কিছু না হোক, অন্তত সমস্ত কিছু দেখেশুনে আসা দরকার। বলা বাহুল্য, হুইস্কি বা রাম, যাই হোক না কেন,

তাতে মারকিউরিক ক্লোরাইড মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে কেতু বর্মাকে বিদায় নিতে হল। তারপর তার দেহটা গাড়িতে চাপিয়ে ফেলে আসা হল রেড রোডের ধারে।

আর টাকাটা—শৈবাল বলল, রসিদ দেওয়া ছিল যে?

তাই তো কেতু বর্মার ঘরের দরজাটা খোলা ছিল। মৃতদেহ পাচার করে আসার পর দিলীপ চৌধুরী 'মাস্টার কি' দিয়ে দরজা খুলে কেতুর ঘরে ঢুকেছিল—তার জিনিসপত্র হাতড়ে রসিদটা সংগ্রহ করতে অসুবিধা হয়নি। তারপর সেই রসিদ হোটেলের রেকর্ডে জমা হয়ে গেছে। অ্যাজ ইফ, কেতু বর্মা একটা ব্রিফকেস কয়েক ঘণ্টার জন্য জমা রেখেছিল, আবার ফিরিয়ে নিয়েছে। মোটামুটি এই হল ব্যাপার।—কথা শেষ করে বাসব মৃদু হাসল।

রাহুল অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। শৈবাল বাহাদুরের সন্ধানে গেল। আরেকবার কফি হলে মন্দ হয় না।

তিন

বিরামহীন ভাবে কাজ করে গেলে শরীর ও মনের উপর চাপ আসতে বাধ্য। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে তাই একরকম মরিয়া হয়েই বাসব বেরিয়ে পড়েছে কলকাতা থেকে।

শৈলপুরী সিমলায় এসে যাঁরা হোটেলে থাকতে চাননা, ঘরোয়া স্বাচ্ছন্দ্য খোঁজেন, দালালদের মুখ থেকে তাঁরাই সন্ধান পান অপূর্ব নৈসর্গিক শোভার বেড় দেওয়া গ্রোভনার কম্পাউণ্ডের। এই কম্পাউণ্ডের মধ্যে দু'কামরা বিশিষ্ট চারটি বাড়ি আছে।

বাড়ি চারটির গঠন দেখলে বুঝতে পারা যায়, এককালে কোন ইংরেজ পুরুষ এগুলি তৈরি করিয়েছিলেন। ভাগ্যক্রমে বাসব গ্রোভনার কম্পাউণ্ডের একটা বাড়ি পেয়ে গিয়েছিল। এখানকার বৈশিষ্ট হল চমৎকার লন। চোখ জুড়িয়ে যাওয়া বাগান ছাড়াও, একটি ক্লাব ঘর। বিলিয়ার্ড, টেবিল টেনিস আর ব্রীজ খেলার ব্যবস্থা আছে ক্লাবে। আর আছে ফায়ার প্লেসের কাছাকাছি রাখা অনেকগুলি কোচ সোফা। সেখানকার অল্প উষ্ণতার মধ্যে বসে গল্প গুজবে যে আমেজ পাওয়া যায় তার বুঝি আর তুলনা নেই।

সমস্ত কিছু দেখাশুনা করার ভার রয়েছে রাকেশ ভাণ্ডলার উপর। কেয়ার টেকার ছোকরা বেশ চৌকশ। সকলের সুখ সুবিধার উপর সজাগ দৃষ্টি রেখে চলে। বাসব শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে যখন এখানে এসেছিল তখন দুটো বাড়িতে অতিথি এসে গিয়েছিলেন মাত্র দিন তিনেক আগে তালোয়ার আর চোপড়া—দুই বন্ধু মিলে চতুর্থ বাড়িটি অধিকার করেছেন। বলা বাহুল্য ক্লাবের দৌলতে সকলেই সকলের বেশ পরিচিত হয়ে পড়েছেন। শৈবাল বলল, আজ ঠাণ্ডা আমাদের আরো কাহিল করে তুলবে।—এবার ঠাণ্ডা অনেক আগাম এসে পড়েছে।

বাসবের কথা শেষ হবার পরই সুমন মাথুর এসে উপস্থিত হলেন। ভদ্রলোকের বয়স পঁয়ত্রিশের মধ্যেই। সুপুরুষ বলা চলে। আগ্রার বড় ব্যবসাদার, সস্ত্রীক এসেছেন এখানে দুজনকে সুপ্রভাত জানালেন। তারপর বসে পড়লেন খালি চেয়ারটায়।

দ্রুত গলায় মাথুর বললেন, বিচিত্র এক ব্যাপার ঘটেছে মিঃ ব্যানার্জি।

—কিরকম।

প্রত্যেক বাড়িতে একটা লেটার বক্স লাগান আছে জানেন তো। আগ্রা থেকে কোন চিঠি এসেছে কিনা দেখবার জন্য গতকাল লেটার বক্স খুলেছিলাম। নাম ঠিকানা না লেখা একটা খাম ছিল তার মধ্যে। আশ্চর্য হয়ে খাম ছিঁড়তেই বেরিয়ে পড়ল একটা ছবি। কোন পত্রিকা থেকে কেটে নেওয়া মনে হয়। এই দেখুন।

মাথুর একটা খাম বাড়িয়ে ধরলেন। বাসব ছবিটা বার করে দেখল। পত্র-পত্রিকা থেকে কেটে নেওয়াই বটে। ছবির বিষয়বস্তু হল, ফুটপাথের উপর একটি লোক ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পড়ে আছে।

মাথুর বললেন, আমার স্ত্রী খুব ভয় পেয়ে গেছেন। তাঁর মতে কোন অমঙ্গল এগিয়ে আসছে। আমার কিন্তু মনে হয় কেউ রসিকতা করেছে।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল কম্পাউণ্ডের মধ্যে যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে কাউকে আগে চিনতেন?

—না। এখানে এসে আলাপ হয়েছে।

—সিমলায় এমন কেউ আছে, যার সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?

—কেউ না।

—তবে কে আপনার সঙ্গে রসিকতা করতে যাবে?

—আসল ব্যাপারটা কি তার হদিস যদি দিতে পারেন এই আশায় এলাম। আমার স্ত্রী সান্ত্বনা পান তাহলে।

বাসবের প্রকৃত পরিচয় সকলের জানা হয়ে গিয়েছিল।

—এই মুহূর্তে বলা মুশকিল। খামটা রেখে যান। মাথা ঘামিয়ে

যদি কিছু বার করতে পারি, আপনাকে জানাব

পাঁচটার মধ্যেই অন্ধকার ঘনিয়ে এল। ঠাণ্ডাটাও পড়েছে বেশ চেপে। বাসব শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাবে পৌঁছাল। তখন কম্পাউণ্ডের অন্যান্য অধিবাসীরা সেখানে উপস্থিত। চোপড়া আর তালোয়ার বিলিয়ার্ড খেলছিলেন। বোঝা যায় খেলায় দক্ষতা আছে।

দুজনেই যুবাপুরুষ।

সস্ত্রীক দেশমুখ আর মাথুর বসেছিলেন গনগনে ফায়ার প্লেসের সামনে। দেশমুখের বয়স নিশ্চিত ভাবে পঞ্চাশ ছুঁয়েছে। বেশ শক্ত পোক্ত চেহারা পুনার "সানরাইজ মিল্ক" এর তিনিই সত্বাধিকারী। ওঁর স্ত্রীর বয়সও চল্লিশ পেরিয়েছে। তবে এখনও বেশ তন্বী ভাব বজায় আছে।

রীতা মাথুরকে ভারি বিমর্ষ দেখাচ্ছে। এক মনে উল বুনে চলেছেন তিনি। নিখুঁত সুন্দরী বলা চলে না। তবে যে কোন পুরুষের মনে রীতা মাথুর হিল্লোল তুলবেন। বাসবকে দেখে সকলে সহর্ষে আহ্বান জানালেন। রাকেশ ভাণ্ডলাকে ডেকে দেশমুখ সকলের জন্য বিয়ারের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানালেন। বিয়ার এসে পড়ল।

গল্প গুজব আরম্ভ হল। এক সময়ে অনুরোধে পড়ে বাসবকেও কিছু অভিজ্ঞতার কথা শোনাতে হল। এই ভাবে কেটে গেল প্রায় ঘণ্টা দেড়েক। মাথুর বললেন, আপনার কেস হিষ্ট্রি বই আকারে প্রকাশিত হলে কিন্তু ভাল হত।

বাসব মৃদু হেসে বলল, হয়তো হত। কিন্তু লিখবে কে? আমি আবার ঐ ব্যাপারে আনাড়ি।

ঠিক এই সময় এক অচিন্তনীয় ঘটনা ঘটে গেল। রীতা মাথুর চিৎকার করে উঠলেন। তারপরই গড়িয়ে পড়লেন কার্পেটের উপর। ঘটনার আকস্মিকতায় সকলেই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। পরমুহূর্তে মাথুর লাফ দিয়ে পড়লেন স্ত্রীর কাছে। বাসব প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওখানে গিয়ে পৌঁছাল। রীতা পাশ ফেরা অবস্থায় পা মুড়ে আছেন। শরীরে স্পন্দন আছে বলে মনে হয় না। বাসব ঝুঁকে পড়ে তীক্ষ্ণ

দৃষ্টি দিয়ে দেখল।

—রীতার কি হল মিঃ ব্যানার্জি?

—মনে হচ্ছে উনি মারা গেছেন।

মাথুরের গলা দিয়ে হাহাকার বেরিয়ে এল, মারা গেছে—কি বলছেন আপনি—রীতা নেই—

বাসব আবার বলল, আমার ধারনায় মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়। পুলিশ না আসা পর্যন্ত আপনারা যে যেখানে আছেন থাকুন। মিঃ ভাণ্ডলা থানায় খবর পাঠান।

ইন্সপেক্টর আনন্দ আধঘণ্টাটাক হল এসেছেন। মৃত্যু সত্যি স্বাভাবিক নয়। রীতার গলায় মাঝামাঝি সাইজের একটা ছুঁচ বিঁধে রয়েছে। ডাক্তারী পরীক্ষা ছবি তোলা ইত্যাদি এই মাত্র শেষ হল। বডি পোষ্টমর্টমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে দেবার আগে ছুঁচটা গলা থেকে খসিয়ে নিলেন আনন্দ। ইন্সপেক্টর বাসবের পরিচয় পেয়েছিলেন। ওকে গুরুত্ব দেবেন কিনা প্রথমে স্থির করতে পারেননি। কিন্তু ক্রমে বুঝলেন কেসটা জটিল। এই হলের মধ্যে এমন একজন আছে যে মহিলাকে বিচিত্র উপায়ে খুন করেছে। কিন্তু তাকে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না।

কাজেই বাসবের সহযোগিতা অপরিহার্য হয়ে উঠল। ভদ্রলোক দুর্ঘটনার সময় এখানে উপস্থিত ছিলেন। হয়তো কিছু লক্ষ্য করে থাকতে পারেন। রহস্য তাতে কিছুটা ফিকে হয়ে যেতে পারে।

—ব্যাপারটা কি ভাবে ঘটেছে আপান আন্দাজ করতে পারছেন?

বাসব বলল, বিস্ময় ওখানেই ইন্সপেক্টর। আমার উপস্থিতিতেই ব্যাপারটা ঘটল। অথচ আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। তবে এটা ঠিক, ভদ্রমহিলা আত্মহত্যা করেননি। মৃত্যু আচম্বিতেই এসেছে। আমাদের চোখের সামনে দিয়ে কিভাবে ছুঁচটা নিক্ষেপ করা হয়েছে সেটাই হল প্রশ্ন।

—এ সম্পর্কে কিছু চিন্তা ভাবনা করেছেন?

—কাজের হাত থেকে কিছুদিন বিশ্রাম পাবার তাগিদেই এখানে

এসেছিলাম কিন্তু এমনই ভাগ্য রহস্য আমার পিছু ছাড়ল না। ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতেই হবে। যাহোক, আপনি ভদ্রমহিলার অতীত জীবন সম্পর্কে ভাল ভাবে খোঁজখবর নিন।

—বেশ।

—এবার আপনি এজাহার নিতে আরম্ভ করুন।

মাথুর তখনও মুখ ঢেকে বসে আছেন। এই শোক কাটিয়ে উঠতে ওঁর সময় লাগবে। আর সকলেও যে যাঁর জায়গায় ঠিক আগেকার মতই রয়েছেন। হাওয়া বদলের সমস্ত আনন্দ তাঁদের নষ্ট হয়ে গেছে।

মাথুরকে সম্বোধন করে ইন্সপেক্টর বললেন আপনার মনের অবস্থা অনুমান করতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে বিরক্ত না করে উপায় নেই। গোটা কয়েক প্রশ্ন ছিল।

মাথুর মুখ তুললেন। তাঁর ফরসা মুখ লাল হয়ে উঠেছে। জল টলটল করছে দুচোখে। পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখের উপর বুলিয়ে নিয়ে বললেন, বলুন।

বাকীদের পাশের ঘরে চলে যেতে বললেন ইন্সপেক্টর। সকলে চলে যাবার পর বললেন, মিসেস মাথুর মারা যাবার আগে এ ঘরের পরিবেশ কিরকম ছিল শুনেছি। ও প্রসঙ্গ আর তুলতে চাইনা। আপনার স্ত্রী নাকি বেশ বিষন্ন ছিলেন আজ। কেন বলুন তো?

—আজ নয় কয়েকদিন থেকে গম্ভীর ছিল। আমি বার বার প্রশ্ন করেও কারণ জানতে পারিনি।

—আপনাদের লাভ ম্যারেজ?

ঠিক তা নয়। আবার বলতেও পারেন। দিল্লীতে আলাপ হয়েছিল। ওর বাবার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। বিয়ের প্রস্তাব করতেই সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন।

—কিছু মনে করবেন না। কুমারী জীবনে তাঁর কোন প্রেমিক ছিল কিনা জানেন?

—আমি জানি না।

—তিনি না হয় বলেননি, আপনি তো মাঝে মধ্যে শ্বশুরবাড়ি

যেতেন। কিছু বুঝতে পারেননি ?

—বিয়ের পর আমি একবারও শ্বশুরবাড়ি যাইনি। রীতা দিল্লী যেতে চাইত না। বাপের বাড়ির লোকেদের মাঝে মধ্যে আগ্রায় আসতে বলত। তাঁরা আসতেন।

—এই কম্পাউণ্ডে বাকী যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে কেউ আপনার পূর্ব পরিচিত ?

—একজনও না।

—আপনার স্ত্রীর ?

—না বোধহয়। পরিচয় থাকলে বুঝতে পারতাম।

—অকারণে মানুষ খুন হয় না। আপনার স্ত্রী কেন খুন হলেন, অনুমান করতে পারেন ?

—একেবারেই না। ঐ প্রশ্নে উত্তরই তো আমি খুঁজছি।

ইন্সপেক্টর গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, এখন আর কোন প্রশ্ন নেই। আপনি বিশ্রাম করুন গিয়ে।

মাথুর ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এবার তালোয়ারকে ডাকা হল।

মিলিটারি অফিসার। জলন্ধর থেকে এসেছেন! প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন, নিয়মানুসারে তাঁর এখন দুমাসের ছুটি চলেছে। ছাউনি থেকে বেরিয়ে অমৃতসর চলে যান। বন্ধু চোপড়ার সঙ্গে চিঠি মারফৎ আগেই স্থির হয়েছিল দুজনে মাসখানেক সিমলায় কাটাবেন। অমৃতসর থেকে দুজনে সোজা চলে এসেছেন এখানে।

—আপনাদের চোখের সামনেই তো খুনটা হল। কি ভাবে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে বলে আপনার ধারণা ?

—অনেক ভেবেও কোন ধারণা খাড়া করতে পারিনি। এখানে উপস্থিত না থাকলে, বাস্তবে যে এমন ঘটনা ঘটতে পারে বিশ্বাসই করতে পারতাম না।

একটু থেমে ইন্সপেক্টর বললেন, এই কম্পাউণ্ডে আপনি কিভাবে বাড়ি পেলেন ?

—চোপড়া আগে এখানে থেকে গেছে। সে লেখালিখি করে ব্যবস্থা করেছিল।

আর কোন প্রশ্ন নেই। চোপড়াকে গিয়ে পাঠিয়ে দিন।

তালোয়ার পাশের ঘরে চলে গেলেন। চোপড়া এলেন তারপরই। খুব স্মার্ট লোক। অমৃতসরে হোটেলের ব্যবসা আছে। বেশ ভয় পেয়ে গেছেন মুখের ভাব দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। আড়ষ্ট ভাবে এসে বসলেন।

ইন্সপেক্টর বললেন, বেশ ভয় পেয়ে গেছেন মনে হচ্ছে?

দ্রুত গলায় বললেন চোপড়া ভয় পাব না, কি বলছেন আপনি? এরকম অবস্থায় জীবনে পড়িনি।

—দোষ না করে থাকলে, ভয়ের কি কারণ থাকতে পারে? যাক, মিসেস মাথুরের দুরত্ব আপনার কাছ থেকে ক'হাত ছিল?

—তিন চার হাত হবে?

—দুরত্ব বেশি নয় তাহলে। ছুঁচ কার কাছ থেকে ছুটে গিয়েছিল একেবারেই বুঝতে পারেননি?

—না। আমি একবারও কথা বলিনি। শুনছিলাম, আমার দৃষ্টি ফায়ার প্লেসের দিকে ছিল।

—ছুঁচটা কি দিয়ে ছোঁড়া হয়েছিল বলে আপনার ধারণা?

—রিভলবারের মত কোন অস্ত্র দিয়ে নিশ্চয় নয়। তাহলে কারুর না কারুর চোখে পড়ে যেত?

—তা ঠিক। আপনি তো আগে একবার সিমলায় এসেছেন। আবার এখানেই এলেন যে?

চোপড়া বললেন, বছর দুয়েক আগে এসেছিলাম। খুব ভাল লেগে গিয়েছিল জায়গাটা। তালোয়ার ছুটিটা কোন পাহাড়ে কাটাবার কথা লিখেছিল। তাই ওকে সঙ্গে নিয়ে এখানেই চলে এলাম।

—উপস্থিত আর কোন প্রশ্ন নেই। আপনি এখন যেতে পারেন। দেশমুখদের পাঠিয়ে দিন।

একরকম ছুটতে ছুটতে চোপড়া চলে গেলেন। দেশমুখ দম্পতি

এলেন তারপর। দুজনের মুখই শুকিয়ে উঠেছে। বেড়াতে এসে ঘোরাল ঝামেলার মধ্যে কে আর পড়তে চায়।

ইন্সপেক্টর আনন্দ আরম্ভ করলেন, মিসেস মাথুরের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আপনাদের ধারণা কি?

দেশমুখ বললেন, আমরা হতভম্ব হয়ে গেছি।

—কিছুই বুঝতে পারেননি?

—বিশ্বাস করুন, কিছু না। এত খোলাখুলি ব্যাপারটা ঘটল, অথচ আমরা অন্ধকারেই রয়ে গেলাম।

—এতদিনে মিসেস মাথুরের সঙ্গে আপনাদের বেশ আলাপ হয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়?

এবার মিসেস উত্তর দিলেন, খুব মিশুক মেয়ে ছিল। আমার কাছে যখন তখন আসত। তবে—

—বলুন?

—তবে কদিন থেকে খুব গম্ভীর দেখছিলাম তাকে। আমার কাছে আশা যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল।

—আপনি কারণ জানতে চাননি?

—আজ সকালেই ওর কাছে গিয়ে জানতে চেয়েছিলাম, এত মুষড়ে পড়েছ কেন? শরীর ঠিক আছে তো? বলল, শরীর ঠিকই আছে। বিশেষ এক কারণে ওর কিছুই ভাল লাগছে না। স্বামীকে রাজী করিয়ে কালই এখান থেকে চলে যাবে।

—বিশেষ কারণটা কি জানতে চেয়েছিলেন?

—চেয়েছিলাম। বলতে চায়নি।

দেশমুখ বললেন, আমরাও আর এখানে থাকব না। খুব বেড়ান হল, আর নয়। কালই ফিরে যাব।

মৃদু হেসে ইন্সপেক্টর বললেন, তাতো হবে না স্যার। এই কেসের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আপনারা এখান থেকে কেউ যেতে পারবেন না। আর আটকাব না। আপনারা বাংলোয় ফিরে যেতে পারেন।

বিড় বিড় করে বকতে বকতে সস্ত্রীক দেশমুখ ওখান থেকে চলে

যাবার পর বাসব বলল, আপনার প্রশ্নগুলি ভাল। চিন্তা ভাবনার পর এর থেকে হয়ত সূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব হবে।

—ধন্যবাদ। কেয়ারটেকারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিলেই এখনকার মত কাজ মোটামুটি শেষ হয়।

—তাই করুন। আমি ততক্ষণ সতর্কভাবে, এধারটা দৃষ্টি বুলিয়েনি।

—বেশ।

রাকেশের সন্ধানে গেলেন ইন্সপেক্টর।

ফায়ার প্লেসের কাছ থেকে রাজা মাথুর যেখানে বসেছিলেন—এই জায়গাটুকু বাসব তীক্ষ্ণ চোখে পরীক্ষা করতে লাগল। সোফার পাশেই টিপয়। তার উপর খালি বিয়ারের গেলাস। অ্যাসট্রে। অ্যাসট্রে-গুলিতে একাধিক সিগারেটের টুকরো গোঁজা। সিগারেটের প্যাকেটের উপর অয়েল পেপারের যে কভার থাকে, দলা পাকানো অবস্থায় গুটিকয়েক পড়ে আছে এধার ওধার।

বাসব নিরাশ হল।

হঠাৎ ওর দৃষ্টি পড়ল ফায়ার প্লেসের সামনের দিকের একটা খাঁজে। ছোটমত একটা মোড়ক আটকে আছে। আকারে মার্বেলের গুলির চেয়ে বড় নয়। মোড়কটা খসিয়ে এনে খুলতেই দেখা গেল, ইঞ্চি দুয়েক লম্বা, তেরছা ভাবে ছেঁড়া চকচকে একটা কাগজের টুকরো। তাতে দু'লাইনে গুটিকয়েক ইংরাজী অক্ষর ছাপা রয়েছে।

উপরের তিনটি অক্ষর : কে. আই. এম। নিচে এম. এ. ভি। অর্থাৎ বাকী অংশ পাওয়া না গেলে বোঝা যাবে না প্রকৃত পক্ষে কি লেখা ছিল। কাগজটা দেখে মনে হয় কোন লেবেলের অংশ। কেউ বোধহয় কোথাও থেকে ছিঁড়ে, মুড়ে আগুনের মধ্যে ফেলে দিতে চেয়েছিল। ফায়ার প্লেসের মধ্যে না পড়ে খাঁজে আটকে গেছে।

বাসব কাগজের টুকরোটা পকেটস্থ করল। আর এখানে কিছু করার নেই হল থেকে বেরিয়ে শৈবালের খোঁজ করল। সে তখন

বারান্দায় অপেক্ষা করছিল। দুজনে বাংলোর দিকে পা চালাল।

শৈবাল প্রশ্ন করল, কিছু বুঝতে পারলে ?

—উহুঁ। ব্যাপারটা তাক লাগিয়ে দেবার মত।

আমাদের চোখের উপর ঘটল। অথচ—

—মিসেস মাথুরের গা ঘেঁসে কেউ বসেনি। ছুঁচটা কিছুদূর থেকেই তাঁর কাছে গেছে। প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে ? বিষয়টা আমাকে দারুণ ভাবিয়ে তুলেছে ডাক্তার।

পরের দিন সমস্ত দুপুর পাইপ ফুঁকে আর পায়চারি করে কাটিয়ে দিল। ওর মনের মধ্যে এখন চিন্তার ঝড় চলেছে শৈবাল জানে। কাজেই সে বই মুখে করে আর বিছানায় গড়িয়ে সময় কাটিয়ে দিচ্ছে। ইন্সপেক্টর আনন্দ সকালে একবার এসেছিলেন। দিনের আলোয় ক্লাব তল্লাশি চালিয়ে ফিরে গেছেন।

বিকেল তখন পাঁচটা। বাসব শৈবালের সামনে এসে বসল। ঠিক এই সময় ঘরে প্রবেশ করল রাকেশ। অসময়ে পড়েছে বোধহয়, এইমত প্রকাশ করে কিছুটা সঙ্কুচিত হল। তারপর পকেট থেকে একটা সুদৃশ্য লাইটার বার করে এগিয়ে ধরল।

—এই নিন মিঃ ব্যানার্জি।

লাইটারটা হাতে নিয়ে বাসব বলল, আনতে পেরেছেন তাহলে। চমৎকার জিনিস। কত দাম পড়ল।

—আশি টাকা। সিগারেট সিগার ও পাইপ ধরাবার আলাদা আলাদা ব্যবস্থা আছে। তিন রকম ফ্লেম বেরুবে।

—তাই নাকি !

রাকেশ আবার লাইটারটা ফিরিয়ে নিয়ে কোথায় কোথায় টিপলে কি ফ্লেম বেরুবে দেখিয়ে দিল। বাসব গ্রোভনার কম্পাউণ্ডে পা দেবার পরদিনই জানতে পেরেছিল, স্মাগল করা নানা জিনিস রাকেশ ভাড়াটেদের বিক্রি করে থাকে। পাইপ ধরাবার একটা লাইটার সংগ্রহ করার আগ্রহ তার বরাবরই ছিল। সুবিধাজনক পরিস্থিতি দেখেই অর্ডার দিয়ে দিয়েছিল একটার।

রাকেশ বলল, কাজটা বেআইনী। কিন্তু কি করব বলুন? পেটের জন্য ছোটখাট বেআইনী কাজ না করলেও চলে না।

বাসব পকেট থেকে টাকা বার করে; তার দিকে এগিয়ে ধরে বলল, কতকগুলো ব্যাপার এমন আছে যা মানুষকে চোখ বুঁজে সয়ে যেতে হয়। আচ্ছা, আপনি এ সমস্ত জিনিস পান কোথা থেকে?

—একজন ভূটানীর কাছ থেকে। সে নিজের দেশ বা নেপাল থেকে কিভাবে যেন ঐ সমস্ত জিনিস এখানে নিয়ে আসে।

কথাটা শেষ করার পরই জানলার দিকে দৃষ্টি পড়তেই উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, কি আশ্চর্য! জিগমি এখানে—

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে বাসব ও শৈবাল দেখল, একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি কম্পাউণ্ডের গেট অতিক্রম করছে। সাজপোশাক দেখে বোঝা যায় সে ভূটানদেশীয়।

হাল্কা গলায় বাসব প্রশ্ন করল, ঐ লোকটাই বুঝি? কিন্তু আপনি যেন উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন?

—না···মানে···জিগমির তো কখনো কম্পাউণ্ডের ক্রেতাদের সঙ্গে আলাপ থাকার কথা নয়।

রাকেশকে বিশেষ চিন্তিত দেখা গেল।

নতুন লাইটার দিয়ে পাইপ ধরিয়ে বাসব বলল, ওর কাছে আমাকে নিয়ে যেতে পারেন?

—আপনাকে!

—একটা ক্যামেরা কেনার ইচ্ছে আছে।

—আমি তো রয়েছি। আপনি যদি ওর কাছে যান, তবে আমার কমিশনটা মারা যাবে।

—মালটা বাছতে শুধু ওখানে যাব। কিনব আপনার মাধ্যমেই। কমিশন মারা যাবে না। আচ্ছা, একটা কথা বলুন, ক্লাবে কি কোন সংবাদপত্র বা পত্রিকা নেওয়া হয়?

—একটা দৈনিক আর একটা সাপ্তাহিক আসে।

—এখানে যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে কে কে পত্র-পত্রিকা নেন

বলতে পারেন ?

—খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি।

—ভারি উপকার করা হবে। আমি আসছি।

বাসব শোবার ঘরের দিকে চলে গেল। ফিরে এল মিনিট দুয়েক পরেই। ওর হাতে তখন মাথুরের কাছ থেকে পাওয়া সেই খাম। খামের মধ্যে থেকে ছবি বার করে প্রশ্ন করল, দেখুন তো কোন পত্রিকা থেকে ছবিটা কাটা হয়েছে ? ভাল করে দেখুন।

এক নজর দেখে নিয়ে রাকেশ বলল, কর্ম্মযুগের রানিং ইস্যুতে ছবিটা আছে।

—আপনি গোপনে খোঁজ নিয়ে দেখুন এই সংখ্যাটা কার কাছে আছে ?

—দেখব। কিন্তু—

—পরে সব জানতে পারবেন। আপনি এখন ডাক্তারের সঙ্গে গল্প করুন। আমি আসছি।

বাসব ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

আরো একটি দিন কেটে গেল।

সকালে দেশমুখের বাংলোয় সকলে একত্রিত হয়েছিলেন। ক্লাবে গিয়ে যে বসা যাবে তার উপায় নেই। সেখানে পুলিশের পাহারা বসেছে। সকলের মুখেই দুর্ভাবনার চিহ্ন। খুনের ঝামেলা মাথায় নিয়ে কে আর দিনের পর দিন বিদেশে পড়ে থাকতে চায়।

দেশমুখ প্রশ্ন করলেন, কিছু বুঝতে পারলেন মিঃ ব্যানার্জি ?

দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপ খসিয়ে এনে বাসব বলল, বোঝাবুঝির ষ্টেজে এখনও এসে পৌঁছতে পারিনি।

—এই কাজ যে আমাদের মধ্যে কারুর—তালোয়ার বললেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আশ্চর্যের বিষয়, তবু বুঝতে পারা যাচ্ছে না লোকটা কে!

চোপড়া বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। তবে আমরা যে কজন ওখানে বসেছিলাম, তাদের মধ্যে কেউ না কেউ এ কাজ করলে সঙ্গে

সঙ্গে বুঝতে পারা যেত। ওখানে আরো একজন লোক ছিল। তার কথা মোটেই ভাবা হচ্ছে না।

—তুমি বলতে চাইছ—

—আমি কেয়ারটেকারের কথা বলছি।

শ্রীমতী দেশমুখ বিস্মিত গলায় বললেন, রাকেশ ভাগলা। কিন্তু জোরের সঙ্গে চোপড়া বললেন, ভেবে দেখুন, তার দিকে কারুর দৃষ্টি ছিল না। অথচ সে ছিল হলের মধ্যেই

এতক্ষণ পরে কথা বললেন মাথুর স্ত্রীর মৃত্যুর পর সেই যে তিনি নিজের বাংলোয় আশ্রয় নিয়েছিলেন, আর বেরুননি। এই ভাবে সময় কাটালে শরীর নষ্ট হয়ে যাবে এই যুক্তি দেখিয়ে মাত্র কিছু আগে দেশমুখ তাঁকে এখানে নিয়ে এসেছেন।

বললেন, আমি শুধু ভাবছি রীতাকে খুন করা হল কেন? সে তো কোন গোলমাল বা ঝামেলার মধ্যে থাকত না। আমাকে মারলে বরং একটা কথা ছিল।

তালোয়ার বললেন, আপনাকে মারবে কেন?

—আমি ব্যবসাদার মানুষ। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অনেক শত্রু তৈরি করেছি। আমাকে খতম করে দিতে হয়তো অনেকেই চাইবে। কিন্তু রীতা—তাকে মেরে কার কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি হল?

এতক্ষণ পরে বাসব বলল, খুন হওয়ার পর অনুসন্ধানকারীদের কাছে বড় প্রশ্ন হয়ে ওঠে, মোটিভ্। আপনার মত আমিও বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে চলেছি। ওকথা এখন থাক। আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।

—বলুন?

—আগ্রা থেকে দিল্লীর দূরত্ব বেশি নয়। অথচ আপনার স্ত্রী বাপের বাড়ি যেতে চাইতেন না। মাঝে মাঝে তাদের নিজের কাছে আনিয়ে নিতেন। কিন্তু তিনি এরকম কেন করতেন এ প্রশ্ন আপনার মনে কোনদিন জাগেনি?

বাসবের প্রশ্নে সকলে অবাক হয়ে গেলেন।

একটু থেমে মাথুর বললেন, তার ব্যবহারে অবাক যে না হত সে তো নয়। প্রশ্ন করেছিলাম। বলেছিল, এ জীবনে আর কোনদিন দিল্লী যাব না।

—কেন? দিল্লীকে কেন তিনি এড়িয়ে যেতে চাইছিলেন?

—আমি সে কথাও জানতে চেয়েছিলাম। হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল আমার আগ্রহ। একদিন শুধু কথায় কথায় বলেছিল, যে জীবন ফেলে এসেছে, সেখানে এক মিনিটের জন্য ফিরে যেতে মন চায় না।

বাসব আর কোন প্রশ্ন করল না।

আলোচনা আবার যেমন তেমন দিক ধরে এগুতে লাগল। আধ ঘণ্টাটাক পরে বাসব শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এল দেশমুখের ওখান থেকে। বেলা হয়েছিল। খাওয়া দাওয়ার পর শৈবাল যখন দিবানিদ্রার আয়োজনে ব্যস্ত, বাসব বেরিয়ে পড়ল। ক্লাব সংলগ্ন একটা ঘরে রাকেশ থাকে। সাড়া পেয়ে বেরিয়ে এল।

বাসব বলল, আপনার খাওয়া হয়েছে।

—এই মাত্র হল।

—থানা কোন দিকে আমার জানা নেই। হাতে সময় থাকলে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন না।

—বেশ তো। চলুন।

কম্পাউণ্ড থেকে বেরিয়ে দুজনে নিচের দিকে নেমে চলল। পাহাড়ের থাকে থাকেই সিমলা সাজান। দূর থেকে ভারি ভাল লাগে দেখতে। বিশেষে রাত্রে। থানায় পৌঁছতে কুড়ি মিনিটের বেশি সময় লাগল না। আনন্দ নিজের চেয়ারে ছিলেন না। সংবাদ পাওয়া মাত্র থানা লাগোয়া কোয়ার্টার থেকে এলেন।

পোষ্টমর্টমের রিপোর্ট এসেছে নাকি?

—কিছুক্ষণ হল পেয়েছি। দেখুন না।

ইন্সপেক্টর রিপোর্ট এগিয়ে ধরলেন।

বাসব খুঁটিয়ে পড়ল। যা অনুমান করেছিল, তার বাইরে নতুন কিছু জানা গেল না। গলার ডান পাশে ছুঁচ প্রায় এক ইঞ্চি ঢুকে

গিয়েছিল। ডগায় বিষ লাগানো থাকায় সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে। বিষের পরিচয় পাওয়া যায়নি। কোন দেশী প্রথায় তৈরি অনুমান করা হচ্ছে।

এই সময় একজন কনষ্টেবল এসে জানালো, দিল্লী থেকে ট্রাঙ্কল এসেছে। আনন্দ পাশের ঘরের উদ্দেশ্যে ছুটলেন।

বাসব প্রশ্ন করল, কর্মযুগ সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছিলেন?

রাকেশ বলল, নিয়েছিলাম হাজারের কাছ থেকে জানতে পারলাম, কম্পাউণ্ডের মধ্যে কেউ 'কর্মযুগ' নেয় না। তবে একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করেছি।

—কি বলুন তো?

—ঐ পত্রিকা ক্লাবে নেওয়া হয় বলেছিলাম। লক্ষ্য করলাম তার থেকে একটা ছবি ব্লেড দিয়ে কেটে নেওয়া হয়েছে।

পত্রিকাটা ছিল কোথায়?

—পিয়ানোর উপর।

বাসব আর কিছু বলল না। পাইপে মনোযোগী হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আনন্দ ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসলেন। বাসবের অনুরোধে রাকেশ বারান্দায় অপেক্ষা করতে লাগল।

আনন্দ বললেন, আপনি মিসেস মাথুরের প্রাক-বিবাহিত জীবন সম্পর্কে খোঁজ নিতে বলেছিলেন। দিল্লী পুলিশকে সেদিনই জানিয়েছিলাম। ট্রাঙ্কে এখন খবর দিল।

—কি বলল?

—মিসেস মাথুরের এক খুড়তুতো ভাইয়ের কাছ থেকে দিল্লী পুলিশ খবর সংগ্রহ করেছে। কুমারী জীবনে করালবাগ অঞ্চলে শ্রীমতীর বেশ খ্যাতি ছিল। তাঁকে পাবার জন্য অনেক ছোকরা নাকি পাগল হয়ে উঠেছিল। তবে তাঁর দুর্বলতা ছিল বিশেষ এক যুবকের উপর।

—তারপর।

—বিয়ে প্রায় ঠিকঠাক। কিন্তু মাথুরের মত পয়সাওয়ালা পাত্র হঠাৎ জুটে যাওয়ায় আগের সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায়। শ্রীমতীর প্রেমের

মধ্যে গভীরতা ছিল না এতে বোঝা যায়। মাথুরের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায় এরপরই।

—সেই যুবকের কোন পরিচয় পাওয়া গেছে?

—না। শ্রীমতী নিজের বাবার সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। ভদ্রলোক এখন আর বেঁচে নেই। কাজেই পরিচয় সংগ্রহ করা যায়নি। তবে জানা গেছে সে করালবাগের ছেলে ছিল না। দুজনের দেখা সাক্ষাৎ হত অন্যত্র।

—হুঁ।

চা এসে পড়ল।

চা খেতে খেতে আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা হবার পর বাসব উঠল। রাকেশ বারান্দার একটা বেঞ্চে বসেছিল। তাকে সঙ্গে নিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এল। চুপচাপই পথ অতিক্রম করে চলল দুজনে। শেষে—

—জিগমির আস্তানা এখান থেকে কতদূর?

রাকেশ বলল, বেশি দূর নয়। ডান ধারের ঐ রাস্তা দিয়ে কিছুদূর এগুলেই পাওয়া যাবে।

—চলুন, যাওয়া যাক।

—এখন—?

—ক্ষতি কি। কি ধরনের ক্যামেরা তার কাছে আছে একবার দেখতাম।

—চলুন।

রাকেশ ঠিকই বলেছিল, দূরত্ব বেশি নয়। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দোকান। কাউন্টারের সামনেই জিগমির দেখা পাওয়া গেল। মুখের চামড়া কুঁচকে যাওয়া মধ্যবয়স্ক পুরুষ। ঠোঁটের আগায় হাসির আভাস। চোরাকারবার করতে গেলে বাইরের একটা ঠাট বজায় রাখতে হয়। এই দোকানটা সেই ধরনের একটা কিছু।

জিগমির হাসি প্রসারিত। সে দুজনকে অভ্যর্থনা জানালো।

বর্তমানে বাসব গ্রোভনার কম্পাউণ্ডে বাস করছে এবং কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে সে কথা জানালো রাকেশ। জিগমি চমৎকার ইংরাজী বলতে পারে। তুজনকে পিছন দিকের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল।

মেঝের উপর কার্পেট পাতা ছিল। একধারের কার্পেট সরিয়ে ফেলতেই কাঠের পাটাতন দেখা গেল। পাটাতনের কব্জা লাগান অংশটা অল্প আয়াসেই তুলে ফেলল জিগমি। জায়গাটা খোল বিশেষ। সেখানে নানা রকম জিনিস রয়েছে।

ওখান থেকে গোটা কয়েক ক্যামেরা তুলে নিয়ে এসে জিগমি বলল, এই ঘরে বড় একটা কাউকে আনি না। রাকেশ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে বলেই আপনাকে বিশ্বাস করতে পারছি।

মৃত্থ হেসে বাসব বলল, আমার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

এরপর জিগমি ক্যামেরাগুলোর গুণ বর্ণনা করল। মানের দিক থেকে কতটা উন্নত হয়েছে তার ইঙ্গিত দিল। একটা ক্যামেরা আলাদা করে রেখে বাসব জানাল, সঙ্গে টাকা নেই। রাকেশ পরে এসে এটা নিয়ে যাবে। অবশ্য দরদস্তুর ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছিল।

খোলের মধ্যেকার অন্যান্য জিনিস দেখতে দেখতে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল একটা সিগারেট প্যাকেটের উপর। প্যাকেটটা তুলে নিল বাসব। পাতলা ফ্ল্যাপের উপর সোনালী অক্ষরে লেখা রয়েছে, কিম স্থন অ্যাণ্ড কো, মেড ইন হংকং। ফ্ল্যাপটা বড় চেনা চেনা মনে হতে লাগল। প্যাকেটটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে—এই সময় জিগমি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর হাত থেকে ওটা নিয়ে নিল।

বিস্মিত বাসব প্রশ্ন করল, ব্যাপার কি?

—ওটা আমি বেচব না।

—নাই বেচলেন। তাই বলে—

দ্রুত গলায় জিগমি বলল, বিদেশী সিগারেট আমার কাছে বেশি আসে না। যা আসে নিজের ব্যবহারের জন্যই রাখি। আসুন—

তিনজনে দোকানে ফিরে এল।

জিগমির মুখে আবার আগেকার হাসি।

মৃদু গলায় বলল, কিছু মনে করবেন না। অকারণেই আমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। আপনারা বসুন। আমি কফির ব্যবস্থা করি।

—তার দরকার নেই। আমরা এখন চলি। ভাল কথা, আজ সকালে আপনি কম্পাউণ্ডে গিয়েছিলেন না?

—হ্যাঁ।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, আপনি তো ওখানে যান। যতদূর শুনেছি, যে মিঃ রাকেশই আপনার হয়ে কাজ করেন। আজ ওখানে গেলেন যে?

—বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে যেতে হয়।

—কার কাছে গিয়েছিলেন জানতে পারি কি?

জিগমি বাসবের দিকে তাকাল। দুজনের দৃষ্টি নিবদ্ধ রইল দুজনের উপর কয়েক সেকেণ্ড। তারপর সে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, ক্রেতার সম্পর্কে অন্য কারুর সঙ্গে আলোচনা করা আমার ব্যবসার রীতি নয়। এই যেমন আপনি—আপনি যে এখানে এসেছেন এ কথা আমার মুখ থেকে কেউ জানতে পারবে না।

ওরা বেরিয়ে এল দোকান থেকে।

কিছু দূর চুপচাপ এগুবার পর বাসব বলল, আপনি ফিরে যান, আমায় আরেকবার থানায় যেতে হবে।

বিস্মিত রাকেশ দাঁড়িয়ে পড়ল।

—আর হ্যাঁ। আরেকটা কাজ করলে ভাল হয়।

—বলুন?

—কম্পাউণ্ডে ফিরে গিয়ে একটা ব্যাপার কায়দা করে সকলকে জানাতে হবে।

—কি বলুন তো?

—জিগমির ওখানে যা কিছু দেখলেন বা শুনলেন, সমস্তই তারিয়ে তারিয়ে বলবেন সকলকে। ভারি অবাক হয়েছেন এরকম একটা ভাব যেন বজায় থাকে।

আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

মৃদু হেসে বাসব বলল, এখন আপনার বুঝে দরকার নেই। একটা কথা শুধু জেনে রাখুন, এই জটিল খুনের তদন্তে নিজের অজান্তেই আপনি আমার সহযোগী হয়ে উঠেছেন।

পুরোদস্তুর গরম কাপড় পরে বাসব জানলার পাশে বসে আছে। দু'পাল্লার অল্প ফাঁক দিয়ে বাগানের একাংশ দেখা যাচ্ছে। দৃষ্টি অবশ্য কম্পাউণ্ডের গেট পর্যন্ত প্রসারিত করা যায়। ঘর অন্ধকার। শৈবাল এতক্ষণ ওর পাশেই বসেছিল। জেগে থাকতে আর না পেরে সবে মাত্র বিছানায় গা ঢেলে দিয়েছে।

রিষ্টওয়াচের দিকে বাসব তাকাল। রেডিয়াম যুক্ত ডায়াল থাকায় বুঝতে পারা গেল একটা কুড়ি। বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে গেটের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। ক্রমে দুটো বাজল—তিনটেও বেজে গেল এক সময়। তারপর ধীরে ধীরে ভোর হয়ে এল। যে জন্য সমস্ত রাত জেগে বসে থাকা সফল হল না। অর্থাৎ কাউকে গেট পেরিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখা গেল না।

নিদারুণ হতাশা নিয়ে বাসব বিছানায় আশ্রয় নিল। ওর নিশ্চিত ধারণা ছিল কেউ না কেউ কম্পাউণ্ড থেকে বেরুবে। মন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, কাজেই মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ঘুম এসে গেল। শৈবালের ধাক্কা ধাক্কিতে যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন বেলা এগারোটা। শরীর ম্যাজ ম্যাজ করছে।

শৈবাল বলল, কিহে, পাখি তো জালে পড়ল না।

হাই তোলার পর বাসব বলল, তাই তো দেখলাম। তবে কি জানো ডাক্তার হিসাবে আমি বড় একটা ভুল করি না। আজ হেস্ত নেস্ত হবেই।

—আজ রাতও জেগে থাকতে হবে ?

—হয়তো।

দুপুরে ইন্সপেক্টর আনন্দ এলেন। অনেকক্ষণ ধরে শলাপরামর্শ হল। তিনি বিদায় নেবার পর বাসব অনেকক্ষণ ধরে অস্থিরভাবে

পায়চারি করে বেড়ালো। দুপুর গড়িয়ে ক্রমে বিকেল হল। সন্ধ্যার মুখে নিজেদের বাংলো থেকে বেরিয়ে এসে দুজনে অনুভব করল, গ্রোভনার কম্পাউণ্ডের উপর অদ্ভুত নির্জনতা নেমে এসেছে। কোন বাংলোয় আলো জ্বলছে না।

সকলে গেল কোথায়? শেষে বাগানের মালির কাছ থেকে জানা গেল, সস্ত্রীক দেশমুখ বেরিয়েছেন সকলের আগে। তারপর চোপড়া আর রাকেশ—তালোয়ার তারপর। সব শেষে গেছেন মাথুর। মালি আরো জানালো, তার ধারণা, সকলে কেনাকাটা করতে বেরিয়েছেন।

বাসব দ্রুত গলায় বলল, সর্বনাশ হয়ে গেল।

—কি হল?

—গভীর রাত নয়। এই সময়টাই বোধহয় হত্যাকারী বেছে নিয়েছে। শেষরক্ষা মনে হচ্ছে হল না ডাক্তার। পা চালিয়ে এস।

বাসব ও শৈবাল প্রায় দৌড়ে চলল। জিগমির দোকানের কাছাকাছি যখন পৌঁছাল তখন দুজনেই হাঁপাচ্ছে। দোকানের দরজা যথা নিয়মে খোলা। আলো জ্বলছে। কাউণ্টারে কেউ আছে কিনা দূর থেকে বোঝা গেল না। দম নিয়ে এগুতে যাবে, আনন্দ এসে পড়লেন।

বাসব বলল, আপনি কতক্ষণ?

—এই আসছি।

—পাহারা ঠিক আছে তো? পরিচিত কাউকে দোকানে ঢুকতে দেখেছে কি?

—পাহারা ঠিক আছে। কাল থেকে আমি অনবরত যাওয়া আসা করছি। এখনও পর্যন্ত কম্পাউণ্ডের কেউ এধার মাড়ায়নি।

তিনজন দাঁড়িয়েছিল একটা ঘন গাছের তলায়। দূর থেকে জমাট অন্ধকার ভেদ করে কিছু দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। যারা আসতে পারে তাদের মধ্যে কেউ এখনও আসেনি শুনে বাসব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আবার অন্য এক সন্দেহ দোলা দিয়ে যেতে লাগল ওর মনকে।

মিনিট পনেরো কেটে গেল। তিনজনই চুপচাপ। তিনজনের দৃষ্টি জিগমির দোকানের উপর নিবদ্ধ। শরীর ঠাণ্ডায় কনকনিয়ে যাচ্ছে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কে জানে এই সময় ওধারের রাস্তা মাড়িয়ে একজন দোকানের মধ্যে ঢুকল। গায়ে লংকোট আর মাথায় ফেল্ট হ্যাট থাকায় তাকে চিনতে পারা গেল না।

আনন্দ প্রশ্ন করলেন, এগুবেন?

বাসব বলল, অন্য কোন খদ্দের হতে পারে তবে আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে। চলুন, দেখা যাক—

তিনজন দ্রুত পায়ে দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর ভেতরে ঢুকল অতি সন্তর্পনে।

ক্রেতা বা বিক্রেতা—কেউ নেই কাউন্টারের ধারে কাছে। বাসব বাকী দুজনকে সঙ্গে নিয়ে পাশের ঘরের দিকে এগুলো। কিন্তু দরজা পর্যন্ত গিয়ে থামতে হল ওদের। জিগমি চিৎ হয়ে পড়ে আছে। তার কপালে বিঁধে রয়েছে একটা ছুঁচ। ঝটিতে পর্দা সরিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল বাসব।

কার্পেট সরানো। খোলের ঢাকনা খোলা রয়েছে। একজন লোক হাঁটু মুড়ে বসে ভিতর থেকে কিছু বার করবার চেষ্টা করছিল, দরজার কাছ থেকে শব্দ আসায় দ্রুত ফিরে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে তার পকেটের মধ্যে হাত চলে যাচ্ছিল। কিন্তু—

—পকেট থেকে হংকং এর তৈরি মারণাস্ত্রটা বার করবার চেষ্টা করবেন না মিঃ তালোয়ার। আমরা তৈরি হয়ে আছি।

তালোয়ার উঠে দাঁড়ালেন। তিনি শুধু বক্তা বাসবকেই দেখলেন না; দেখলেন, শৈবাল ও পুলিশ ইন্সপেক্টর আনন্দকেও।

—ইন্সপেক্টর, নিশ্চয় বুঝতে পাচ্ছেন, জোড়া খুনের আসামী আপনার সামনে। স্বচ্ছন্দে হ্যাণ্ড কাপ পরাতে পারেন। তবে সাবধান, ভদ্রলোকের পকেটে মারাত্মক এক অস্ত্র আছে।

আনন্দ দৃঢ় পায়ে তালোয়ারের দিকে এগিয়ে গেলেন।

শৈবাল বলল, গ্রোভনার কম্পাউণ্ডের জের যে জিগমির দোকান

পর্যন্ত গড়াবে আমি তা ভাবতে পারিনি। তালোয়ার যে হত্যাকারী তুমি কিভাবে বুঝলে?

—আগে বুঝতে পারিনি তো। চোপড়া আর তালোয়ারের মধ্যে আমার সন্দেহ ঘোরাফেরা করছিল। তারপর—

—ওভাবে নয়। প্রথম থেকে বলো।

সেদিন রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর বিছানায় বসে কথা হচ্ছিল।

বাসব বলল, খুনটা আমার চোখের উপর হল অথচ কিছুই বুঝতে পারলাম না। ভারি খারাপ লাগছিল আমার। জেরা হয়ে যাবার পর দুটো বিষয় আমাকে আগ্রহী করে তুলল। এক, মিসেস মাথুর বাপের বাড়ি যেতে চাইতেন না; অথচ বাপের বাড়ির লোকেদের নিজের কাছে বার বার আনিয়েছেন। দুই, তিন প্রাণোচ্ছল মহিলা, এখনও দারুণ হাসিখুশি ছিলেন। অথচ তিনদিন থেকে তাঁকে অত্যন্ত মৃয়মান দেখাচ্ছিল। প্রশ্ন হল, কেন? অবশ্য এর চেয়েও বড় প্রশ্ন ছিল, কোন অস্ত্র দিয়ে ছুঁচটাকে ছোঁড়া হয়েছিল? নিয়মিত ব্যবহার করা হয় এমন কোন অস্ত্র দিয়ে নিশ্চয় নয় তাই হত্যাকারীর হাতে অস্ত্রটা থাকা সত্ত্বেও আমরা সন্দেহ করতে পারিনি। জিনিসটা কি হতে পারে? ছুঁচটা শুঁকে দেখলাম, একটা গন্ধ রয়েছে। তারপরই ঘটনাস্থলে খোঁজাখুঁজি করে পেলাম একটা লেবেলের ছেঁড়া অংশ। তাতে 'কিম আর মেড' এই কথা দুটো পাওয়া গেল। আমার মনে হতে লাগল, এই লেবলটা বোধহয় কোন সিগারেটের বাক্সর। আমাদের এখানে যেমন বাক্সর উপর প্লেন ওয়েল পেপার জড়ান র‍্যাপার থাকে—কোন কোন ফরেন কম্পানী র‍্যাপারের উপর লেবেল ছেপে দেয়। মনে হল, সেই রকম লেবেল মারা র‍্যাপারের কিছু আমি নিশ্চিতভাবে পেয়েছি।

থানায় গিয়ে দিল্লীর খবর পেলাম। দিল্লী পুলিশ জানিয়েছে, কুমারী জীবনে মিসেস মাথুর অনেক নটঘটের নায়িকা ছিলেন। তারপর একজনের সঙ্গে জীবন কাটাবার আগ্রহ তীব্র হয়ে উঠল। বিয়ে প্রায় ঠিক। ঠিক এই সময় রঙ্গমঞ্চে উদয় হলেন মাথুর। ধনী

ও সুদর্শন মাথুরকে দেখে রীতা মত পাল্টালেন। বিয়ে হয়ে গেল দুজনের। এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হল: দিল্লী গেলে পাছে প্রাক্তন প্রেমিকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়—কোন গোলমাল বাধে, এই ভয়ে রীতা বাপের বাড়ি যেতে চাইতেন না। তাঁর মারা যাবার তিনদিন আগে চোপড়া আর তালোয়ার এখানে এসেছেন। ঐ তিন-দিন ধরেই রীতা নার্ভাস ভাব নিয়ে কাটাচ্ছিলেন। অর্থাৎ দুজনের মধ্যে কেউ একজন তাঁর প্রাক্তন প্রেমিক। রীতাকে এখানে দেখে স্বাভাবিক কারণেই পুরানো রাগটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। পত্রিকা থেকে কাটা একটা মৃতদেহের ছবি সে পাঠাল—অর্থাৎ সুখের দিন শেষ হয়েছে। এবার মরতে হবে। স্বামীকে পরিষ্কারভাবে বলা যাচ্ছে না। কাজেই শ্রীমতী আরো বিমর্ষ হয়ে পড়লেন।

জিগমি কখনও কম্পাউণ্ডে আসে না। তার হয়ে ক্রেতা সংগ্রহ করে রাকেশ। অথচ রাকেশকে না জানিয়েই সে এখানে এসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে বিদ্যুৎ খেলে গেল। ফরেন সিগারেটের লেবেল, ছুঁচ—তামাকের গন্ধ, কখনো যে আসে না, সেই স্মাগলারের উপস্থিতি—সব মিলিয়ে ব্যাপারটা ভালই দাঁড়াল। রাকেশকে সঙ্গে নিয়ে জিগমির ওখানে পৌঁছালাম। ক্যামেরা বার করবার সময় সেই সিগারেটের বাক্স দেখতে পেলাম। 'কিম আর মেড' পেয়েছিলাম লেবেলের ছেঁড়া অংশে। পুরোটা হবে 'কিমসন অ্যাণ্ড কো' মেড ইন হ কং। বাক্সটা হাতে নিয়ে কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করার আগেই জিগমি সেটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিল। আমার সন্দেহের অবকাশ রইল না, ঐ বাক্সের সিগারেটগুলোর মধ্যে এমন সূক্ষ্ম যান্ত্রিক কৌশল আছে যার সহযোগিতায় একটা বিষাক্ত ছুঁচ লক্ষ্যস্থলের দিকে পাঠান যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল হত্যাকারী কে? তাছাড়া স্থূল প্রমাণ চাই। অগত্যা ফাঁদ পাততে হল। রাকেশকে বললাম, জিগমির দোকানে যা কিছু ঘটেছে সে যেন সকলকে গল্পচ্ছলে বলে। রাকেশ আমার কথা রাখল। তালোয়ার সমস্ত শুনে প্রমাদ গুণলেন। সাক্ষী রাখার ইচ্ছে আগেই ছিল না। এবার যেটুকু দ্বিধা ছিল তা ঝেড়ে

ফেলে দিয়ে দ্বিতীয়বার মৃত্যুবান হানবার জন্য তৎপর হলেন। ঐ সঙ্গে জিগমির স্টকে আর যে কটা মারাত্মক সিগারেট বাক্স আছে তাও সরিয়ে আনবার পরিকল্পনা করলেন, যাতে পরে কেউ বুঝতে না পারে মারণাস্ত্রটা কি! তারপর কি ঘটেছে তাতো তুমি নিজের চোখেই দেখেছ ডাক্তার।

এক নাগাড়ে এতটা বলবার পর বাসব থামল।

শৈবাল বলল, জিগমি হঠাৎ কম্পাউণ্ডে এসেছিল কেন?

-এই সহজ ব্যাপারটা বুঝতে পারনি! চোপড়া আগে এখানে এসেছে। কাজেই জিগমির কথা অজানা ছিল না। তালোয়ার জেনেছে তার মুখ থেকে। এখানে এসে রীতা মাথুরকে দেখেই তার মাথায় খুন চেপে গেল। ওকে সুখে শান্তিতে থাকতে দেওয়া হবে না। তালোয়ার জিগমির কাছে হয়তো গিয়েছিলেন রিভলবারের সন্ধানে। পেয়ে গেলেন অভিনব অস্ত্র।

—তা না হয় হল। এতে কিন্তু জিগমির কম্পাউণ্ডে আসার রহস্য পরিষ্কার হল না।

—এবার হবে। কাউকে এখানেই খুন করার জন্য অস্ত্রটা কিনছেন একথা নিশ্চয় তালোয়ার বলেননি। অন্য কোন অজুহাত নিশ্চয় দেখিয়েছিলেন। রীতা মাথুর হত্যাকাণ্ডর কথা প্রচারিত হবার পর জিগমি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিল, বাকি সিগারেটগুলো ফিরিয়ে নেবার জন্য। যাতে আবার এখানে খুনের ঘটনা না ঘটে বসে। অথবা তালোয়ারকে সে ব্ল্যাকমেল করতে এসেছিল। মনে হয় এটাই ঠিক।

—তালোয়ার এখন তো জলন্ধরে পোষ্টেড। আগে তাহলে দিল্লীতে ছিলেন।

—নিশ্চয়। কিন্তু আর নয়। রাত বাড়ছে।

কথা শেষ করে বাসব হাই তুলল।

আমূল বিদ্ধ